বরুণ সেন

ইয়েনান থেকে শ্রীকাকুলাম

বরুণ সেন

মৌসুমী প্রকাশনী
১৫।২এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশ কাল :
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭
মে, ১৯৭০

প্রকাশক :
শ্রীদেবকুমার বসু
মৌসুমী প্রকাশনী
১৫।২এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রকদ্বয় :
শ্রীপরেশ চন্দ্র চৌধুরী
তারকেশ্বর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯।৬ নরসিংহ লেন
কলিকাতা-৯

ও

শ্রীশরৎ চন্দ্র গুড়ে
নারায়ণী প্রেস
২৬সি, কালিদাস সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শ্রীপ্রণব শূর

দাম : নয় টাকা

সশস্ত্র বিপ্লবী বীর শহীদদের উদ্দেশে

এই লেখকের—

হো চি মিন ও ভিয়েতনাম

পাহাড়ের পর পাহাড়। অসংখ্য গিরি চূড়া একের পর এক মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। শান্ত, স্তব্ধ, ধ্যান গম্ভীর মূর্তি। ঘন জঙ্গল, ঝোপ ঝাড়, আঁকা বাঁকা বন্ধুর পথ। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, কোনদিন বুঝি মানুষের পদচিহ্ন পড়ে নি এখানে। প্রবেশ করেনি বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আলো। সেই আদিম যুগ থেকে বুঝি পরিত্যক্ত শ্রীকাকুলাম।

অন্ধ্রের শ্রীকাকুলাম।

পরিত্যক্ত, সভ্যতার আলোকহীন শ্রীকাকুলাম আজ শুধু অন্ধ্রের নয়, শ্রীকাকুলাম আজ সারা ভারতের। শ্রীকাকুলামের অন্ধকারময় পশ্চাদপদ পাহাড়ী গ্রামগুলি আজ আলোর বর্তিকার মত জ্বলছে। শ্রীকাকুলাম আজ ভারতের ইয়েনানের রূপ নিয়েছে।

শ্রীকাকুলামের প্রতিটি মানুষ আজ জেগে উঠেছে। দুঃশাসনের অপমানের প্রতিশোধ নিচ্ছে কড়ায় গণ্ডায়। অত্যাচারীর টুঁটি টিপে ধরছে তারা শক্ত হাতে। ক্ষমা নেই। মনুষ্যত্বের অবমাননাকারীদের ক্ষমা করবে না তারা।

এ লড়াই সুরু ১৯৬০ সালের পর থেকে। বার বার লড়াই করেছে তারা। জেলে গেছে। ভোগ করে এসেছে সাজা। কিন্তু যা তাদের কাম্য, তা তারা পায় নি। ভুল পথে ছুটে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে বারবার। আজ সঠিক পথের সন্ধানে দীপ্ত উজ্জ্বল। তারা বুঝেছে, মিছিল করে, শ্লোগান দিয়ে কিছু হয় না—দাবী আদায় করে নিতে হয়।

যারা ছিল সব থেকে অনগ্রসর, শ্রীকাকুলামের গিরিজনেরা, জেগে উঠেছে। সারা দেশের মানুষ, গরীব সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রদূত।

ছোট ছোট নীচু চালের ঘর। দিনের বেলাতেও আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা চলে সমানে। মানুষগুলি লুকোচুরির ধার ধারে না। সরল সত্যকে স্বীকার করতে নেই এতটুকু কুণ্ঠা। অনাড়ম্বর জীবন যাপনে নেই লজ্জা, সঙ্কোচ। আছে অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা, শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ।

অন্যায়ের সুরু আজ নয়। দুনিয়ার সভ্য জাতির অন্যতম প্রতিনিধি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দল অন্ধ্র, উড়িষ্যার এই আদিবাসীদের এলাকায় জমি বেচা-কেনা বন্ধ প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ নিয়ম করে এই পাহাড়ী এলাকাগুলিতে এক বিশেষ অফিসারের শাসনাধীন করে নাম দিয়েছিল এজেন্সী এলাকা। উদ্দেশ্য, অধিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ। ফলে একদিন সমতলের ভূস্বামীর দল হয়েছে জমির মালিক। সমতলের ভূবাসীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কিছু আদিবাসীও হয়েছে জমিদার। পাহাড়ী মানুষগুলি হয়েছে ভূমিদাস। বাড়ীর চাকর, পেট ভাতার কিষাণ, ব্যবসায়ী মহাজনদের কাছে বাধ্য হয়ে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করতে হয় হলুদ তেঁতুল আর আদা।

পেটে ভাত জোটেনা তাদের। প্রধান খাদ্য আমের আঁটির ভেতরের শাঁস শুকিয়ে গুঁড়ো করে লেই বানিয়ে খাওয়া। আজও। স্বাধীন ভারতের মানুষগুলিকে আজও এই খাদ্য খেয়ে দিন যাপন করতে হয়!

অত্যাচার আর অবিচার। দিনের পর দিন বহু নালিশ ব্যর্থ হয়ে ক্ষোভ জমেছে অন্তরে। সুরু করেছে অধিকার রক্ষার লড়াই। প্রতিবাদের পথে প্রতিকার চেয়েছে তারা। জেলে গিয়ে সাজা খেটেছে। পেয়েছে এইটুকুই, আইনের সাজা।

দিন এসেছে। সূচনা হয়েছে নতুন দিনের। নতুন যুগ। সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে মানুষ।

শ্রীকাকুলামের মানুষ।

ডেবরা, গোপীবল্লভপুর, মুজঃফরপুর, দক্ষিণ মুঙ্গের, বহড়া গোড়ার মানুষ।

নকশালবাড়ির লাল আগুনের স্পর্শ আজ নিপীড়িত নির্যাতীত সর্বহারা প্রতিটি মানুষের অন্তরে। দিন এসেছে, দিন বদলের পালা।

শংকরের তাই মনে হল। মিথ্যা নয়, এতটুকু অসচ্ছতা নেই, সত্যের আলোয় উদ্ভাসীত।

চেয়ারম্যানের কথাটা মনে হল। তিনি বলেন, 'জনগণকে চেন, জনগণকে বোঝ, জনগণকে গুরু মানো। কারণ, তুমি নও, জনগণই প্রকৃত বীর, জনগণই বিশ্ব-ইতিহাসের নিয়ামক শক্তি।

১৯৬৭তে নকশালবাড়িতে যখন প্রথম সুরু হল অধিকার রক্ষার লড়াই, চমকে উঠেছিল সে। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল তার সমস্ত অন্তরাত্মা। বিশ্বাস করতে পারেনি। দীন দরিদ্র—শিক্ষা দীক্ষা হীন অশিক্ষিত মানুষগুলির নতুন সংগ্রামে সায় দিয়ে উঠতে পারেনি তার মন। তীর ধনুকের লড়াইকে সে ভেবেছিল নেহাৎই দস্যুতা। অবিশ্বাস—দরিদ্র কৃষকের দল মুক্তি যুদ্ধের বোঝে কী? দু চারটে জমিদার, জোতদার আর দালালকে শেষ করলেই কী শ্রেণী সংগ্রাম হয়? শ্রেণী সংগ্রামের পথ কী জমিদার-জোতদার, দালাল আর বদমাস মহাজনের হত্যায়?

বিপ্লবের পথতো প্রতিবাদে, মিছিলে, পোষ্টারে। দিনের পর দিন কত পোষ্টারই তো লিখেছে। 'এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে।'

শুনেছে বড় বড় নেতাদের কত জ্বালাময়ী ভাষণ। কত কথা বলেছেন তাঁরা। শুনিয়েছেন কত শত কঠিন সংগ্রামের ইতিহাস। মুখোশ খুলে দিয়েছেন ধনীদের। বলেছেন, সংগ্রাম চলছে, চলবে।

শুনেছে সে। রাত্রে শুয়ে-শুয়ে বিনিদ্র চোখে ভেবেছে। ছটফট্ করেছে।

সাতষট্টির বাঁচার লড়াইয়ে জিতেছে তারা। বাংলা দেশে তৈরী হয়েছে বিপ্লবী সরকার। জনসাধারণের প্রতিনিধিরা মহাকরণে গেছেন। মন্ত্রী হয়েছেন। বাংলা দেশের ভাগ্য ফিরে গেছে!

অসাধু ব্যবসায়ীর দল আরো অসাধুতার পথ বেছে নিয়েছে। জোতদার, জমিদার, দালাল শ্রেণী সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মোচ্ছব লেগেছে তাদের। জনসাধারণের মনোনীত প্রতিনিধিদের মৃদু তিরস্কার তাদের কিছু করতে পারেনি। কারণ তারা বুঝে গেছে, কাগুজে বাঘ ভয় দেখায়, কামড়ায় না। কারণ গায়ে যে তার ধর্মের নামাবলী, মন্ত্রীত্ব। ময়দানের বক্তৃতা কী মন্ত্রীর কণ্ঠে শোভা পায়?

শংকর দেখেছে। দিনের পর দিন। জীবনের অনেকগুলি দিনতো দেখতে দেখতেই কেটে গেল। পোষ্টার লিখে লিখে হাতের লেখা ভাল হল। বাহবা পেল।

পার্টিতে অসন্তোষের আগুন ধুমায়িত হচ্ছিল অনেক দিন ধরেই। ধরতে গেলে বাষট্টি সালের পর যখন পার্টি ভেঙ্গে দুভাগ হয়েছিল তার কিছুদিন পর থেকেই। সব কথা না জানলেও বুঝতে পারছিল ক্রমশঃ। দীর্ঘ কুড়ি বছরের সংসদীয় পথ কমিউনিষ্ট পার্টির বিপ্লবীগুণগুলিকে সংশোধনবাদ শয়তানের মত একটু একটু করে গিলে খেয়েছে। বিপ্লবের কথা ভুলে গিয়ে সংসদীয় গনতন্ত্রের তল্পীবাহক হয়েছে। যে কংগ্রেস ভারতবর্ষে স্বাধীনতা এনেছে বলে দাবী করে আবার ভোটের সময় দ্বারে দ্বারে ফেরে তাদের পথই অনুসরণ করেছে। বিপ্লবের কথা শুধু সভায়, শোভাযাত্রায় আর পোষ্টারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে।

সেও পোষ্টার লিখেছে। দশটা পাঁচটা অফিস করে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেছে, পার্টি অফিসে আড্ডা দিয়েছে। শোভাযাত্রার লোক জোগাড় করেছে। ছুটির দিনে চাঁদা তুলেছে। বার দুই জেলেও গেছে। আর কিছু করেনি। কারণ তার বেশি কিছু করার ছিলনা। কিছু করবে এমন কিছুও ছিলনা।

এই সব করতে করতেই একদিন চাকুরী গেল। আটাশ বছরের জীবনে আট বছরের চাকরীটা এক কথায় চলে গেল। বেসরকারী চাকুরীর মেয়াদ একদিনেই ফুরিয়ে গেল। অপরাধ—জেল খাটা কর্মীকে কোম্পানী কাজ দেবে না আর। ইউনিয়নও তার চাকুরী যাওয়াটা মেনে নিল। কারণ, ইউনিয়ন তার পার্টির ইউনিয়ন নয়।

বাবা শুনে বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছা করগে। যতদিন পারবো দুটি করে খেয়ে যেও সময় মত।'

দাদারা বললেন, 'ঘাবড়াসনে!'

অর্থাৎ ভয় পাসনে। না, ভয় সে পায়নি। কারণ ভয় কি জিনিস জানে না সে। চাকুরী গিয়ে একদিক দিয়ে ভালই হল। দিন রাতের সব সময়টা দিতে পারল পার্টির কাজে।

কিন্তু বেশি দিন নয়। শুধু পোষ্টার লেখা, চাঁদা তোলা, শোভাযাত্রার লোক জোগাড় করে শংকর বেশিদিন সন্তুষ্ট রাখতে পারল না নিজেকে। আর এই অসন্তুষ্ট মনটা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতেই দেখা হয়ে গেল তাঁর সঙ্গে।

হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছ শংকর?

ভাল। আপনি?

এখনও কলকাতাতে ভাল ভাবেই আছি।

সেকি! আশ্চর্য হয়েছিল সে। জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি কি এখন কলকাতায় থাকেন না?

প্রায় দু'বছর হল উত্তর বাংলায় আছি।

তবে যে ওরা বলে........। কথাটা শেষ করেনি সে। হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল।

তিনি তেমনি হাসিমুখে বলেছিলেন, আমি নিজেই দু বছর হল এখান থেকে দূরে সরে গেছি।

কথাটা আর চেপে রাখতে পারে নি সে। বলেছিল, আপনি

বেইমানী করেছিলেন বলে, আপনাকে নাকি তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে

কথাটা শুনে এক মুহূর্ত নীরব হয়েছিলেন তিনি। রাগ করেন নি। একটু পরেই তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। সেই স্বভাবসিদ্ধ মিস্টি হাসিটুকু। মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, তোমাদের হয়তো বলে থাকবেন। তবে যা সত্য তা সত্যই।

আপনি উত্তর বাংলায় কেন গেছেন? জানতে চেয়েছিল সে।

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, কাজ করতে। সেবা ধর্ম নিয়েছি আমি।

সন্ন্যাসী হয়েছেন?

দেখে কি মনে হচ্ছে আমায়? সকৌতুকে জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

দেখেছিল সে। প্রায় দুটি বছর পরে দেখেছিল মানুষটিকে। সাধারণ মানুষটি। তেমনি অতি সাধারণ বেশভূষা। এতটুকু বাহুল্য নেই। নেই আড়ম্বর, অথচ ইচ্ছা করলে........

জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সন্ন্যাসী বলে মনে হচ্ছে?

না। আপনি তেমনি আছেন। এতটুকু পরিবর্তন হয়নি আপনার।

কিন্তু আমি যদি বলি আমার পরিবর্তন হয়েছে।

কেমন করে বুঝবো? স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল সে।

সত্যিই তো! হেসে বলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, সত্যি শংকর, তুমি ঠিকই বলেছ, বাইরে যদি কিছু পরিবর্তন না দেখ তাহলে বুঝবে কেমন করে। কিন্তু এ পরিবর্তন তো শুধু মাত্র বাহ্যিক নয়। পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছিল মনে। মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে এতদিন যে ভুল করে গেছি তার জন্যে অনুতাপ জেগেছিল। ভুল পথ পরিত্যাগ করে দু বছর আগে ছুটে গিয়েছিলাম তাই। আমি যদি কমিউনিষ্ট হই, দুনিয়ার

মেহনতী মানুষের একজন বলে যদি নিজেকে ভাবতে শিখি, তাহলে মিথ্যা বাবু কমিউনিষ্ট হয়ে সভায় শোভাযাত্রায় নিজের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করে কোন কাজ হবে না। যেতে হবে গ্রামে, ভারতবর্ষের কোটি কোটি কৃষক, যারা যুগ যুগ ধরে শোষিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত হচ্ছে তাদের মাঝে। শোষণ থেকে, শাসন থেকে, দারিদ্র আর ক্ষুধা থেকে মুক্তি আনতে পারে একমাত্র তারাই। সশস্ত্র কৃষকই আজ বিপ্লব সফল করতে পারে। জানো শংকর, 'বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈনিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে।' সে পথেই আমরা এগিয়ে চলেছি।

বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল সে। জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনারা যুদ্ধ করবেন ?

নিশ্চয়ই করবো। শ্রেণী শত্রুদের অত্যাচার ও নিপীড়ন প্রতিরোধ আমাদের করতেই হবে। অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে আমাদের। নকশালবাড়িব কৃষকরা সংগ্রাম সুরু করে দিয়েছে। একটু চুপ করে থেকে মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন, শংকর, ইতিহাসে যুদ্ধ দুই ভাগে বিভক্ত, একটি ন্যায়যুদ্ধ আর একটি অন্যায় যুদ্ধ। যে সব যুদ্ধ প্রগতিশীল সে সবই ন্যায় যুদ্ধ, আর সে সব যুদ্ধ প্রগতিতে বাধা দেয় সে সবই অন্যায় যুদ্ধ।• প্রগতিকে বাহত করে যে সব অন্যায় যুদ্ধ, আমরা কমিউনিষ্টরা সে সবে বিরোধিতা করি, কিন্তু প্রগতিশীল ন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা করিনা। আমরা কমিউনিষ্টরা শুধু যে ন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা করি না তাই নয়, বরং সে সব যুদ্ধে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণও করে থাকি। আমরা নকশালবাড়ির কৃষকদের ন্যায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। জনযুদ্ধের পথ ছাড়া জনগণেব কাছে আর অন্য কোন পথ নেই।

ফলাফল ?

প্রশ্নটা শুনে আবার হাসি ফুটেছিল তাঁর মুখে। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়েছিলেন। বলেছিলেন, যেখানে সংগ্রাম সেখানেই আত্মত্যাগ, মৃত্যু

সেখানে দৈনন্দিন ঘটনা। এই শিক্ষাই আমরা লাভ করেছি। তাই বিপ্লবকে সফল করতে হলে বিপ্লবী কর্মীকে ত্যাগ স্বীকার করতে শিখতে হবে, ত্যাগ করতে হবে সম্পত্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য, ত্যাগ করতে হবে পুরানো অভ্যাস এবং ত্যাগ করতে হবে আকাঙ্খা, ত্যাগ করতে হবে মৃত্যুভয় এবং সহজ পথ চলার চিন্তা, তবেই আমরা বিপ্লবীদের শ্রমসাধ্য দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করতে পারব। তবেই আমরা জনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারব মহত্তর ত্যাগে, যার আঘাতে সাম্রাজ্যবাদ, সংশোধনবাদ এবং ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ধ্বংস হবে এবং বিপ্লব সফল হবে। আবার একটু চুপ করেছিলেন তিনি। কি যেন চিন্তা করেছিলেন। কথা বলেন নি।

শংকর চুপ করে থাকতে পারে নি, তাঁকে ডেকেছিল।

গর্জে উঠেছিল তাঁর কণ্ঠটা। বলেছিলেন, জান শংকর, এতদিন আমরা মানুষকে ঠকিয়েছি। ধোঁকা দিয়েছি। নিরন্ন সর্বহারা ভারতের কোটি কোটি মানুষের প্রতিনিধি হয়ে আমরা তাদের সঙ্গে বেইমানী করেছি। আমরা বলেছি, দুনিয়ার মজদুর এক হও। কিন্তু মজদুরের সঙ্গে একাত্ম হতে পারি নি। আমরা সভা করেছি, শোভাযাত্রা করেছি। শোষিত সর্বহারা মানুষের দল আমাদের সেই সভায় গেছে। আমরা দামী পোষাকে, দামী মোটর চড়ে সেই সভার শোভাবর্দ্ধন করেছি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলেছি, আমরা এক, কিন্তু একাত্ম হতে পেরেছি কি? পারিনি। পারা সম্ভব নয়। কারণ কি জানো, আমরা আগে বাবু তারপর কমিউনিষ্ট।

তাঁর কথাগুলো শুনছিল শংকর। ভাল লাগছিল। কৌতুহল জাগছিল মনে। জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি এখন কি করেন?

কাজ করি।

কিন্তু আপনি তো………।

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, আগে করতাম না। কারণ

কাজ করার প্রয়োজন তখন অনুভব করিনি। তখন মিটিংয়ে ভাষণ দিতাম, তোমাদের কাছে জ্ঞানী-গুণী সাজতাম। কিন্তু আজ আমাকে কাজ করতে হয়। আমার ক্ষুধার অন্ন আমাকেই উপার্জন করে নিতে হয়।

কেমন করে ?

আমি আজ ডাক্তারী করি। গরীব চাষী, খেটে খাওয়া চা বাগানের কুলিদের আমি ডাক্তার। আমি তাদের রোগে ওষুধ দিই, সেবা করি রোগীর, তারা কখনো আমাকে ছুটি খেতে দেয়, কখনো সামান্য পয়সা। কেউ কিছুই দিতে পারে না, কারণ কিছু দেওয়ার সামর্থ অনেকেরই নেই। পেটের ভাত জোটে না, রোগের ওষুধ জোটাবে কেমন করে ?

কিন্তু আপনার কাজ ?

এই তো আমার কাজ। আচ্ছন্ন চেতনা মানুষগুলিকে জাগিয়ে তোলবার দায়িত্ব ভার আমার ওপর। আমরা অনেকেই আছি। দারিদ্র নিরন্ন মানুষের সেবা করি নানাভাবে। জোতদার যখন তার জমির ধান জোর করে কেটে নিয়ে যায় তখন সে কাঁদে আর কপালে করাঘাত করে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাহস তার হয় না, যদিও শক্তি তার আছে। আমরা তাদের দুর্বলতার কান্না মুছে ফেলতে বলি। অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে বলি।

এ পথে বিপ্লব সফল হবে ?

নিশ্চই হবে। হচ্ছেও। নকশালবাড়ির কৃষকরা জেগে উঠেছে। দীর্ঘদিনের অন্যায়, অত্যাচার আর শোষণের প্রতিশোধ নিচ্ছে। আপন অধিকার বোধ ফিরে পেয়েছে তারা। তারা বুঝেছে অধিকার তাদেরও আছে। তাই অন্যায়কারীদের শাস্তিবিধান করছে নিজের হাতে। কিন্তু প্রথমে তারা এপথে নামেনি, নামতে চায়নি। তারা সুদিনের আশায় বুক বেঁধেছিল। সুবিচার প্রত্যাশা করেছিল। ভেবেছিল তাদের নিজেদের সরকার নিশ্চই সুবিচার করবে। অনেকদিনের

অন্যায় অত্যাচার শেষ হবে। মিথ্যা, ভুল। কিছুই হল না। কিছুই পেল না তারা। মরুদ্যানের স্বপ্ন তাদের মিথ্যা হয়ে গেল। অত্যাচারী শোষক জোতদারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। বাধা দিয়ে রোধ করা গেল না তাদের গতি। কারণ এযে অধিকার রক্ষার লড়াই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে এযে ন্যায় যুদ্ধ।

আপনি এসময় কলকাতায় এসেছেন কেন? জিজ্ঞাসা করেছিল শংকর।

টাকার জন্যে।

টাকা?

হ্যাঁ। আমার সম্পত্তির ভাগের মূল্যটুকু নিয়ে যেতে এসেছি।

কেন?

টাকার আজ ভীষণ প্রয়োজন। আমার সম্পত্তির কোন মূল্য নেই আজ আর আমার কাছে। কারণ সম্পত্তি ভোগ করতে আমি কোনদিনই আসবো না।

কোনদিন আসবেন না?

না। স্পষ্ট অথচ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন তিনি।

অনেকক্ষণ চুপ করেছিল সে। মানুষটাকে দেখেছিল। চিনতে কষ্ট হচ্ছিল তার।

এক সময় তিনি বলেছিলেন, চলি শংকর!

আপনি কবে ফিরবেন?

কেন?

যদি দেখা করি।

হয়তো ত একদিন দেরি হবে। ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

তিনি চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ সেখানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সে। তারপর জনারণ্যে মিশে গিয়েছিল এক সময়।

পরদিন তখনো ভাল করে ভোরের আলো ফোটেনি। তাঁর দিয়ে যাওয়া ঠিকানার দরোজায় কড়া নেড়েছিল শংকর। দরোজা খুলে তাকে দেখে অবাক হয়েছিলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি ?

আমি আপনার কাছেই এলাম।

কেন ?

আমি আপনার সঙ্গে যাব।

তিনি যেন তার কথাটা বুঝতে পারেন নি। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমার সঙ্গে কোথায় যাবে তুমি ?

যেখানে নিয়ে যাবেন।

কিন্তু আমার তো থাকবার কোন আস্থানা নেই। কখনো চাষীর দাওয়ায়, গাছতলায়, সমিতির ঘরে, যখন যেখানে পারি রাত কাটাই। তুমি পারবে কেন ?

নিশ্চই পারবো। কথাটার ওপর জোর দিয়েছিল সে।

পারবে না শংকর। চার দেওয়ালের মধ্যে থাকা অভ্যাস হয়ে গেছে তোমার। বিছানায় ঘুমাও। মাটিতে শুলে অসুখ করবে। তাছাড়া খাবে কি ?

কাজ করলে খেতে পাবো না ?

কাজটা তুমি পাচ্ছ কোথায় ?

কেন, কোন চাষীর বাড়ি ?

চাষীর বাড়ি! মৃদু একটু ম্লান হাসি ফুটেছিল তাঁর মুখে। বলেছিলেন, গ্রাম তুমি দেখেছ, চাষীর বাড়ির গোলাভরা ধানও দেখে থাকবে, কিন্তু প্রকৃত চাষী যারা তাদের বাড়ী তুমি দেখনি। তা যদি দেখতে তাহলে এমন কথা উচ্চারণ করতে পারতে না, তোমার কষ্ট হত। প্রকৃত চাষী তারা, যারা জমি চাষ করে ফসল ফলায়, রোদে জলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে কাটে দিন। তাদের ঘরের চাল ছাওয়ার জন্যে খড় জোটে না, কাজের শেষে ঘরে ফিরে জোটেনা পেট

ভরা ক্ষুধার অন্ন। যাদের নিজেদের অন্ন জোটে না তারা তোমাকে দেবে কোথা থেকে? জোতদারের দল ওৎ পেতে বসে থাকে। চাষীর রক্তে বোনা ধান পাকামাত্র কেটে নিয়ে গিয়ে খামারে তোলে। শত অনুনয় বিনয় কান্না কাটিতেও কোন ফল হয় না। জোর করতে পারে না। পরের বছর বলতে পারে না চাষ করবো না। কারণ জোতদারের সিন্দুকে পোরা আছে বাস্তুভিটের দলিলটাও। শুধু ওখানে নয়, বাংলা দেশে, সমস্ত ভারতবর্ষের এই এক চিত্র।

তাহলে আমি কি করবো? জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছিল তার কণ্ঠে।

কি করবে? জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

ভুল পথে তো আর চলতে পারি না।

কিসের ভুল?

আমার চিন্তার, বিশ্বাসের।

মুখের কথা, না উপলব্ধি?

আমি উপলব্ধি করেছি। আমি বুঝতে পেরেছি ভুল পথে আর নয়।

মাত্র একদিনে?

যা সত্য তা দিন ঘণ্টা মাসের হিসাবে হয় না। অন্ধত্ব দূর হয়েছে আমার। শেষ মোহটুকু ত্যাগ করতে পেরেছি আমি।

এযে আধ্যাত্মিকতা?

ঠাট্টা করছেন।

না জানতে চাইছি।

ভুল বোঝানো হয়েছিল, শেখানো হয়েছিল, ভুল পথে পরিচালিত করা হয়েছিল। অনেকদিন থেকেই মনে হচ্ছিল, ভুল করছি, ভুল পথে চলছি। ভুলে ভরিয়ে ফেলেছি জীবনটাকে, অপব্যবহার করেছি শক্তির। আত্মবিশ্বাস শিথিল হচ্ছিল। পড়েছিলাম তাঁর কথা, একজন যুবক বিপ্লবী কিনা, তা বিচার করতে কিরূপ মানদণ্ড ব্যবহার করা উচিৎ? কেমন করে পৃথক করা যায়? কেবল একটা মাত্র মানদণ্ড আছে, তা

হচ্ছে সে নিজেকে ব্যাপক শ্রমিক-কৃষক সাধারণের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে ইচ্ছুক কিনা এবং বাস্তবে তা করছে কিনা। যদি সে এমন করতে ইচ্ছুক থাকে এবং বাস্তবে শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে মিশে যায়, তাহলে সে একজন বিপ্লবী; অন্যথায় অবিপ্লবী অথবা প্রতিবিপ্লবী। যদি আজ সে নিজেকে শ্রমিক-কৃষক সাধারণের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে, তাহলে আজই সে বিপ্লবী; কিন্তু আগামীকাল যদি সে তাদের সঙ্গে না মেশে অথবা সাধারণ জনগণকে অত্যাচার করে, তাহলে সে হবে অবিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবী। কথাগুলো বিশ্বাস করিনি। কিন্তু দিন দিন অবিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবীতে পরিণত হচ্ছিলাম। কেউ আমার বা আমাদের দলের সম্বন্ধে কিছু বলুক এটা চাইছিলাম না। সমালোচনা রাগে অন্ধ করে তুলছিল। অত্যাচার করতে ইচ্ছা করছিল।

কেন?

আমরা ভাল, আমরা ঠিক। সাধারণকে মূল্য দিতে ভুলে যাচ্ছিলাম।

তুমি?

আমিতো নিশ্চই। আরো কারো কারো কথা জানি। অথচ আপনাদের তিনি বারবার বলেন, 'জনগণকে চেন, জনগণকে বোঝ, জনগণকে গুরু মানো।'

তিনি সত্য কথাই বলেন। আর এ সত্য যে কত বড় মহাসত্যের রূপ নিয়েছে তা আমাদের দেশের মানুষের দিকে তাকালে তুমিও বুঝতে পারবে। আমাদের দেশের জনগণ বলতে আমার মনে হয়, মেহনতী মানুষ। কারণ ভারতের জনগণের বিরাট অংশ এরাই। মার্কস বলেছেন, সমাজের মেহনতী মানুষ অর্থাৎ কৃষক শ্রমিক শ্রেণীই তাদের নিরলস শ্রমের দ্বারা সমাজে নানারকমের পার্থিব সম্পদ সৃষ্টি করে মানুষের সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। রাজা মহারাজা নয়, মেহনতী মানুষই ইতিহাসের প্রকৃত স্রষ্টা। অথচ এরাই মার খাচ্ছে দিনের পর

দিন। কারণ অধিকার রক্ষার যা কিছু সবই ধনীর স্বার্থে। ধনী গরীবের বিভেদের প্রাচীর দূর করার মহান দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরাও আজ ধনীর স্বার্থেই যত্নবান।

শংকর বলেছিল, সেইজন্যই আমি নতুন পথে যাত্রা সুরু করতে চাই। যদি মরতে বলেন তাহলেও আমার কোন আপত্তি থাকবে না।

কিন্তু আমাদের লড়াইতো মরার জন্যে নয়, আমাদের লড়াই বাঁচার লড়াই। আমাদের ভালভাবে বাঁচার পথে যারা বাধা সৃষ্টি করছে, অন্যায় ভাবে যারা আমাদের অধিকার হরণ করে রেখেছে সেই শ্রেণী শত্রুদের ধ্বংস করতে চাই, তাতে যদি মৃত্যু আসে সেতো মৃত্যু নয়, তার নাম বাঁচা। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের মৃত্যুই তো গর্বের। মৃত্যুই তো তার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

আমি কী করবো?

কী করবে?

আমাকে আপনি সঙ্গে নিয়ে চলুন। ব্যাকুল কণ্ঠে বলেছিল সে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি, তারপর বলেছিলেন, বেশ যাবে!

সমস্ত গ্রামটা তখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে। নীচু চালের ছোট ছোট ঘরগুলো একের পর এক ভস্মীভূত হচ্ছে আগুনের লেলিহান শিখার স্পর্শ পেয়ে। চারিদিকে ধোঁয়া আর কাঠ পোড়া গন্ধে বাতাস ভারি। দূরের পাহাড়ের মাথায় মাথায় বিদায়ী সূর্যের রক্তিমাভা। সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে শ্রীকাকুলামের আকাশে। বাদাম ক্ষেতের ঝোপে ঝোপে। বৃক্ষ শ্রেণীর ডালে ডালে।

অন্ধ্র রাজ্যে পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী দুপুরের একটু আগেই আট দশটা ঘরের সমষ্টি গ্রামটির ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সংখ্যায়

শতাধিক। হাতে গুলিভরা উদ্যত রাইফেল। তারা নাকি খবর পেয়েছে গ্রামটার ঘরে ঘরে গেরিলারা আশ্রয় নিয়েছে।

খবর তারা ঠিকই পেয়েছিল। কেউ না কেউ বেইমানী করে খবর দিয়েছিল তাদের। নাহলে এমন ভাবে তারা কখনও আসে না।

গ্রামের মানুষগুলির তখনও খাওয়া দাওয়া হয় নি। তাদের খাওয়া হল না। গ্রামের এক থুত্থুরে বুড়ি হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এল। বলল, পালাও তাড়াতাড়ি।

চেন্না জিজ্ঞাসা করল, কেন?

পুলিশ আসছে, পুলিশ।

খাওয়া আর হল না। ছুটে গিয়ে ঢুকতে হল জঙ্গলে। পথ করে নিয়ে পাহাড়ের একটা ফাটলের পাশে আশ্রয় নিল দুজনে। সেখান থেকেই দেখতে পেল কুকুরগুলো ঘিরে ফেলল গ্রামটা। প্রথমে লাথি মেরে ফেলে দিল মুখের খাবার। তারপরই নির্বিচারে সুরু হল মারপিট, সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ। নারী, শিশু, বৃদ্ধ কেউ রেহাই পেল না। বীরের দল বীরদর্পে ঘর দোর ভেঙ্গে তছনছ করে যাওয়ার সময় আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল।

অত্যাচারীর জ্বালানো অগ্নিশিখার দিকে ওরা চেয়ে রইল নির্নিমেষ। কণ্ঠে ভাষা নেই, চোখে আগুন।

একজনের কণ্ঠ শোনা গেল, এর শোধ আমরা নেবই।

চেন্নার মুখের দিকে তাকাল শংকর। ওর দৃষ্টি অগ্নি শিখার দিকে নিবদ্ধ। ও চেয়ে আছে। ও দেখছে কেমন করে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে ওর আশৈশবের গ্রামখানি। যেখানে জন্মেছে, বড় হয়ে উঠেছে।

চেন্নার চোখেও কি আগুন? প্রতিজ্ঞা? ও-ওকি প্রতিশোধ নিতে চায়?

দেখতে চাইল শংকর। ওর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল। মৃদু কণ্ঠে ডাকলো, কমরেড!

চেন্না ফিরল। বলল, বল!

একটু ইতস্ততঃ করল শংকর। বলল, কি ভাবছিলে?

দেখছিলাম।

কি?

প্রশ্নটা শুনে হাসল ও। বলল, অত্যাচারীর দম্ভের প্রকাশ। শাসক শ্রেণীর শোষণ যন্ত্র কেমন নির্বিচারে স্তব্ধ করে দিতে চায় মানুষের জীবন-যাত্রা এটি তারই নিদর্শন। ওরা আমাদের আঘাতের পর আঘাত হেনে বিপ্লবকে শেষ করে দিতে চায়। কিন্তু ওরা জানে না যে, আরো বড় আঘাতের জন্য আমরা প্রস্তুত। কারণ আমরা জানি, বিপ্লব সফল করার পথে আরো বড় বাধা আমাদের সামনে আসবে। আঘাতও আমাদের সহ্য করতে হবে। তিনি বলেছিলেন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হোন, আত্মবলিদানে নির্ভর হোন, সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করুন, বিজয় অর্জন করুন। তাঁর কথাকে সত্য বলে জেনেছি। গ্রহণ করেছি তাঁর পথ নির্দেশ। কিন্তু····

কমরেড!

আমি ভাবছি আমাদের গ্রামে আসবার সংবাদ পুলিশের কাছে পৌঁছে দিলে কে? পুলিশ নিজেরাই আমাদের সন্ধান পেয়েছে এ সত্য হতে পারে না। নিশ্চই কেউ না কেউ বেইমানী করেছে। বেইমানটাকে খুঁজে বার করতে হবে আমাদের। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে অন্যায়ের শাস্তি কি ভীষণ। আর····

কমরেড!

হ্যাঁ কমরেড। আমাদের চলার পথে যে বাধা সৃষ্টি করবে তাকে আমরা কিছুতেই ক্ষমা করবো না। সে যদি আমার অতি প্রিয়জন হয় তবুও নয়। কারণ শত্রুকে ক্ষমা করতে নেই।

কথা কটা শেষ করে দূরে আগুনের দিকে চেয়ে রইলো চেন্না রাও। তরুণ যুবক। বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের অধিকারী। জন্মেছে শ্রীকাকুলামের

পাহাড়ী গ্রামটিতে। ভূমিহীন কৃষকের ঘরের সন্তান। বাবা পরের জমিতে জন মজুর খাটতেন। কিন্তু ছেলেকে অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। উপসী থেকে লেখাপড়ার খরচ চালিয়েছেন। স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়েছে সে। দিনে পড়া, রাতে কুলির কাজ করেছে চেন্না। পড়াশুনার খরচ চালিয়েছে কষ্টে। বিশাখা পত্তনম-এর অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়েছে একদিন। কিন্তু গ্রামকে ভুলতে পারেনি। ফিরে এসেছিল গ্রামে।

আজই সকালে পাহাড়ী পথে চড়াই উৎরাই পার হতে হতে বলেছিল চেন্না, আমার গ্রামে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি কমরেড। দেখবে কি সুন্দর আমাদের গ্রাম। কত ভাল লাগবে তোমার। পড়াশুনার জন্য অনেকদিন আমাকে শহরে থাকতে হয়েছে কিন্তু তোমাকে সত্যি বলছি, একটি দিনের জন্যেও আমি আমার গ্রামকে ভুলতে পারিনি।

ভুলতে পারেন নি আর একজন। ফিরে এসেছিলেন গ্রামে।

পঞ্চাদ্রী কৃষ্ণমূর্তি।

ভারতের বুকে যখন মাও সে তুঙ চিন্তা ধারার বিজয় বৈজয়ন্তী নকশালবাড়িতে সগৌরবে উড়েছে, তখন তার আলোড়নের মধ্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শ্রীকাকুলাম জেলার সমুদ্রতটে সোমপেটা তালুকের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম—বড্ড পড়।

দরিদ্র কৃষকের ঘরের ছেলে। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাশ করে ফিরে এসেছিলেন গ্রামে। আপন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভাল চাকুরীর মোহ ত্যাগ করে সর্বক্ষণের পেশাদার বিপ্লবী হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন বড্ড পড়ুতে।

সি. পি (এম) এর বর্ধমান প্লেনামের পর অন্ধ্রের বিপ্লবী কমরেডরা সি. পি (এম) থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিলেন, আলাদা অন্ধ্র প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হল, কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্য হিসাবে এই

প্রাদেশিক নেতৃত্বের একভাগ দখল করে বসলো নাগী রেড্ডী আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা।

কমরেড পি. কে, কমরেড সি. তেজেশ্বর রাও প্রভৃতি শ্রীকাকুলামের কমরেডরা সুরু থেকেই নাগী রেড্ডীদের পছন্দ করেননি, শুধু ওপর ওপর সম্পর্ক রেখেছিলেন এবং প্রথম থেকেই নিজেদের জেলায় সম্পূর্ণভাবে নিজেদের লোক নিয়ে জেলা সংগঠন করেছেন, নীচের তলায় সংগঠনগুলি গড়তে লেগেছেন।

সুরু হল রাজনৈতিক প্রচার। জোয়ার এল বড্ড পড়ু গ্রামে। নতুন কথা শুনলো মানুষ।

শুনলো নকশাল বাড়ির কথা, চীনা বিপ্লবের অসাধারণ ইতিহাস।

একটি নাম। একটি মানুষের কথা। যিনি আপোষহীন সংগ্রাম করে একটা জাতিকে সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহন করিয়েছেন। শোষিত নিপীড়িত জনগণের জীবনে এনে দিয়েছেন মুক্তি। মানুষের অধিকারে অধিকারী হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন মানুষকে। অত্যাচারী শাসকের শোষণ যন্ত্রকে চীনের জনগণ কেমন করে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছিল শুনেছে সে কথা।

শহর নয় গ্রাম। সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবই পারে অত্যাচারীর টুঁটি টিপে ধরতে। শহরের পথে মিছিলে শ্লোগানে নয়, শ্রেণী সংগ্রামের প্রকৃত ক্ষেত্র গ্রাম। গ্রাম থেকে শহর।

আমাদের বেঁচে থাকা অথবা মরে যাওয়া সব কিছুই জনগণের জন্যই। বাঁচি অথবা মরি—বিপ্লব সফল করাই শেষ লক্ষ্য—জীবনে বিপ্লব অপেক্ষা মহত্তর কিছুই থাকতে পারে না। আসুন, বিপ্লবী ঘাটি অঞ্চল গড়ে তুলি। আসুন, গণফৌজ গড়ে তুলি। চেয়ারম্যান মাও আমাদের বলেছেন, 'জনগণের সৈন্যদল ছাড়া জনগণের কিছুই থাকে না।'

গরীব চাষী, কিশোর, যুবকরা নিজেদের উদ্যোগে গড়ে তুললেন এক সংগঠন। নামকরণ করলেন ত্যাগী সঙ্ঘম—আত্ম ত্যাগীদের সঙ্ঘ।

উদ্দেশ্য, বিপ্লবের জন্য যারা সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারবে এমন কর্মী গড়ে তোলা।

নিরাশ হতে হল না। প্রায় প্রতিটি গরীব চাষীর বাড়ি থেকে একজন না একজন সব ছেড়ে এগিয়ে এল। এল মাঝারী কৃষকের বাড়ি থেকেও।

নাগী রেড্ডীর দল যেন এতটা আশা করে নি। তারা ভাবতে পারে নি পি. কে. দের আহ্বানে মানুষ এভাবে সাড়া দেবে, ঘর ছাড়বে। কৃষক আন্দোলন সার্থক করতে ছুটে আসবে বুকের রক্ত দিতে।

ওরা চেয়েছিল জমি পাওয়ার ও উচ্ছেদ বন্ধের আন্দোলনের অর্থনৈতিক জ্ঞান আগে দিয়ে সংগঠন গড়ে তবে তাকে সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি বোঝালে সে তো বুঝবেই না আর এ না করে সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি দিলে নাকি হবে হঠকারিতা।

এদের সম্বন্ধে চেয়ারম্যান বলেছেন, জনসাধারণের মধ্যে নিহিত রয়েছে খুবই বিরাট সমাজতান্ত্রিক সক্রিয়তা। বিপ্লবী যুগেও যাঁরা শুধু পুরানো গতানুগতিকতাকে অনুসরণ করে চলতে সক্ষম, তারা এই সক্রিয়তাকে একেবারেই দেখতে পান না। তাঁরা অন্ধ, তাঁদের সামনে সব কিছু অন্ধকার। এমন কি, কখনো কখনো তাঁরা এতদূর যান যে, ভুল নির্ভুল তালগোল পাকিয়ে দিনকে রাত করে বসেন।

তালগোল পাকিয়ে বসল নাগী রেড্ডীর দল। জনগণের এই সক্রিয়তাকে অগ্রাহ্য করতে চাইলো। ওরা বলতে লাগলো, এপথ নয়, এ পথ ভুল পথ।

ওরা চাইলো, গণ আন্দোলন মিছিলে, পোষ্টারে, সভাসমিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক। সশস্ত্র গণ অভ্যুত্থানের সময় এখনো আসেনি।

ওরা একদিন লিখলো, "এই পরিস্থিতিতে কিছুলোক নিজেরা কতকগুলি গ্রুপ তৈরী করে এবং গণ আন্দোলনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে

জমিদারদের ও অন্যান্য শোষকদের আক্রমণ করছে। আমরা জানিয়ে দিতে চাই গণ বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই ধরণের আক্রমণ চালিয়ে সামন্তবাদ ধ্বংস করা যায় না এবং গণ বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। একমাত্র গণ বিপ্লবী জন সমাবেশ, বিপ্লবী সংগঠন এবং গণ সশস্ত্র সংগ্রাম মারফৎই বর্তমান বড় জমিদার, বড় বুর্জোয়া, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ধ্বংস করা যায়। মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারা—সবই আমাদের এই সত্যই শিক্ষা দেয়। সমস্ত বিপ্লবীদের নিষ্ঠাভরে এই পথই অনুসরণ করতে হবে। এই দিক থেকে দেখলে বলতে হয়, এই সব গ্রুপের দ্বারা এই ধরণের আক্রমণগুলি মার্কসবাদ—লেনিনবাদ—মাও চিন্তাধারার বিরোধী।"

একথা বলার আগে যে ঘটনা ঘটেছিল তা বিচার বিবেচনা করে দেখতে গেলে কিছুই নয়।

১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাস।

বড়ড়পড়ু এবং আরো কয়েকটি গ্রাম থেকে কিছু কমরেড একটি রাজনৈতিক প্রচার মিছিল নিয়ে গরুড়ভদ্রা গ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। শুধু পুরুষ নয়, এগিয়ে এলেন মেয়েরাও। এলেন পি, কে-র স্ত্রী কমরেড নির্মলা কৃষ্ণমূর্তি।

স্থির হল মেয়েরা থাকবেন মিছিলের পুরোভাগে। তাঁরাই হলেন প্রধানা।

শান্তিপূর্ণ ভাবে এগিয়ে চলল মিছিল। হাজির হল গরুড়ভদ্রা গ্রামের সীমান্তে।

জমিদার গুণ্ডার দল নিয়ে আগে থেকেই তৈরি ছিল। মিছিল বাধা দিল ওরা। বলল, মিছিল ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

কেন? জানতে চাইলেন ওঁরা।

বলল, আমাদের গ্রামে মিছিল প্রবেশ করতে আমরা দেব না।

কিন্তু কেন প্রবেশ করতে দেবেন না তাতো বলবেন? শান্তভাবে জানতে চাইলেন ওঁরা।

মালিকের হুকুম। তাঁর এলাকায় তিনি মিছিল ঢুকতে দেবেন না।

কেন?

তাঁর ইচ্ছা।

এ তাঁর অন্যায় ইচ্ছা। গ্রামের তিনি জমিদার হতে পারেন কিন্তু নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

তোমরা ফিরে যাবে কিনা?

আমরা ফিরে যাওয়ার জন্য তো আসিনি। কোন ভয় আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। গুণ্ডাদের অশ্লীল কথাবার্তায় ওঁরা ছিলেন ধীর স্থির শান্ত। দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ওরা। অন্ধ আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়লো মিছিলের ওপর। সুরু হল মারধোর। কারো মাথা ফাটলো, কারো বা হাত পা। মেয়েরাও রেহাই পেলেন না। কমরেড নির্মলাকে অপমান করল পশুর দল।

গরুড়ভদ্রার মাটিতে ঝরে পড়লো মিছিলের মানুষগুলির রক্ত। তবু এগিয়ে চললেন ওঁরা। একে অন্যকে তুলে নিল। তবু রুদ্ধ হল না চলার গতি।

গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দাঁড়ালেন ওঁরা। আহতদের শুশ্রূষায় মন দিলেন।

ততোক্ষণে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে সংবাদ। যে মানুষটি কোন দিন ওঁদের দিকে ফিরে চাননি সংবাদ শুনে তিনিও ছুটে এলেন। এ অন্যায়—অত্যাচার। এ অন্যায়ের ক্ষমা নেই।

পাঁচ সাতখানা গ্রামের মানুষ ছুটে এল। খুঁজে ফিরলো জমিদার আর পশুগুলোকে।

কিন্তু কোথায় তারা ? তারা তখন পালিয়ে গেছে। থানায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে শান্তি রক্ষকদের কাছে।

ওরাও ফিরে গেল। কেটে নিয়ে গেল জমিদারের ফসল। যে ফসল ন্যায্য অধিকারীদের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিয়েছিল জমিদার।

নালিশ করলেন জমিদার। ওয়ারেণ্ট বেরুলো প্রায় সমস্ত কমরেডদের নামে। শান্তির দূত পুলিশের দল নিরীহ জমিদারকে বাঁচাবার জন্যে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত খুঁজে ফিরতে লাগলো ওঁদের।

ওঁরা সমতল ছাড়লেন। ঘরের বন্ধন ছিন্ন করে আশ্রয় নিলেন পাহাড়ে জঙ্গলে। শ্রীকাকুলামের পর্বতে গেরিলা স্কোয়াড গঠনের প্রাথমিক ভিত্ তৈরি হল ওয়ারেণ্ট-হওয়া কমরেডদের নিয়ে।

নতুন পথে যাত্রা সুরুর শপথ নিলেন ওঁরা। নাগী রেড্ডীদের সঙ্গে ছিঁড়ে ফেললেন সমস্ত সম্পর্ক।

ওরা কিন্তু তখনও চীৎকার করে চলেছে, সর্বনাশ হল ! ভুল হল ! সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই আর থাকলো না।

এ মাও-বিরোধী, চে গুয়েভারার লাইন। গেরিলা লড়াইয়ের সময় এখনও আসেনি। আগে জানো, শেখো তারপর যা কিছু করার ভেবে চিন্তে করো।

অথচ তুনিয়ার কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাসে মার্কস থেকে শুরু করে চেয়ারম্যান পর্যন্ত প্রত্যেক মার্কসবাদী শিক্ষাগুরু তাদের জীবনে একটিমাত্র ঘটনা থেকে সার্বজনীন সত্যের সাধারণ সূত্রীকরণ করেছেন। মার্কসের জীবনে প্যারী কমিউন, লেনিনের জীবনে ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারী পাদ্রী প্যাপনের ঘটনা, চেয়ারম্যানের জীবনে হুনানের কৃষক আন্দোলন—এঁদের সকলের জীবনেই এরকম দৃষ্টান্ত আছে।

কিন্তু ওরা তা মানতে চায় না। আগে কর, তারপর শেখো অর্থাৎ করে শেখো বা করতে করতে শেখো। কিছু না করলে যে কিছু শেখা

যায় না ওরা তা মানতে চায় না। ওরা চায় শিখে করতে। কিন্তু কোন পথে? সে সত্য জানলেও ওরা স্বীকার করতে চায় না। যা সত্য, অবশ্যম্ভাবী তা ওরা মানতে ভয় পায়।

কারণ সত্যকে স্বীকার করতে যে সাহস এবং বিশ্বাসের প্রয়োজন, সে সাহস এবং বিশ্বাস ওদের নেই। মানুষকে ওরা অবিশ্বাস করে। আমিত্বের অহংকারটুকু বড় উগ্র ওদের জীবনে।

কিন্তু ওরা?

ওরা সকলের, সমস্ত মানুষের।

শ্রীকাকুলামের বিপ্লবী কবি অমর শহীদ কমরেড সুব্বা রাও পাণিগ্রাহী বললেন:

যারা খেটে খায় আমরা তাদেরই
আমরা কমিউনিষ্ট,
আমাদের মত মানো বা না মানো
আমরা রবো সেই 'ইষ্ট'।
আমরা কমিউনিষ্ট........
ন্যায়ের পতাকা তুলেছি আমরা
অন্যায়েরই যম,
বাধার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে লক্ষ্যে
চলেছি জোর কদম।
আমরা কমিউনিষ্ট........

মোদের ঝাণ্ডা লালে লাল খুনে
মেহনতী জনতার
দু'চোখে স্বপ্ন শত শহীদের
চলেছি দুর্নিবার।
আমরা কমিউনিষ্ট........

আমাদের ভাবে আমরা ভাবুক
তোমাদের ভাব মানি না
খুন হলেও মোরা নোয়াইনা মাথা
নিজেরে ঠকাতে জানি না,
আমরা কমিউনিষ্ট........

জনতারে নিয়ে চলেছি এগিয়ে
লক্ষ্য করিব জয়,
সমাজেরে মোরা ভাঙ্গিয়া গড়িব
নির্মম নির্ভয়।
আমরা কমিউনিষ্ট........

হাত দিয়ে, বলো, সূর্যের আলো
রুধিতে পারে কি কেউ?
আমাদের ধ'রে ঠেকানো কী যায়
জন জোয়ারের ঢেউ?
আমরা কমিউনিষ্ট........

তোমাদের মত আমরা টাকায়
বাজারে করিনা বেসাতি,
নির্ভীক মোরা, পীড়নের ভয়ে
হবনা শোধনবাদী।
আমরা কমিউনিষ্ট........

থাকব না মোরা নিজেদের জিলা
নিজেদের জাতি নিয়ে

সারা দুনিয়ার মজদুর মোরা
বাঁধিব ঐক্য দিয়ে।
আমরা কমিউনিষ্ট……

এর পরই কমরেড কৃষ্ণমূর্তি গেলেন উত্তর বাংলায়। দেখলেন নকশালবাড়ি। যে নকশালবাড়ির লাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। সর্বহারা শ্রেণী খুঁজে পেয়েছে পথ। মুছে দিয়েছে শুধুমাত্র একটি রাজ্যের সীমারেখা।

দেখা করলেন শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড চারু মজুমদারের সঙ্গে।

বললেন, আমি শুধু আপনাকে দেখতে আসিনি কমরেড। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনার জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে শ্রীকাকুলামের মানুষ। আপনি আমাদের পথ নির্দেশ করুন।

পি, কে-র কথা শুনে কমরেড উজ্জ্বল দুই চোখে ক্ষণকাল তাকিয়ে ছিলেন মুখের দিকে। মৃদু অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, পথ নির্দেশ তো তিনিই দিয়েছেন। "একশ বছর ধরে দুর্দশাগ্রস্থ চীন জাতির সবচেয়ে সেরা ছেলে মেয়েরা একজন পড়ে যাবার পর অন্যজন ফাটলে পা বাড়িয়ে দিয়ে লড়াই করে গেছেন,—জীবন বলি দিয়েছেন সেই সত্যের সন্ধানে, যা দেশ এবং জনগণকে মুক্ত করতে পারে। এই ইতিহাস আমাদের কণ্ঠে গান এনে দেয়, চোখে জল আনে।"

যেখানে যত গ্রাম সেখানেই আত্মত্যাগ, মৃত্যু সেখানে দৈনন্দিন ঘটনা। তাই বিপ্লব সফল করতে হলে বিপ্লবী কর্মীকে ত্যাগ স্বীকার করতে শিখতে হবে, স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করতে হবে, নামের আকাঙ্খা, ত্যাগ করতে হবে মৃত্যু ভয়।

চিনতে হবে কে শ্রেণী শত্রু, কে নয়। ভুল করে যেন নিজের মিত্রকে শত্রু না ভাবি। হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে জনগণ ভুল

করবেন। কিন্তু সেই ভুলকে ভুল বলেই গ্রহণ করতে হবে আমাদের। তাঁদের ভুলের জন্যে তাঁদের প্রতি আমরা যেন অবিচার করে না বসি, শাস্তি দিতে উদ্যত না হই। কারণ আমাদের শত্রু এবং দেশের শত্রু সাধারণ মানুষ নন। শত্রু শোষক শ্রেণী। এ যুদ্ধ আমাদের জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। এ যুদ্ধের বিজয়ই হল দেশের জনগণের মহান ভবিষ্যতের আধার। অত্যাচার, উৎপীড়ন আর শোষণ পাহাড় প্রমাণ হয়ে আছে। অত্যাচার, উৎপীড়ন আর শোষণ থেকে জনগণকে মুক্ত করার মহান এবং পবিত্র দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। হাজার হাজার বীর বিপ্লবীর বুকের রক্ত আমাদের ঢেলে দিতে হবে। দেশের বুকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে প্রকৃত সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ।"

একদিন আমরা মনে করতাম শত্রু আমাদের সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ। ইংরেজকে দেশছাড়া করতে পারলেই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। অনাহারে অর্দ্ধাহারে যারা দিনাতিপাত করে, সমাজের সর্বহারা শ্রেণী সুদিনের মুখ দেখতে পাবে। পাবে ক্ষুধায় আহার, শিক্ষা, ভবিষ্যৎ।

শত্রু আমাদেব ইংরেজ নয়—শত্রু ইংরেজের শাসন পদ্ধতি। এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রামই হল স্বাধীনতার সংগ্রাম।

আজ দেশের শত্রু, জাতির শত্রু ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু সে শাসন পদ্ধতির এতটুকু পরিবর্তন হয় নি। কায়েমী স্বার্থ আজ জাঁকিয়ে বসেছে। যাঁরা একদিন বুলেটের কথা বলতেন, আজ তাঁরা ব্যালটের পথ ধরেছেন। গণ আন্দোলন নির্বাচন লড়াইয়ে লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল।

শ্রেণী শত্রু কারা?

ধনী জমিদার, জোতদার, দালাল, দেশের ধনীক সমাজ। শুধু এরাই না, এদের যারা সাহায্য করে, হাত মিলিয়ে চলতে চায়, তারা নয় কেন?

সর্বহারা শ্রেণীর অধিকার হরণ করে যারা দিনের পর দিন অন্যায়,

অবিচার, অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। মুখের গ্রাস থেকে বঞ্চিত করছে। শুধু তারা ?

না, যারা আন্দোলনের নামে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে তারাও।

তাঁর অমর বাণী হচ্ছে :

"তিক্ত আত্মত্যাগ সাহসী সঙ্কল্প আনে,
যা নতুন আকাশে সূর্য ও চন্দ্রকে উদিত কবার
সাহস দেয়।"

দিনের পর দিন আত্মত্যাগে সঙ্কল্পে অটল সর্বহারা শ্রেণী। হয় মৃত্যু অথবা মুক্তি !

এখনো আমরা প্রস্তুত হতে পারি নি !

ট্রেনিং না নিয়ে লড়াই করা সঠিক নয়।

এখনো লড়াই সুরুর সময় হয় নি।

সমানে সাবধান করতে লাগলো নাগী রেড্ডীর দল। বলল, যুদ্ধ জিনিসটা ছেলেখেলা নয়। প্রয়োজন ট্রেনিংয়ের। যুদ্ধ শিখে তবেই যুদ্ধ করতে হয়।

অথচ চেয়ারম্যান বলেছেন, যুদ্ধ করেই যুদ্ধ শিখতে হয়। ট্রেনিংয়ের চাঁদমারি নয়, শত্রুর বুকই হল বন্দুকের নিশানা অভ্যাসের চাঁদমারি।

অবশেষে ওরা সত্য কথাটার প্রকাশ করলো। বলল, জঙ্গী আন্দোলনের প্রয়োজন কী ? সরকারী অত্যাচার কিছুটা শিথিল হয়েছে। সুতরাং আইন সঙ্গত ভাবেই এই সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করা উচিৎ। জনগণের কাছে মজুরীর হার বৃদ্ধি, শ্রমিকদের সমস্যা এবং খাদ্য সমস্যা নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক পথে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠদের সংগঠিত করে আন্দোলন।

পুলিশের অত্যাচার কিছুটা কমলেও বন্ধ হয়নি। সাধারণ মানুষ,

খেটে খাওয়া মানুষ, যাকেই তাদের সন্দেহ হচ্ছে নাকালের একশেষ করছে। তল্লাসীর নামে তছনছ করে দিচ্ছে সাজানো সংসার !

কিন্তু ওরা বলল, যাদের নিরাপত্তার জন্যে পুলিশ মানুষের ওপর অত্যাচার করছে, সেই জমিদার জোতদারদের দু চারজনকে শাস্তি দেওয়া চলতে পারে, কিন্তু পুলিশের গায়ে হাত তোলা সমীচিন হবে না। কেন না পরিণতি তাহলে অত্যন্ত সাংঘাতিক হবে।

ভয়! শুধু ভয় নয়, তোষণ নীতি। জনযুদ্ধের পথকে বিভিন্ন ভাবে ভিন্ন মুখি করতে চাইলো ওরা।

কমরেড চারু মজুমদার বললেন, গেরিলা দল গঠন করে এখনি সংগ্রাম সুরু করুন।

বেকায়দায় পড়ে অনেক মিথ্যা ভাষণের পর নাগী রেড্ডীর দল বলল, জমিদার শ্রেণীকে নির্মূল করাই উচিৎ।

জনযুদ্ধের নামোল্লেখ ওরা করল না। কারণ বিপ্লবকে ওরা ভয় পায়। ওরা সুখে শান্তিতে থেকে সর্বহারার গণবিপ্লবের স্বপ্ন দেখে শুধু। বন্দুক নয় সস্তা হাত তালির ভক্ত ওরা।

ওরা বাবু কমিউনিষ্ট।

১৯৬৮ সালের ২৫শে নভেম্বর।

ওয়ারেন্ট বেরুলো। কমরেডদের নিয়ে গঠিত গেরিলা বাহিনী একের পর এক অভিযানে অংশগ্রহণ করলেন। শ্রেণী শত্রুর বুকের রক্তে মুছে দিতে লাগলেন বহু দিনের অন্যায় পাপ আর শোষণের ইতিহাস। অন্ধকার রাত্রি শেষে উঠলো দিনের সূর্য। লালে লাল হয়ে গেল সমস্ত শ্রীকাকুলাম।

ওঁরা মুক্ত কণ্ঠে গাইলেন :

'উঠে দাঁড়াও হে বীর আদিবাসী,
জাগিয়ে তোল তোমার পেশী বহুল শরীর,

ঝড়ের বেগে ঝাঁপিয়ে পড়
শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে।'

সেই দুরন্ত আহ্বানকে অস্বীকার করতে পারল না মানুষ। তারা চিনে নিল কে শত্রু, কে মিত্র। প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে জঙ্গী কৃষকদের দল এগিয়ে এল। বলল, আমরা আমাদের বাঁচার লড়াইয়ে লড়তে চাই। আমরা মুক্তি চাই, চাই আলো। নতুন দিনের স্বপ্ন সম্ভাবনাকে সার্থক করে তুলে যেতে চাই আমরা।

আমরা সংগ্রাম করবো। বাঁচবো অথবা মরবো। এ আমাদের বাঁচার লড়াই। এ লড়াই আমাদের জিততে হবে। আমরা শপথ নিলাম।

শুধু মাত্র পুরুষ নয়, মেয়েরাও এগিয়ে এল। যোগ দিল গেরিলা দলে। যে হাতে তারা সংসারের কাজ করেছে, স্বামী সন্তানের সেবা করেছে, সে হাতে তুলে নিল অস্ত্র।

প্রথম পাহাড় এলাকায়, তারপর সমতলেও ছড়িয়ে পড়লো যুদ্ধ। যেখানে অত্যাচার সেখানেই প্রতিরোধ। শ্রেণী শত্রুর বুকের রক্তে রাঙা হয়ে উঠতে লাগল মাটি। গেরিলা বাহিনীকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল মানুষ। তাদের জন্য অত্যাচার সহ্য করল।

১৯ শে মে ১৯৬৯ ইছাপুরম তালুকের বুড়ি বাংকা গ্রামে গেরিলা আক্রমণ হল। শুধু বুড়ি বাংকার মানুষ নয় খামার বাড়ির চাকররা পর্যন্ত যোগ দিল এ লড়াইয়ে।

জমিদারের পোষা গুণ্ডার দল শত চেষ্টাতেও বাঁচাতে পারল না। নিহত হল দুজন জমিদার। জমিদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল জনতা।

বুড়ি বাংকার ঘটনার পর শ্রেণী শত্রুর দল মরিয়া হয়ে উঠল। তারা বুঝতে পারল দিন ফুরিয়ে আসছে তাদের। বহুদিনের অন্যায় আর পাপের শাস্তি তাদের পেতেই হবে।

তাই মরার আগে মরণ কামড় দিতে চাইল তারা। জুটে গেল একদল ত্যাগী বিশ্বাসঘাতক। তার প্রয়োজন টাকা। অনেক অনেক টাকা। টাকার বিনিময়ে সব কিছু করতে সে প্রস্তুত।

শ্রেণীশত্রুর দল অকাতরে ব্যায় করতে লাগলো অর্থ। বাঁচতে গেলে অর্থের মায়া করলে চলে না। অর্থের বিনিময়ে দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতক নিয়মিত পৌঁছে দিতে লাগলো খবরাখবর।

তারপর।

২৭শে মে ১৯৬০

রক্তের অক্ষরে লেখা আছে একটি দিন।

একটি দিনের ইতিহাস।

প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা নিয়েছে সমস্ত শ্রীকাকুলাম। সারা ভারতের নিপীড়িত জনতা। শহীদ কমরেডদের হত্যার প্রতিশোধ তারা নেবেই। ক্ষমা নেই। মৃত্যুর প্রতিশোধ আমরা নেবই। অত্যাচারীর দল দেশের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা থামব না।

২৭শে মে কমরেড পঞ্চাদ্রি কৃষ্ণমূর্তি আর ওঁর দুজন সাথী শ্রুঙ্গারাপুনর সিং হলু, জুন্না গোপাল রাও, তামাড়া চিন্না বাবু, রামচন্দ্র প্রধানো, বায়িনা পাল্লে, পাপা রাউ আর নিরঞ্জন রাও থোমপেটা (কাঞ্চিলী) ষ্টেশনে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই সশস্ত্র পুলিশের দল রাইফেল উঁচু করে ওদের ঘিরে ফেলল।

ওঁরা নিরস্ত্র, তবু ভয় পেলেন না। বুঝলেন বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না। মাথা উঁচু করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সকলে।

ওঁদের সকলকে আষ্টেপিষ্টে বাঁধলো পুলিশ। হুকুম দিল, চল।

কিশোর নিরঞ্জন সকৌতুকে জানতে চাইল, কোথায় স্যার ?

যমের বাড়ি। খিঁচিয়ে উঠল পুলিশ অফিসার।

রামচন্দ্র ঠাট্টা করল, কমরেড, স্যার আমাদের ওর শ্বশুর বাড়ি নিয়ে চলেছে।

এই, চোপ। ধমকে উঠল পুলিশ অফিসার। চাপড় মারল গালে।

রামচন্দ্র গালে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, স্যার আপনার হাতটি বড় কোমল। ইচ্ছা করছে অন্য গালটা এগিয়ে দিই।

শ্রুঙ্গারাপুনর সিং হলু মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, কমরেড, এসময় কৌতুক করতে ভাল লাগছে তোমাদের?

হেসেছিল দুজনে। তেমনি মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, এমন আনন্দের সময় কৌতুক করবো না তো কখন করবো বলতে পারেন কমরেড?

কিন্তু····।

কমরেড, আমরা জানি, যখন আমরা জন্মলাভ করি তখন নিশ্চয়ই আমাদের মরতেও হবে। চেয়ারম্যান বলেছেন, মানুষের জীবনে মৃত্যু একটি অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। সেইজন্য জীবনকে জনগণের সেবায় অর্পণ কর—জনগণের শত্রুদের সেবায় নয়। জনগণের সেবার জন্য যে মৃত্যু সে মৃত্যু থাই পাহাড়ের চেয়েও ভারী। আর জনগণের সেবায়—বিমুখ জনগণের শত্রুর সেবায় যে মৃত্যু তা পাখীর পালকের চেয়েও হাল্কা।

কমরেড সিং হালু তেমনি মৃদু অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, আমাকে তোমরা ভুল বুঝনা কমরেড। মৃত্যুর জন্য তোমাদের মত আমিও এতটুকু বিচলিত নই। এই মহান সংগ্রামে জীবন বিসর্জন দেওয়াতো গর্বের। শুধু আফশোষ থেকে গেল, যে ঘৃণিত পুলিশের দল আমাদের হত্যা করবে বলে নিয়ে চলেছে তাদের একটাকেও শেষ করতে পারলাম না।

তামাভা চিন্নাবাবুর কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল। এ আফশোষ আপনার থাকবে না কমরেড, জনগণ নিশ্চই এর প্রতিশোধ নেবে। গুণগুণিয়ে উঠেছিল তাঁর কণ্ঠ :

তরবারির আঘাত যতই লাগুক,
খুনের নদী যতই বহুক,
উঁচিয়ে-ধরা বন্দুক
কিছুতেই নীচে রাখব না।

তাতাজীজ মুকুল কথার প্রধান গায়ক মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গান গেয়ে উঠেছিলেন। এতটুকু কাঁপেনি কণ্ঠ, তাল কাটেনি। যার সঙ্গীত নৃত্য-অভিনয়ের মাধ্যমে কৃষক সংগ্রামের ইতিহাস প্রচারিত করেছিল। লক্ষ লক্ষ জনগণকে বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছিল তার শেষ গান, শেষ কণ্ঠধ্বনী শুনলো রাতের আকাশ, অসংখ্য তারকারাজি, নিস্তব্ধ বনানী !

পুলিশ অফিসার ধমকে উঠল, এই গান থামাও।

সিং হালু বললেন, আমরা থামতে জানিনা। আপনি গান করুন কমরেড। আপনার গান শুনেছে অন্ধ্রের লক্ষ লক্ষ মানুষ, চাষের কাজের ফাঁকে শুনেছি আমিও। সেদিন হাতে কাজ ছিল তাই মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে গান শুনতে পারিনি। আজ শুনবো।

সকলে সমস্বরে বলল, আমরাও শুনবো।

কমরেড চিন্নাবাবু গান ধরলেন,

বিপ্লবের শিখা দাউ দাউ করে
জ্বলছে,
চিং কাং পাহাড়ের পথ আরও
চওড়া, আরও বিস্তৃত হয়ে
উঠছে :
বিপ্লবের তরণী পাল তুলে
দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে,
চিং কাং পাহাড় থেকে যারা
দুনিয়ায়,

জয় থেকে আরও বড় জয়ের
দিকে।

সামনেই জলন্তর-কোটা গ্রাম।

পুলিশের দল দাঁড়াল। ওঁরাও দাঁড়ালেন।

কমরেড কৃষ্ণমূর্তির সামনে এসে দাঁড়াল পুলিশ অফিসার। বলল, তোমাদের এখানে কেন নিয়ে আসা হল জানো?

ধীর স্থির শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে তিনি বললেন, জানি।

জানো?

জানি বৈকি। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন তিনি, তোমরা হয়তো ভেবেছ আমাদের হত্যা করে সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দেবে। তা যদি ভেবে থাক তাহলে বলছি ভুল ভেবেছ তোমরা। আমি বলছি, আমাদের হত্যা করে তোমরা বিপ্লবের গতিরোধ করতে পারবে না। ভারতবর্ষে যে সশস্ত্র বিপ্লব আরম্ভ হয়ে গেছে তাকে ধ্বংস করতে পারে দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই।

হেসে উঠল পুলিশ অফিসার। বলল, দেখা যাবে।

উদ্যত রাইফেলের সামনে বুক পেতে দাঁড়ালেন ওঁরা।

পুলিশ অফিসার বল্লল, তোমাদের মধ্যে কেউ বাঁচতে চাও না?

ওঁরা বললেন, 'জাতস্য মরণম্ ধ্রুবম্'।

ভোরের আলো ফুটছে। জলন্তর-কোটার গাছের পাতায় পাতায় নতুন দিনে আলো। ওঁদের নির্ভিক বলিষ্ঠ কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠল,

'কমিউনিষ্ট পার্টি জিন্দাবাদ'।

'ইন কিলাব জিন্দাবাদ'।

'আমার ভারতবর্ষে বিপ্লব এগিয়ে যাবে'।

'লালঝাণ্ডা জিন্দাবাদ'।

'বহুদিন—বহুদিন বেঁচে থাকুন আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড মাও।'

শ্লোগান ধ্বনিতে জেগে উঠল জলন্তর-কোটার মানুষ। তারপর অসংখ্য গুলির শব্দ। আগুন ধোঁয়া বারুদের গন্ধ। ওঁদের দেহগুলি এক এক করে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

শ্রীকাকুলামের বিপ্লবী আকাশ বাতাস জেগে উঠল সেইক্ষণে।

হত্যার প্রতিশোধ হত্যায়!

গ্রামের ঘরগুলো তখনও জ্বলছে। আগুন কিছুটা ম্লান। ওরা দাঁড়িয়ে আছে কজন। দেখছে। উত্তাপ নিচ্ছে আপন আপন বুকে।

সন্ধ্যা নেমেছে। অন্ধকারটা আরো গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকলেও কারো মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না।

চেন্না রাও-এর কণ্ঠ শোনা গেল, কমরেড!

শংকর ওর দিকে ফিরল। বলল, বল।

আমাদের একবার গ্রামে যেতে হবে। কুণ্ঠিতভাবে বলল ও।

চল।

চেন্না রাও-এর কণ্ঠ তেমনি কুণ্ঠিত। বলল, জানি এখন আমাদের ওখানে যাওয়া না যাওয়া দুই-ই সমান। তবু যাওয়া কর্তব্য। গ্রামবাসীকে সাহায্য করাব একটা দায়িত্ব আছে আমাদের। সে দায়িত্বটুকু আমাদের পালন করতেই হবে।

আমিও যাব। বলল শংকর।

নিশ্চই যাবে। আবার কুণ্ঠিত হল তার কণ্ঠ। বলল, কিন্তু কমরেড এই মুহূর্তে তোমাকে ওখানে নিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ····

বাধা দিয়ে শংকর বলল, আমি কি কোন কাজে আসতে পারি না?

নিশ্চই পার। কিন্তু কদিনে তুমি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছ। তোমার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন।

আমার তো মনে হয়····

তোমার কথাকে অমান্য করতে পারি না। কিন্তু তুমি আমাদের অতিথি। তাছাড়া এ স্থান এখনও তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিতি। শয়তানের দল রাত্রে বেরুতে সাহস করে না সত্য কিন্তু আজ 'কোথাও

না কোথাও অপেক্ষা যে না করছে একথা বলা যায় না। তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর। একজন এখানে থাকবে। আমরা খানিকক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি।

তোমরা যখন আমাকে সঙ্গে নেবে না তখন আমি একলাই থাকতে পারবো।

কিন্তু....

মিথ্যা আমার কাছে কারো থাকবার প্রয়োজন নেই। বরং তিনি গেলে গ্রামবাসীদের কোন না কোন সাহায্যে লাগতে পারবেন।

বেশ।

শংকরের যুক্তিটাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মেনে নিল চেন্না রাও। অন্ধকার পাহাড়ী পথে একে একে নীচের দিকে নেমে গেল।

নীচের গ্রামটার দিকে চাইলো সে। গ্রামের চিহ্নমাত্র নেই, শুধু আগুন। অঙ্গার।

নিজের দিকে চাইল সে।

বাংলা নয় অন্ধ্র। শ্রীকাকুলামের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। একাকী। মাথার ওপর মুক্ত আকাশ। অসংখ্য তারকা মণ্ডলী। কিন্তু নিজেকে তার একাকী বলে মনে হল না। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে, বিপদসঙ্কুল পর্বতের ওপর রাত্রির ঘন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলেও একাকী বলে মনে হলনা। মনে হল শ্রীকাকুলামের পার্বত্য শ্রেণী তো তার পাশে রয়েছে। সে তো একা নয়।

সে আজ আর আলাদা একজন নয়। যুগ যুগ ধরে নির্যাতীত, নিপীড়িত, অত্যাচারীত সর্বহারা মানুষের একজন। সে নিজের নয়, সকলের। সে মানুষের।

এই সত্য উপলব্ধি করে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে অনেক পরে।

ভুল ভেঙ্গেছে তার। মিথ্যার খোলস ছিঁড়ে ফেলেছে।

জেগে উঠেছে।

১৯৬৭ সাল।

নাম শংকর নাথ চৌধুরী। চির বেকার নয়, চাকুরী যাওয়া একটা বেকার যুবক। চাকুরী গিয়েছিল রাজনীতি করার অপরাধে। জেলখাটা আসামীকে মাড়োয়াড়ী কোম্পানী চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেছিল। ইউনিয়ন ছিল কিন্তু অন্য পার্টির কর্মীর চাকুরী যাওয়ায় কিছু এসে যায়নি তাদের। যদিও সে ইউনিয়নের মেম্বার ছিল। কিন্তু পার্টিবাজি বড় ভয়ঙ্কর।

তবু অনেক চেষ্টা করেছে সে। যাকে পেয়েছে ধরেছে। জিজ্ঞাসা করেছে, আমি কী আপনাদের কেউ নই ?

শুনেছে, কে বল্‌ল, তুমি আমাদের কেউ নও ? নিশ্চই তুমি আমাদের একজন।

তাহলে আমার যে এভাবে চাকুরী গেল, এর জন্যে আপনারা কিছু করলেন না কেন ?

কেন, আমরা তো প্রতিবাদ করেছি। ইউনিয়নের তরফ থেকে মালিক পক্ষকে জানিয়ে দিয়েছি এমন অন্যায় আমরা বরদাস্ত করবো না।

ব্যাস ? এতেই আপনাদের কর্তব্য শেষ হয়ে গেল ?

আর কি করতে পারি বল ?

আর কি কিছু করার নেই ?

তার তীক্ষ্ণ প্রশ্নের সামনে পড়ে একটু ইতস্ততঃ করেছিলেন ইউনিয়নের সম্পাদক। দামী সিগারেট টানতে টানতে গম্ভীর ভাবে চোখ বুজে কিছুক্ষণ চিন্তা করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, পথ একটা আছে। কিন্তু তাতে প্রতিকার কতটুকু সম্ভব হবে জানি না। হয়তো অন্য কিছু হয়ে যেতে পারে।

অন্য কিছু ?

হ্যাঁ। বলেছিলেন, এভাবে তোমার চাকুরী যাওয়াটা যে অন্যায় আমি কেন তোমার সহকর্মীরাও তা স্বীকার করে। আর অন্যায়ের

প্রতিকারের একমাত্র পথ ধর্মঘট। আমরা তোমার জন্যে ধর্মঘট করতে পারি। তুমি যদি বল তাহলে না হয় আমরা তাই করবো।

আশ্চর্য হয়েছিল সে। শুধু ইউনিয়নের সম্পাদক নন একজন নামী শ্রমিক নেতা রূপেও তিনি পরিচিত। তাঁর মুখে অমন অশোভন কথা শুনে তার মনে হয়েছিল সেকি জেগে আছে, না স্বপ্ন দেখছে। তবু বলেছিল, আমি বললে আপনারা ধর্মঘটের পথে নামবেন ?

নামতে হয়। বলেছিলেন তিনি। কারণ এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা তোমার চাকুরীটা যাতে থাকে তার জন্যে সব রকম চেষ্টাই করা হয়েছে। তোমাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার পক্ষে মালিকের যুক্তিও কম নেই। প্রথমত তুমি বিনা নোটিশে ছমাস কামাই করেছো। যদিও ডাক্তারী সার্টিফিকেটের জোরে ছমাস কেন এক বছর কামাই করা কমীর কাজ আমরা ইতিপূর্বে আদায় করেছি। কিন্তু তুমি যে জেল খাটা আসামী।

আমি আসামী ! যেন আর্তনাদ করে উঠেছিল সে।

এতক্ষণে হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, না-না সত্যি তুমি তা নও। তুমি রাজনৈতিক বন্দী। আমি জানি তুমি রাজনৈতিক কারণে ধৃত হয়েছিলে। কিন্তু মালিক বলছে, তুমি আসামী। আসামী না হলে কি কারো জেল হয় ?

চমৎকার ! বিদ্রূপ করে উঠেছিল সে।

তিনি যেন সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। বুঝিয়ে ছিলেন, আমি মালিকের এই আপত্তিকর উক্তির প্রতিবাদ করেছিলাম। তাকে বুঝিয়েছিলাম, আসামী আর রাজনৈতিক বন্দী এক নয়। অনেক তফাৎ তুজনের মধ্যে। চোর ডাকাতকেই আসামী বলা হয়।

তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন আপনার কথা ?

বুঝলেন বৈকি। আমি বোঝাতে সক্ষম হয়েছি।

কিন্তু আমার চাকুরীটা আদায় করতে পারলেন না।

না, হতাশভাবে মাথা নেড়েছিলেন তিনি। মাড়োয়াড়ীর গোঁ আমি কিছুতেই পাল্টাতে পারলাম না। ওরা দেখছি একবার যা গোঁ ধরে পাল্টানো যায় না। মাড়োয়াড়ীরা........

বাধা দিয়েছিল সে। বলেছিল, মাড়োয়াড়ী নয় বলুন ধনীর স্বেচ্ছাচার। আর এই স্বেচ্ছাচারীতার যুপকাষ্ঠে স্বেচ্ছায় মাথা গলিয়ে দিচ্ছেন আপনারা। মুখে বলছেন, শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। দুনিয়ার মজদুর এক হও। আর তার সঙ্গে চালাচ্ছেন ধনীক তোষণ নীতি। বলবেন, তোমার জন্যে আমাদের ধর্মঘট করতে হবে। একটা লোকের জন্যে অনেকগুলো লোকের পেটকে মারতে হয়। সেটা নিশ্চয়ই উচিৎ হবে না। আমিও জানি সেটা করা উচিৎ নয়। একজনের জন্যে শতজনের ক্ষতি করা ঠিক হবে না। কিন্তু সত্যিই কি তাই, এ কি মালিকের অন্যায় না আপনাদের কারসাজি?

চিৎকার করে উঠেছিলেন তিনি, হোয়াট ডু ইউ মিন?

আস্তে, চিৎকার করলে শুধু নিজের গলাটাই ভাঙ্গবে, লাভ কিছু হবে না। আমি জানি এর মূল কোথায়, কি চান আপনারা! শোষিত সর্বহারাদের কথা মুখে বলেন আর সেই সঙ্গে ধনতন্ত্রকে প্রশ্রয় দেন। কারণ সামন্ততন্ত্রের উত্তরাধিকারী আপনারা। কয়েকখানা মার্কসবাদের পুস্তক পড়ে কমিউনিষ্ট হয়েছেন। লিডারী করছেন। ইউনিয়নের নেতা সেজে স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মালিক পক্ষের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন। যাদের নেতা সেজেছেন তারা মরলো কী বাঁচলো তাতে আপনাদের এতটুকু যায় আসে না। আপনারা শুধু দেখেন, শ্রমিক ক্ষেপিয়ে আপনাদের পজিশন বজায় রেখে টাটা বিড়লাদের গায়ে আঁচটুকু যেন না লাগে।

আবার তিনি চীৎকার করে উঠেছিলেন, তুমি আমাকে অপমান করছো!

অপমান নয় আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি। আপনাদের

এই ধোঁকাবাজির দিন একদিন না একদিন নিশ্চয়ই শেষ হবে। সর্বহারা শোষিত মানুষ একদিন না একদিন তাদের প্রকৃত নেতাকে চিনতে পারবে। সেদিন তারা আপনাদের মত মানুষগুলোকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে না।

সেদিন কোনদিনই আসবে না।

নিশ্চয়ই আসবে। রাতের অন্ধকার দিনের সূর্যের পথরোধ করতে পারে না। সূর্য তার নির্দিষ্ট সময়ে ঠিকই পূবের আকাশে রক্তচ্ছটায় উদিত হয়। প্রকৃত রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ একদিন নিশ্চয়ই জেগে উঠবে। তাদের ভুল পথে পরিচালিত করার জবাব চাইবে সেদিন। কী জবাব সেদিন তাদের দেবেন ?

অশিক্ষিতের দল প্রশ্নের ভাষা খুঁজে পেলে তো ?

সত্যি কথাই বলেছেন। গণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে গেলে শিক্ষার প্রয়োজন। সেই পথ থেকে আপনারা তাদের কৌশলে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। মানুষকে জাগরণের পথে বাধা সৃষ্টি করেছেন। কারণ শিক্ষা মানুষের মনের অন্ধত্ব ঘোচায়। সেই শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না করে আপনারা অন্ধ করে রাখতে চান মানুষকে। কারণ আপনাদের প্রতি তাদের অন্ধত্ব বজায় থাকবে। তারা বিচার করবে না। ভাল মন্দ বুঝবে না। শুধু ফলভোগ করবে। আপনারা বলবেন, ত্যাগ স্বীকার না করলে কিছু হয় না। ত্যাগের মহত্ত্ব মিথ্যার ছলনায় বোঝাবেন তাদের। কিন্তু কতদিন ? কতদিন এই ধোঁকাবাজি চলবে আপনাদের ? কতদিন তারা শুধু আঘাতের পর আঘাত সহ্য করে আপনাদের গালভরা কথাকে বিশ্বাসে করবে ? গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে হাত তালি দেবে ? মরবে। বাঁচার জন্য লড়াই করবে না ?

চুপ করে ছিল সে। তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন। অপমানে রাঙ্গা চোখ দুটো দিয়ে দেখেছিলেন। বলেছিলেন, তোমার

দল তো বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে। আমরা না হয় সুবিধাবাদী, কিন্তু তোমরা ?

আমরা ?

তোমরা সর্বহারাদের জন্য কি দায়িত্ব পালন করছো ? কেমন শিক্ষার ব্যবস্থা করছো ? কোন পথে জাগাচ্ছো তাদের ?

উত্তর দিতে পারে নি সে। চুপ করেছিল। যাদের সে সমালোচনা করল তাদের চেয়ে তারাও তো কিছু মাত্র ভিন্ন নয়। বাষট্টিতে আলাদা হয়েছে কিন্তু কিছু করেছে কি ?

সেই সভা, শোভাযাত্রা আর কথার ফুলঝুরি।

আলাদা কোথায় ?

কোন নীতিতে ?

মাষ্টারী করবে তুমি !

মাষ্টারী ?

হ্যাঁ মাষ্টারী। পড়াবে ওদের, কিন্তু মাষ্টারের মত নয় বন্ধুর মত। ওরা যেন একবারও মনে না করে, ভাবে, তুমি ওদের কেউ নয়। আপন জন হতে হবে। সৎ শিক্ষা দেবে। ওদের মনের সংস্কার দূর করতে হবে। ওরা যেন সঙ্কুচিত না হয়, লজ্জা না পায়। মনে না করে শিক্ষার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু....

চল ওধারটায় ঘুরে আসি।

এগিয়ে চলেছিলেন তিনি। তাঁর ঋজু দেহের দৃঢ় পদক্ষেপ। তরাইয়ের পথের ধূলায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল তাঁর পা দুখানি। মেঠো পথে, বনের ধারে ধারে চলতে চলতে যখনই যার সঙ্গে দেখা হচ্ছিল কুশল বিনিময় করছিলেন। সংসার, ছেলে মেয়ে, আত্মীয় স্বজনের খোঁজ নিয়েছিলেন। যেন কত আপনার জন তিনি সকলের।

এ যেন তাঁর আপন দেশ, জন্মস্থান। কদিন বাইরে থেকে ঘরে ফিরে এসেছেন।

তার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোমাদের মাষ্টার।

মাষ্টার কি হবে গো ?

পড়াশুনা হবে।

কেনে ইস্কুল তো রয়েছে বটে।

সে তো তোমাদের ছেলেদের। এবার তোমাদের ইস্কুল হবে।

আমাদের ! বিস্মিত হয়েছিল কেউ কেউ। হেসেছিল কেউ। বলেছিল, ছেলেদের মত আমরাও পড়বো ?

কেন পড়বে না ?

ওই অতটুকু মাষ্টারের কাছে ?

হ্যাঁ।

না ডাক্তারবাবু অতটুকু মাষ্টারের কাছে পড়তে আমরা পারবো না।

কেন গো ?

উত্তর দেয়নি মানুষটি। বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। হো হো করে হেসে উঠেছিলেন।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল মানুষটি, এ ডাক্তারবাবু হাসছো কেনে ?

আরে হাসবো না ? লেখা পড়ার কি বয়েস আছে কোন ? যে মাষ্টার এনেছি এ আমার থেকে অনেক বেশি জানে। আমাকে শিখিয়ে দিতে পারে।

বটে ?

দেখো। আমার কথা সত্যি কিনা।

বেশ, বেশ। খুশি হয়ে চলে গিয়েছিল মানুষটি।

সে বলেছিল, এ আপনি কি বলছেন ওদের ?

তিনি হেসেছিলেন। বলেছিলেন, এটুকু না বললে ওরা বিশ্বাস করবে কেন ?

আপনার প্রতি ওদের বিশ্বাসকে এমন ভাবে কাজে লাগাচ্ছেন ?

প্রমাণ তোমাকেও দিতে হবে। তোমাকেও যাতে ওরা বিশ্বাস করে নিতে পারে তেমন কাজ করতে হবে বৈকি।

পারবো আমি ?

কেন পারবে না। নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখো তাহলে দেখবে কাজ যত কঠিন হোক না কেন উত্তীর্ণ হতে তোমার দ্বিধা জাগবে না মনে। আত্মবিশ্বাস হল মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যে মানুষ নিজেকে বিশ্বাস করে না তার দ্বারা কখনো কোন মহৎ কাজ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু আমি কি এই কাজের জন্যেই এখানে এসেছি ?

তবে কি কাজের জন্যে এসেছো ?

আমি তো…। কথাটা শেষ করে নি সে। বলতে পারে নি।

তিনি একটু চুপ করেছিলেন। মৃদু অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, জানি এ প্রশ্ন তুমি তুলবে। এ প্রশ্নটা জাগাও স্বাভাবিক। কিন্তু একটা কথা তুমি জেনে রাখ আমাদের নিজেদের ইচ্ছায় কিছু করার উপায় নেই। অবশ্য এটা যে করতেই হবে তেমন কোন বাধ্য বাধকতা নেই। তোমার যদি ভাল না লাগে, মন না চায় তুমি নাও করতে পারো। আবার তুমি যে নিজের ইচ্ছামত কিছু করবে তারও উপায় নেই। তোমার পথ তুমি বেছে নিতে পার, তুমি সরে যেতে পারো। জোরও করবো না ধরেও রাখবো না। কারণ আমরা যা করি প্রয়োজন বোধে করি, কর্তব্য বোধে করি। সর্বহারার বন্ধু যে আমরা, কথায় নয় কাজের মধ্যে পালন করি। সমিতি আমাদের যে কাজের দায়িত্বভার দেয় আমরা তা করি।

আমাকে কি….

বাধা দিয়ে তিনি বলেছিলেন, গ্রামে গ্রামে আমরা নাইট স্কুল

খুলেছি। শিক্ষার দ্বার যাদের কাছে চির রুদ্ধ ছিল সে দ্বার আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টায় খুলে দিতে চাইছি। হাতিখিষার এই গ্রামটায় স্কুল খোলার পরিকল্পনা আমরা ক'মাস আগে গ্রহণ করেছি। শিক্ষকের অভাব অবশ্য নেই আমাদের। কিন্তু কলকাতা থেকে তোমার নাম লিখে পাঠাতে সমিতি অনুমোদন করেছে। তাছাড়া তুমি আমার কাছে থাকবে।

কিন্তু লড়াইতো সুরু হয়েছে।

তাতে কি হয়েছে। লড়াই সুরু হয়েছে বলে সব কিছু কি বন্ধ থাকবে? ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টিও যে আমাদের কাম্য। তাছাড়া নকশালবাড়ির চাষীদের এই যে সশস্ত্র সংগ্রাম এতে সামিল আমরা হলেও অগ্রণী ভূমিকা আমাদের নয়। আমরা ওদের পাশে আছি। আমরা ওদের সাহায্য করবো, কিন্তু এগিয়ে গিয়ে ওদের জায়গা দখল কোন দিনই করবো না।

কেন?

বহুদিনের অন্যায় শাসন, অত্যাচার, অভাব অপমানের মর্মবেদনার জ্বালা বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে ওদের রক্তে। ওরা বুঝতে পেরেছে এমনি ভাবে দিনের পর দিন মার খেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। ওরা জেগে উঠেছে। আত্মনির্ভরতা লাভ করেছে। শিকল ভাঙ্গার শপথ নিয়েছে ওরা। মহান চীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ওরা এগিয়ে যাবে। জয়ী হবে। সেই জয় যাত্রার পথে বাধা হয়ে আমরা দাঁড়াবো না। আমরা ওদের সাহায্য করবো। প্রয়োজন হলে জীবন দেব।

কিন্তু শুধু কি গ্রামের জোতদার জমিদার শেষ হলেই বিপ্লব সফল হবে। সুদিন ফিরে আসবে?

না তা আসবে না। শুধু গ্রাম নয়, শহর। কারখানার মালিক, পুঁজিপতি ধনী একে একে সকলকেই খতম করতে হবে। গোটা রাষ্ট্র

যন্ত্রটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে হবে। গড়তে হবে নতুন করে। শুধু কৃষক নয়, কৃষক শ্রমিক মিলিত চেষ্টায় সফল হবে সে সংগ্রাম।

কিন্তু এ সংগ্রাম তো গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে ?

আজ আছে, একদিন থাকবে না। একদিন ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামে নগরে বন্দরে বিপ্লবের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হবে। শোষক শ্রেণীর চিতাশয্যা নিশ্চয়ই রচিত হবে।

কবে ? কতদিনে সেদিন আসবে ?

সে দিনের আজ আর খুব বেশি দেরি নেই। পথের সন্ধান আজ স্পষ্ট। পরিক্রমা সুরু হয়ে গেছে। শ্রেণী শত্রুর তপ্ত রক্তে মুছে যাচ্ছে বহুদিনের অন্যায় পাপ আর গ্লানি। মানুষ জাগছে। যারা জাগেনি তাদের জাগিয়ে তোলার ব্রত গ্রহণ করেছি আমরা। পিছিয়ে থাকলে চলবে না, কাজ করতে হবে আমাদের।

কাজ করেছেন তিনি। দিনে রাতে সর্বক্ষণ। যখনই ডাক এসেছে ছুটে গেছেন। বিপদে সাহায্য করেছেন। বন্ধুর কাজ করেছেন।

হাতে ছোট ওষুধের বাক্স। সর্বক্ষণের সঙ্গী তাঁর। শীর্ণ মানুষটি আধ ময়লা একটি হাফসার্ট গায়ে খালি পায়ে গ্রামের পথে পথে ঘরে ঘরে ঘুরেছেন। সকলের খোঁজ খবর নিয়েছেন। দুদণ্ড বসে সুখদুঃখের কথা বলেছেন। বিদায় নিয়ে আবার এগিয়ে গেছেন পথে।

কোনদিন সঙ্গে থেকেছে সে। শহরের বিলাসিতা ত্যাগ করে মানুষের কাছাকাছি হওয়ার জন্যে তাকেও অনেক পুরানো অভ্যাস ছাড়তে হয়েছে। পুরাতন চটিজোড়া ছিঁড়ে যেতে সারায় নি আর।

খালিপায়ে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমার চটি কি হল শংকর ?

ছিঁড়ে গেছে।

হাটতলায় গেলেই মুচি পেতে, সারিয়ে নাওনি কেন ?

সারাবার অবস্থায় আর নেই।

ঠিক আছে, হাটবারে একজোড়া কিনে নিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিও।

আচ্ছা।

টাকা দিয়েছেন তিনি। চটি কেনবার জন্যে হাটতলাতেও গেছে। চটি পছন্দ করে দাম করেছে। কিন্তু চটি না কিনেই ফিরে এসেছে। দাম কমিয়ে দোকানদারের ডাকাডাকিতেও কান দেয় নি।

পরদিন খালি পা দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল শংকর কাল চটি কেননি?

না।

চটি পছন্দ হয়নি তো এখনকার?

পছন্দ হয়েছিল।

তাহলে দাম বেশি চেয়েছিল? ঠিক আছে সামনের হাটে টাকা বেশি করে নিয়ে যেও।

টাকার আমার প্রয়োজন নেই আর। কথাটা বলে তাঁর দেওয়া টাকাটা বার করে দিয়েছিল সে।

অবাক হয়েছিলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, চটি কিনবে না তুমি?

না।

কেন?

একটু চুপ করেছিল সে। মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, প্রয়োজন অনুভব করছি না আর।

শুধু পায়ে হাঁটতে যে কষ্ট হবে তোমার।

আপনার হয় না?

মৃদু হেসেছিলেন তিনি। আগে খুব কষ্ট হত, এখন আর হয় না। অভ্যাস হয়ে গেছে।

আমারও অভ্যাস হয়ে যাবে। তাছাড়া যাদের সঙ্গে ওঠাবসা চলা ফেরা তাদের কাছে নিজেকে বেমানান করে রাখতে চাই না।

শুধু এই জন্যে ?

না।

তবে ?

তাঁর প্রশ্নটার সহসা কোন উত্তর দিতে পারে নি সে। একটু চুপ করেছিল। তারপর বলেছিল, ব্যবধানের প্রচারটুকু সরিয়ে ফেলাই তো উচিৎ।

শুধু পোষাকে আশাকে আর বাহ্যিকতায় ?

তা কেন ?

তাই শংকর। এমনিই ঘটছে। শ্রমিক কৃষক দরদী সাজছি কিন্তু মনে দরদের চিহ্ন মাত্র নেই। বিপ্লব চাইছি কিন্তু আপন অধিকার ক্ষুণ্ণ হোক এমন কিছু চাইছি না। সাচ্চা কমিউনিষ্ট সাজছি কিন্তু ভোগ বিলাসকে আঁকড়ে ধরছি সেই সঙ্গে। সকলে খেলে, সকলকে খাইয়ে আমি খাব, কিন্তু নিজে ভালমন্দ খেয়ে বুভূক্ষু মানুষের কথা বলছি। বলছি, যারা আমাদের রুটি মেরে রেখেছে তাদের আমরা কোনমতে ক্ষমা করবো না। কেড়ে খেতে হবে। সেই সঙ্গে মনে মনে বলছি, আমারটা বাদ দিয়ে। তুমি কোন দলে শংকর ?

এতে দল আছে নাকি ?

আছে বৈকি। ছিল এবং আছে। যেমন, কিছু কিছু লোক কয়েকখানা মার্কসবাদী পুস্তক পড়েছেন তো নিজেদের পণ্ডিত ঠাওরান। কিন্তু তারা যা পড়েছেন তা তাদের মাথায় ঢোকেনি এবং মগজের মধ্যে শেকড় গেড়ে বসেনি, তাই তারা তা ব্যবহার করতে জানেন না, তাদের শ্রেণীবোধ তেমনি পুরাতনই থেকে যায়। আরও কিছু সংখ্যক ভয়ানক অহংকারী এবং কয়েকটি কেতাবী বুলিতে শিক্ষিত হয়ে নিজেদেরকে সব-জান্তা মনে করেন, লেজ ফুলিয়ে আকাশে তুলে ধরেন। কিন্তু ঝড় ওঠা

মাত্রই, তাদের অবস্থান শ্রমিক ও অধিকাংশ শ্রমজীবী কৃষকদের চেয়ে অনেক ভিন্ন হয়ে যায়। পূর্ববর্তীরা দ্বিধাগ্রস্ত, আর পরবর্তীরা অবিচলিত, পূর্ববর্তীরা অস্পষ্ট, আর পরবর্তীরা স্পষ্ট। তুমি কোন দলের শংকর ?

সে নীরব ছিল। কথা বলতে পারেনি।

তিনিও একটু নীরব ছিলেন। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, শংকর মার্কসবাদ শিক্ষা করতে গেলে, শুধু মাত্র পুস্তক থেকেই নয়, বরং প্রধানত শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং শ্রমিক কৃষক সাধারণের সংস্পর্শের মধ্য দিয়েই তাকে সত্যি সত্যি আয়ত্ত করা সম্ভব। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা যদি কয়েকটি মার্কসবাদী বই পড়েন এবং শ্রমিক-কৃষক সাধারণের সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে ও নিজেদের কাজের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে কিছুটা জানতে পারেন, তাহলে আমরা সবাই অর্জন করবো একটা অভিন্ন ভাষা, শুধুমাত্র দেশ প্রেমের ক্ষেত্রের অভিন্ন ভাষা ও সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবহার ক্ষেত্রের অভিন্ন ভাষা নয়, বরং সম্ভবত কমিউনিষ্ট বিশ্ব দৃষ্টিকোণ ক্ষেত্রের বিভিন্ন ভাষাও। এমনি করলে আমাদের সকলের কাজ নিশ্চিতরূপে আরও অনেক বেশি ভাল হবে।

চুপ করেছিলেন তিনি। শংকর নীরব ছিল।

এক সময় তিনি তার নাম ধরে ডেকেছিলেন, শংকর!

বলুন।

তুমি কিছু মনে কর না।

আপনি তো ঠিক কথাই বলেছেন।

তবু!...

সত্যিই আজ সখের কমিউনিষ্টে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। যে কোন কারণে স্বার্থহানি ঘটলেই কমিউনিষ্ট হচ্ছে। সুবিধাবাদের ভিত্ তৈরী করতে চাইছে তারা। আর সেই জন্যেই তো পালিয়ে এসেছি। সকলের একজন হয়ে বাঁচতে চাই। সকলের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাই।

সকলের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাই। আমি স্বপ্ন দেখি মুক্তির—আলোর—অধিকারের।

কি চাচা, সকাল বেলা গালে হাত দিয়ে বসে কেন?

কথা বলতে বলতে উঠানে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। সঙ্গে শংকর।

নূরুদ্দীন বসতে বলেছিল।

তিনি বলেছিলেন, গালে হাত দিয়ে বসে কি ভাবছিলে?

নাতিটার বড় অসুখ।

ডাক্তার এনেছিলে?

ডাক্তার যে দেখাবো পয়সা কোথায় বাবু? পেটের ভাত জোটে না তো ডাক্তারের পয়সা থাকবে কোথা থেকে? ঘর দুখানা তিন সন ছাওয়াতে পারিনি।

তোমার নাতিকে একবার দেখবো?

আসেন।

ছেলেটাকে দেখেছিলেন তিনি। বছর সাত আট বয়েস। রোগা শীর্ণ চেহারা। মুখের মধ্যে শুধু চোখ দুটিই উজ্জ্বল।

রোগের কথা জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল পেটের যন্ত্রণা। আগে মাঝে মধ্যে হত। দু একদিন হয়ে যন্ত্রণাটা ভাল হয়ে যেত। সদর হাসপাতালে কবার নিয়েও গিয়েছিল। ডাক্তার বাবুরা দেখে ওষুধ লিখে দিয়ে ছিলেন। বলেছিলেন বাইরে থেকে কিনে নিতে। ওষুধ কেনার সাধ্যে কুলায়নি। ছেলেটাও ভুগছে সেই থেকে। এবার দিন চারেক আগে থেকে সুরু হয়েছে। দিনে রাতে সব সময় যন্ত্রণা ভোগ করছে।

ভাল ভাবে পরীক্ষা করেছিলেন তিনি। বুঝতে পেরেছিলেন যা-তা খাওয়ার জন্যেই এই অসুখ। ওষুধ দিয়ে বলেছিলেন, ওষুধ দিলুম, যন্ত্রণা কমে যাবে। কাল কেমন থাকে দেখে ওষুধ দিয়ে যাব।

নূরুদ্দিন বাইরে এসে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেছিল, পোলাটা বাঁচবেতো বাবু?

না বাঁচার কি আছে! অসুখ এমন কিছুই নয়।

একটু ভাল করে দেখবেন বাবু। বাপ মরা ছেলে। মনে হয় ও থাকবেনা বুঝি।

হেসে অভয় দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, আমি তোমার নাতিকে ঠিক সারিয়ে তুলবো। আজ চলি।

কৃতজ্ঞতায় হাত দুটো জোড় করেছিল নূরুদ্দিন।

পরদিন আবার গিয়েছিলেন। অনেক ভাল ছেলেটা। যন্ত্রণা অনেক কমে গেছে। বলেছিলেন, বাঃ তোমার নাতিতো ভাল হয়ে গেছে দেখছি চাচা?

হ্যাঁ বাবু। আপনার দয়ায় এ যাত্রায় বেঁচে গেল।

দয়া নয় চাচা, এ কর্তব্য। তোমার সময় অসময়ে আমি, আমার সময় অসময়ে তুমি। তবে একটা কথা তোমাদের বলছি, খাওয়া দাওয়ার দিকে একটু নজর দিও। এখন রুটি টুটি কিছুদিন দিওনা। দুবেলা ঝোল ভাত দেবে।

নূরুদ্দিন একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, এক বেলাই অনেক দিন ভাত জোটেনা বাবু, দুবেলা দেব কোথা থেকে?

কেন এবার চাষ করনি?

চাষ করবো না কেন। চাষ করেছি, আল্লা দোয়াও করেছেন কিন্তু ফসল এবার পাইনি বললেই চলে।

কেন?

দু সনের বকেয়া দেনা সব মেটাতে হয়েছে। বাবুদের হাতে পায়ে ধরে এক বছরেরটা এবার মাপ করতে বলেছিলুম। শুনলেন না। সব ফসল তুলে নিয়ে গেলেন।

দিলে কেন?

কার জিনিষ ধরে রাখবো বাবু, জমিতো তেনাদের। জোর করলে সামনের সনে যদি জমি না দেন?

তিনি চুপ করে ছিলেন।

নূরুদ্দিন বলেছিল, সামনের বছর চাষ করেও যে ঠিক মত ভাগ পাবো তারও কোন ঠিক নেই। আগের ধার শোধ হয়েছে কিন্তু সুদতো এখনও বাকী।

তোমার নিজের জমি ছিলনা?

আমার নিজের জমিতেই তো আমি চাষ করি। বাবুদের কাছে বন্ধক আছে। হঠাৎ একটু চুপ করে থেকে নূরুদ্দীন জিজ্ঞাসা করেছিল, হ্যাঁ বাবু এখন একটা কথা শুনতে পাচ্ছি—কথাটা সত্যি?

কি কথা চাচা?

যার জমি সে ফেরৎ পাবে? সরকার আমাদের জমি আমাদের ফেরৎ দেবে?

কি জানি চাচা আমি ওসব খবর টবর কিছু রাখি না। তবে কথাটা শুনেছিলুম বটে।

আর সব বেনামী জমি নাকি উদ্ধার করে চাষীদের হাতে তুলে দেবে সরকার। অন্য সব জায়গাতে জমি দখল সুরুও হয়ে গেছে?

না চাচা আমি ওসব খবর রাখিনা।

ছেলের অসুখে তিনশো টাকায় বাবুরা চার বিঘে জমি বন্ধক রাখল। কাগজে টিপ ছাপ নিয়ে বললেন, তোর জমি তোরই রইলো, চাষ বাস তুই-ই করবি। তা বাবু প্রায় বছর পাঁচেক হল। একবার ছাড়াবার কথা বাবুদের বলেছিলুম কিন্তু তেনারা এমন ধমকে উঠেছিলেন যে জমিটা ছাড়াবার নাম আর মুখে আনিনা। দেখি এবার যদি কিছু হয়। নতুন মন্ত্রীরা যদি কিছু করেন।

দেখো।

কথাটা বলে উঠেছিলেন তিনি। এগিয়ে দেওয়ার জন্য সঙ্গে এসেছিল নূরুদ্দীন। ডেকেছিল, বাবু!

তিনি বলেছিলেন, আমি আবার কাল এসে তোমার নাতিকে দেখে যাব।

নিশ্চয়ই আসবেন বাবু। কিন্তু আমি একটা কথা ভাবছিলুম।

কি কথা চাচা?

কুণ্ঠিতভাবে নূরুদ্দীন বলেছিল, কিছু মনে করবেন না বাবু। কথাটা আপনারাই বলেন, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। বাবু আজকের এনারা সেই রাবণ হয়ে উঠবেন না তো?

কেন চাচা?

সারাটা জীবন তো মার খেতে খেতেই কেটে গেল। এনারা আবার নতুন করে মারবেন নাতো? বুড়ো বয়সে নতুন করে মার খাওয়ার বড় ভয় বাবু!

অন্ধকার রাত্রি। আকাশে তারাগুলো ক্রমশঃ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। শ্রীকাকুলামের পাহাড়ের ঝোপে ঝাড়ে জোনাকীরা জ্বলছে আর নিভছে। নির্জন নিস্তব্ধ গিরিচূড়ায় রাত্রির বিচিত্র বর্ণময় সঙ্গীত ক্রমশঃ উত্তাল হয়ে উঠছে। হঠাৎ থেকে থেকে কর্কশ চীৎকার। পাখীর ডানা ঝাপটানোর শব্দ। আবার সব কিছু চুপচাপ। নীথর নিস্পন্দ। প্রাণীময় জগতে প্রাণের অস্তিত্বহীনতা।

সচকিত হয়ে উঠল শংকর। একটু যেন কেঁপে উঠল বুকের মধ্যেটা। ভয়! নিজেকে জিজ্ঞাসা করল সে। না, ভয় পায় নি।

রাত্রি কত হবে! চেন্না রাও-রা অনেকক্ষণ হল নীচে গেছে। ওরা ফিরে আসছে না কেন? ওদের কাজ কি শেষ হয়নি এখনও? কি করছে ওরা? কোন বিপদ হল কি?

নীচে গ্রামটার দিকে তাকাল। কোথায় গ্রাম? অন্ধকারে সব কিছু একাকার হয়ে গেছে। কোথাও এতটুকু আলোর চিহ্ন মাত্র নেই। যে আগুন জ্বালিয়ে গিয়েছিল অত্যাচারীর দল সে আগুন কখন নিভে গেছে জানতে পারে নি সে।

আগুন নিভে গেছে। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল সে, সত্যিই কি আগুন নিভে গেছে? কখন নিভল? কে নেভালো সে আগুন? কে?

না নেভেনি। আগুন নিভবে না। প্রজ্জ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখায় যতক্ষণ পর্যন্ত না পুড়ে শেষ হচ্ছে অত্যাচারীর দম্ভ অহঙ্কার, যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত নির্যাতীত সর্বহারার দল ফিরে পাচ্ছে আপন অধিকার ততোক্ষণ পর্যন্ত নিভবে না বুকের আগুন। জল নয়, এ আগুন নেভাতে প্রয়োজন শ্রেণীশত্রুর বুকের রক্ত।

চারিদিকে শুধু লোভ লালসা আর হিংসার ছড়াছড়ি। অধিকার হরণের চক্রান্ত। মানুষের মনুষ্যত্ব কেড়ে নেওয়ার পৈশাচিকতা। সাম্রাজ্য বাদী ইংরেজ গেছে কিন্তু তার দালালরা অধিকার করেছে রাষ্ট্রযন্ত্র। তারা আপন স্বার্থের জন্যে দেশভাগ করেছে। মুখে ত্যাগের মন্ত্র আওড়াচ্ছে, মানুষকে বলছে কৃচ্ছ্রতা সাধন করতে। বলছে, আমরা গরীব, গরীবের দেশ আমাদের। ত্যাগের জন্য তৈরী হও। অথচ নিজেরা ভাল খানা পিনা করছে, দামী মোটরে চড়ছে, বিলাসবাহুল্যের এতটুকু ঘাটতি নেই। তাদের উৎসাহে ধনী হচ্ছে আরো ধনী, গরীব আরো গরীব। অথচ মুখে সমাজতন্ত্রের কথা। বড় বড় বুলিতে ভুলিয়ে রাখতে চায় মানুষকে।

দোহারের দল প্রস্তুত। তালে তাল মিলিয়ে চলতে অভ্যস্ত তারা। মুখে বিপ্লবের কথা। নিজেদের সাচ্চা কমিউনিষ্ট বলে পরিচয় দেয়। বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে ভাঙ্গতে চায়না তারা, অধিকার করতে চায় শুধু। কারণ নতুন করে কিছু গড়ার ক্ষমতা তাদের নেই। সহাবস্থান নীতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব তাদের। তারা বলে 'তোমরা খাচ্ছ খাও, আমাদের নিরাশ কর না। আমরা কমিউনিষ্ট হলেও সুখ স্বাচ্ছন্দ বিলাসীতা কামনা করি। বাড়ি গাড়ি সম্পদের স্বপ্ন দেখি। সকলের কথা ভাববার আগে নিজের কথাটা চিন্তা করে নিই।

একটু আলোর রেখা। চিন্তাজাল ছিন্ন হয় তার। দৃষ্টিটাকে তীক্ষ্ণ করে সে।

আঁকাবাঁকা পথে কে যেন ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসছে।

ওরা কি কাজ শেষ করে ফিরে আসছে? ভাবল শংকর।

অপেক্ষা করে রইলো শংকর। একটু পরে আলোটা তার কাছে এসে স্থির হল। স্তব্ধ বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চাইল সে। প্রশ্ন করলো মনে মনে, কে এ?

পটে আঁকা দ্রাবিড়ি চেহারা, টানা টানা গভীর কালো চোখ,

টিকলো নাক, ভরা যৌবনা একটি কৃষক মেয়ে তার সামনে। হাতে ছোট্ট একটি ঝোলা।

কথা বলতে পারল না শংকর। মুগ্ধ বিস্ময়ে রাতের নির্জন পর্বতে চেয়ে রইলো তার দিকে।

মেয়েটির মধ্যে একটু দ্বিধার ভাব দেখা দিল। একটু সঙ্কোচ। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, আপনার খাবার নিয়ে এসেছি, খেয়ে নিন।

কে আপনি ?

আমি কৃষ্ণাম্মা।

কথাটা বলে হাতের আলোটা রেখে অসঙ্কোচে তার পাশে বসে পড়লো কৃষ্ণাম্মা।

শংকর চেয়ে চেয়ে দেখল। কৃষ্ণাম্মা তার ঝোলা থেকে খাদ্যবস্তু বার করলো। মাছের ঝোল আর ভাত। গরম, তখনও ধোঁয়া উঠছে। জলের জায়গা এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনার জন্যে খাবার এনেছি, হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নিন আপনি।

কমরেডরা কোথায় ?

পোড়া ভিটের ওপর নতুন করে ঘর বাঁধছেন তাঁরা।

এই রাত্রে ? আশ্চর্য হল সে।

হাসল কৃষ্ণাম্মা। বলল, রাত্রি দিন দুই-ই সমান আমাদের কাছে। তাছাড়া দিনের বেলা শয়তানদের জন্যে সময় কোথায় ?

কৃষ্ণাম্মা বলল, কি হল আপনার ?

কিন্তু আপনাদের গ্রামে তো পুলিশ আগুন দিয়েছে। অথচ........। কথাটা শেষ করতে পারল না সে।

হাসল কৃষ্ণাম্মা। সহজ স্বাভাবিক হাসি। বলল, ওতো নিত্য দিনের ঘটনা। আজ আগুন দিয়েছে, অন্যদিন সকালে এসেই গ্রাম

শুদ্ধ সকলকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাবে মাঠের মাঝখানে। সুরু করবে লাঠি পেটা।

প্রতিদিন ?

ধরতে গেলে প্রতিদিনই। আমাদের একরকম গা সওয়া হয়ে গেছে। কথাটা বলেই আবার হাসল কৃষ্ণাম্মা। তাড়া দিল, সকাল থেকে আপনি অভুক্ত আছেন, খেয়ে নিন।

আপনারা খেয়েছেন ?

খাবার সময় আমরা পেলাম কোথায় ?

অথচ....

আপনি যে আমাদের অতিথি।

চমৎকার আপনাদের অতিথি সেবার নমুনা। একদিকে যখন ঘর গুলো পুড়ে পুড়ে ছাই হচ্ছিল অন্যদিকে তখন নিশ্চয়ই আপনারা অতিথির জন্য রান্না করছিলেন ?

এবার আর তার কথা শুনে হাসল না কৃষ্ণাম্মা। বলল, নিজেরা খাই অথবা অতিথিকে কিছু খেতে দিই এমন কিছু ওরা রেখে যায় নি। শয়তানের দল সব কিছুই আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেছে।

তাহলে ?

পাশের গ্রাম থেকে খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে। এসেছে সকলে ঘর বেঁধে দিতে। কিন্তু আর কথা বলবেন না আপনি। ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নিন।

তবু সে বলল, অভুক্ত শুধু আমি একা নই। কমরেডদের খাওয়া হয় নি সমস্ত দিন। খাওয়া হয়নি আপনাদেরও। সকলে যখন সমস্ত দিন অভুক্ত রয়েছেন তখন আমি একা খাই কেমন করে ?

খেতে পারেন না ?

একদিন পারতাম, কিন্তু আজ কষ্ট হয়। যখন দেখি নিরন্ন মানুষের

দল একমুষ্ঠি অন্নের জন্যে হাহাকার করছে, তখন নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়।

কেন?

অন্যায় শোষণে ক্ষুধার অন্ন থেকে যারা বঞ্চিত, সেই অন্যায়কারীদের আমিও একজন।

একথা কেন মনে হয়?

মনে হয় এইজন্যে, বঞ্চিত নয়, বঞ্চনাকারীদের মধ্যে একদিন আমিও ছিলাম। আমি আমার নিজের ক্ষুধা নিবৃত্তি করেছি, আমার খাদ্য কোনদিন একজন অনাহারীকে ভাগ দিই নি। দেওয়ার কথা আমার মনেও হয় নি।

কিন্তু আজতো পারেন না?

সত্যিই আজ আর পারি না। তবু অতীতের অপরাধের কথা ভুলতে পারি না। ভিখারী ভিক্ষা চাইলে বিরক্ত হয়েছি, ভেবেছি সমাজের জঞ্জাল; কিন্তু সহানুভূতির সঙ্গে একবারও চিন্তা করিনি কেন ভিখারী হয়েছে। ভেবে দেখিনি দিন'দিন ভিখারীর সংখ্যা এভাবে বাড়ছে কি করে? এরা জন্ম ভিখারী, না সব হারিয়ে ভিখারী হয়েছে? আজকের ভিখারী সমাজের একটা বড় অংশ গ্রামের মানুষ। ছোট চাষী, ভূমিহীন কৃষক, মজুর। দুর্ভিক্ষ, অজন্মার সুযোগ নিয়েছে জমিদার, জোতদার আর মুনাফাখোর ব্যবসায়ীর দল। রাষ্ট্রের কর্ণধাররা সাহায্য করেছে এদের। সহজ, সরল, সাধারণ মানুষকে নামিয়েছে পথে।

চুপ করল শংকর। দূরের অন্ধকার আকাশের দিকে দৃষ্টিটাকে প্রসারিত করে দিল।

১লা মে ১৯৪৮ সাল। চীনা জনগণের কাছে নবজীবনের স্পন্দন নিয়ে এল প্রভাতের তরুণ তপণ। রক্তচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিগন্তে, পর্বতে কন্দরে। মূক মুখে জাগল ভাষা, ভগ্ন বুকে জাগল আশা। শক্তি চাই, সম্পদ চাই সমগ্র জাতির জন্য, চাই শান্তি, চাই স্বাধীনতা, সাম্য।

এগিয়ে চলল মুক্তি ফৌজের দল। জয়ের পর জয়। আঘাতের পর আঘাত হেনে ধ্বংস করলো শত্রুদের। ২৩শে এপ্রিল ১৯৪৯ নানকিং জয় করল তারা।

তিনি লিখলেন,

চু পাহাড়ের চারিদিকে ঝড় উঠেছে,
তার চূড়াটাকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না।
বড় বড় বাঘ আর ড্রাগনগুলো
আরও অনেক ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে আগের থেকে।
তুফান উঠেছে নদীতে।
তবু সেই তুফান আর ঝড় ভেঙ্গে লক্ষ লক্ষ বীর সৈনিক
এগিয়ে চলেছে ওই পাহাড়ের চূড়াটির দিকে।
সমস্ত পৃথিবীটাই কাঁপছে,
কারণ সবকিছুই গতিশীল, পরিবর্তনশীল
স্বর্গের দেবতাদের সত্যিকারের জীবন থাকলে তারাও বুড়ো হ'ত।
পৃথিবীর সব কিছুই কাঁপছে, টলছে, নড়ছে, পাশ ফিরছে।
শুধু আমাদের অকম্পিত অন্তরে অটল সঙ্কল্পগুলো
স্থির হয়ে বসে আছে।
আর আমরা সেই সব সঙ্কল্পগুলোকে নিয়ে
শত্রুদের পিছনে ছুটছি আর ছুটছি।

আমরাও ছুটবো ততোদিন, যতদিন একজন শত্রুও বেঁচে থাকবে। যতদিন পৃথিবীতে শ্রেণী আর শ্রেণী সংগ্রাম থাকবে ততদিন শেষ হবে না বিদ্রোহ আর বিপ্লব। যতদিন বিরোধ বৈষম্য থাকবে সমাজে ততদিনই আমরা সংগ্রাম করে যাব অক্লান্ত ভাবে।

কমরেড!

কৃষ্ণাম্মার ডাকে সংবিত ফিরে পেল শংকর। তার দিকে ফিরে চাইল।

মৃদু কণ্ঠে অনুরোধ জানাল সে, আপনি খেয়ে নিন কমরেড।

কৃষ্ণাম্মার কণ্ঠে যেন কি ছিল, এবার আর তার অনুরোধকে উপেক্ষা করতে পারল না শংকর। কথা বলল না। হাত ধুয়ে ভাতের জায়গাটা টেনে নিল। গ্রাস তুলল মুখে।

আহাররত শংকরের মুখের দিকে চাইল কৃষ্ণাম্মা। ওকে দেখল। মাথা নীচু করে একের পর একটা গ্রাস তুলছে ও। কৃষ্ণাম্মা দেখছে। সারাদিন সে নিজেও অভুক্ত। তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে কিছু খাবে ভেবে ছিল। ও যখন অন্য কথা ভাবছিল, তখন একটু বিরক্ত যে হয়নি তা নয়। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে সব বিরক্তি ধুয়ে মুছে গেছে। যেন তার কোন অতি প্রিয়জনকে সামনে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে সে। তৃপ্তিতে ভরে উঠছে মনটা।

ঘর বাঁধা নারী মনের চিরন্তন কামনা। নারীর স্থান গৃহ কোণে, যেখানে স্নেহ, শান্তি, ভালবাসায় ভরা। নারী চায় স্বামী, সন্তান, সংসার। চায় হাসি কান্না, সুখে দুঃখে ভরা জীবন। জীবনকে মধুময় করে তোলার জন্যেই তো নারী জন্ম।

কিন্তু তা ওরা হতে দিল না। ওই অত্যাচারী জহ্লাদের দল। ভারতের মানুষ স্বাধীনতা চেয়েছিল, শান্তি চেয়েছিল, কামনা করেছিল সফল জীবন।

ওরা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অভিশাপ এনে দিল জাতির জীবনে। মিথ্যার বেসাতীতে ভোলাতে চাইল মানুষকে। পন্যা সাজাল ভারত জননীকে।

ধনিক শ্রেণীর কুক্ষিগত হয়েছে আজ রাষ্ট্রযন্ত্র। ধনিক শ্রেণীর ইচ্ছানুসারে আজকের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এবং বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালকরা অধিকাংশ ধনিক শ্রেণীর অন্তর্গত।

অন্যায়, শোষণ আর অবিচার। আইন আছে, কিন্তু সে আইন ধনীর স্বার্থ রক্ষার জন্যে। গরীবের জন্যে কিছু নেই। গরীব চিরদিন মার খেয়েছে। মার খাচ্ছে।

কিন্তু আর নয়। গরীব নিরন্ন মানুষের দল অনেক মার খেয়েছে। সহ্যের সীমা পার হয়ে গেছে তাদের। তারা জেগে উঠেছে। জাগিয়ে তুলেছে আসমুদ্র হিমাচলকে।

শুধু পুরুষ নয় নারীও। ঘর ছেড়ে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তারাও। বলছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরাও আঘাত হানবো। যে হাতে একদিন আত্মীয় স্বজনদের সেবা করেছি, বরমাল্য তুলে দিয়েছি, পালন করেছি সংসার আর শিশুকে, সে হাতে অস্ত্র তুলে ধরে শত্রুর বুক লক্ষ্য করে আঘাত হানবো। নির্ভুল লক্ষ্যে শেষ করবো শ্রেণী শত্রু শয়তানদের।

আমরা বাঁচার মত বাঁচতে চাই। এভাবে তিলে তিলে ক্ষয় হতে চাই না। আমরা মুক্তি চাই।

•

তোমাকে কি করা হবে জান তুমি?

জেলা সদর জেলে পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করল তাঁকে।

নীরব রইলেন তিনি। পুলিশ অফিসারের মুখের দিকে তাকালেন না পর্যন্ত।

তুমি বুঝতে পারছো না বিপদের গুরুত্ব। তোমার কি হতে পারে।

যা হয়েছে তারপরও কিছু আছে নাকি? যেন ব্যঙ্গ করে উঠেছিল তাঁর কণ্ঠ।

তাঁর ব্যাঙ্গোক্তিতে পুলিশ অফিসার থতমত খেয়েছিল। কি বলবে ভেবে পায়নি।

বিলম্বে প্রয়োজন কি, বাকীটুকু স্থুরু করুন। ঝলসে উঠেছিল তাঁর কণ্ঠ।

কমরেড সম্পূর্ণা। কমরেড তেজেশ্বর রাও এর সুযোগ্যা পত্নী।

তিনটি সন্তানের জননী। সংসারের বধূ। কিন্তু বাড়ি ঘর পুত্রদের মায়া ছিন্ন করে সক্রিয় বিপ্লবী হিসাবে যোগ দিলেন এজেন্সী এলাকার কেন্দ্রীয় গেরিলা স্কোয়াডে। কিন্তু জুন মাসে (১৯৬৯) পুলিশের হাতে হঠাৎ ধরা পড়ে গেলেন।

থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে। প্রশ্ন করল।

তেজেশ্বর রাও কোথায় ?

জানি না।

বলবে না ?

জানি না।

বলবে না ?

জানি না।

একটি প্রশ্ন, উত্তর একটিই, জানিনা। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল পুলিশের দল। বর্বরতার চরম সীমায় নেমে গেল তারা। অত্যাচারের পর অত্যাচার। পশুর দল অমানুষিক অত্যাচার চালাল তাঁর ওপর। জ্ঞান হারালেন তিনি।

জ্ঞান হবার পর আবার প্রশ্ন হল, এখনও বল তেজেশ্বর রাও কোথায় ?

জানি না। ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন তিনি।

আমরা জানি সে কোথায়।

তাহলে আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন ?

তুই বলবি কিনা ?

না।

বলবি না ?

না।

সমানে চলল মার ধোর আর অমানুষিক অত্যাচার। বার বার

জ্ঞান হারালেন তিনি। কিন্তু স্বীকার করলেন না তেজেশ্বর রাও কোথায়।

পুলিশ বলল, এর জন্যে তোকে মরতে হবে।

উত্তর দিলেন, তোমরাও মরবে।

পুলিশ জেলার সদর জেলে পাঠিয়ে দিল তাঁকে।

পুলিশ অফিসার বলল, গুলি করে মারা হবে তোমাকে।

হাসলেন তিনি। বললেন, মিথ্যা কটা গুলি খরচ না করে মারার কাজটা তোমরাই শেষ কর না কেন?

হোয়াট? চীৎকার করে উঠেছিল পুলিস অফিসার।

তেমনি হাসলের তিনি। বললেন, জানোয়ারের অধম তোমরা, বেশ ভালভাবেই ও কাজটা শেষ করতে পারবে।

কিন্তু সত্যি সত্যিই তাঁকে মেরে ফেললে চলবে না। পুলিশ যে অনেক আশা নিয়ে তাঁকে জীবন্ত ধরেছে। কারণ তেজেশ্বর রাওকে যে তাদের চাই। তেজেশ্বর রাও যে তাদের শান্তি নিদ্রার ব্যাঘাত কারীদের অন্যতম একজন। তেজেশ্বর রাও এর মূল্য যে অনেক।

এগিয়ে এলেন গোয়েন্দা অফিসারের দল। মুখে অমায়িক হাসি ফুটিয়ে প্রশ্ন করল, কেমন আছেন কমরেড সম্পূর্ণা?

কেমন দেখছেন?

সত্যি আমি দুঃখিত। এর জন্যে ব্যাক্তিগত ভাবে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

আপনার পরিচয়?

আপনার বন্ধু বলার যোগ্যতা আমার নেই কিন্তু আমাকে আপনার একজন শুভার্থী বলে জানবেন।

আমি সত্যিই ভাল আছি।

কিন্তু....

হেসেছিলেন কমরেড সম্পূর্ণা। বলেছিলেন, আপনার দুঃখিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু এ আপনি কী করছেন বলুন তো?

অন্যায় কিছু করেছি কি?

না-না আমি সেকথা বলছিনা। মুখে হাসি ফুটিয়েছিল গোয়েন্দা। আপনি অন্যায় করছেন এমন কথা বলার মত স্পর্দ্ধা আমার নেই। কিন্তু আমি বলছিলাম....।

চুপ করলেন কেন? বেশ তো বলছিলেন।

দেখুন, আমি আপনার মঙ্গল চাই। এখন আপনি....

নিজের অমঙ্গল নিশ্চয়ই চাইবো না।

নিশ্চয়ই। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল গোয়েন্দার দুই চোখ। উৎসাহে বলেছিল, আপনি বুদ্ধিমতী, আপনার সম্বন্ধে এমন কথা ভাবা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আচ্ছা সম্পূর্ণা দেবী আপনার বাবা মা আছেন?

আপনারা জানেন না?

না, মানে, আমি বলছিলাম....

আমার বাবা মা, শ্বশুর শাশুড়ী সকলেই আছেন।

তাহলে তাঁদের ছেড়ে আপনি এ পথে কেন?

কেন বলুন তো?

আপনার স্বামী নিশ্চয়ই...........।

আপনি ঠিক বলেছেন, উনিই আমাকে এপথে এনেছেন।

আপনার স্বামী আপনাকে বললেন বলেই আপনি এপথে চলে এলেন?

না এসে কী করি বলুন। উনি আমার প্রতিটি কথা শোনেন, আর আমি ওঁর একটা অনুরোধ রাখবো না?

আবার লাফিয়ে উঠেছিল গোয়েন্দা অফিসার। অধীর কণ্ঠে বলেছিল, আপনার স্বামী আপনার কথা শোনেন?

হেসেছিলেন সম্পূর্ণা। প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি আপনার স্ত্রীর কথা শোনেন না?

তাঁর সেকথার কোন উত্তর দেয়নি গোয়েন্দা অফিসার। জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি জানেন আপনার স্বামী এখন কোথায়?

মনে মনে হেসেছিলেন সম্পূর্ণা। বলেছিলেন, দেখুন, এখন এই মুহূর্তে আমার স্বামী কোথায় বা কি করছেন আপনাদের এখানে থেকে আমার পক্ষে জানা কেমন করে সম্ভব আপনিই বলুন?

তা সত্য! স্বীকার করল গোয়েন্দা অফিসার। সামান্য এক নারী কিন্তু কি অসাধারণ বুদ্ধিমতী। বলল, কিন্তু আপনাকে যদি মুক্তি দেওয়া হয়?

আমাকে তো আপনারা গুলি করে মারবেন?

মনে করুন যদি মারা না হয়?

যদি না মারেন?

হ্যাঁ। আগ্রহী হয়ে উঠেছিল গোয়েন্দা অফিসার। বলল, দেখুন আপনার ছেলে মেয়ে আছে, শ্বশুর শাশুড়ী, বাবা মা আছেন, আপনি এসব ঝামেলায় কেন?

কাকে আপনারা ঝামেলা বলছেন? তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল কমরেড সম্পূর্ণার কণ্ঠস্বর। দিনের পর দিন যারা সব দিক দিয়ে বঞ্চিত, অবহেলিত অত্যাচারীত তাদের এই জাগরণ, বাঁচার জন্য সংগ্রামকে বলছেন ঝামেলা?

বলছি বৈকি। আদিবাসীদের এ লড়াই ঝামেলা ছাড়া আর কি হতে পারে? যে আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার জন্যে আপনারা লড়াই সুরু করেছিলেন তাদের তো সুযোগ সুবিধা কিছু কিছু দেওয়া হচ্ছে।

সুযোগ সুবিধা!

অশ্রেয় কংগ্রেসী সরকার যেন দয়া করছে! কিন্তু, কে চায় দয়ার দান? কিসের দয়া? মানুষকে যারা ভিখারী করে সম্পদের পাহাড়

জমিয়েছে, দিনের আহার, রাতের নিদ্রা কেড়ে নিয়ে সর্বহারা করেছে, দয়া করার অধিকার কোথায় তাদের ?

যে সি. পি. (এম) নিজেদের প্রকৃত কমিউনিষ্ট বলে প্রচার করে, মানব মুক্তির স্বপ্ন দেখে, যারা বলে, বাংলা দেশের মানুষ আমাদের চায়, কংগ্রেসকে শেষ করে আমরা এনেছি বাংলাদেশের মানুষের জীবনে মুক্তির আলো ; বাইশ বছরের কংগ্রেসী শাসনের অবসান ঘটিয়েছে আমাদেরই নেতৃত্ব—সেই তারা অন্ধ্রের কংগ্রেস সরকারের কাছে পলিটব্যুরোর প্রস্তাবে বলেছে, গিরিজনদের জমি দিয়ে দাও, কৃষকদের যতটা পারো সুবিধা দাও, না হলে উগ্রপন্থীদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। ওরা বিষধর সাপ নয়, ওরা সাপুড়ে, গোটা সমাজ ব্যবস্থাটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে।

নাগী রেড্ডীর দল বলল, গিরিজন এলাকায় যা হচ্ছে, তা চলতে পারে, কারণ গিরিজনদের বিশেষ অবস্থা, কিন্তু সমতল এলাকায় অসম্ভব। এখানে কেবল তালগাছের মালিক হবে তালের (তেলেগুতে তালকে তাড়ি বলে) ব্যাপারী কৃষক, পতিত জমি দিয়ে দাও বলে দাবী কর, আর কেবল লাঠি ফাটি নিয়ে ছোট—ছোটদল গড়ে যাও ভবিষ্যতে যদি প্রয়োজন পড়ে তার জন্য। তবে দেশব্যাপী বা সমতল ভূমিতে আক্রমণাত্মক আন্দোলন করা কখনোই চলবে না।

নকশালবাড়ির লাল আগুনের ঢেউ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, নব চেতনায় জাগ্রত মানুষ যাতে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে না পড়ে তার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল ওরা। গণ জাগরণকে ব্যহত করার চেষ্টা করেছিল। দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে নানারূপ জঘন্য পন্থা অবলম্বন করতেও ওদের বিবেকে এতটুকু বাধেনি।

দেশের শত্রু, জাতির শত্রু কংগ্রেস। কংগ্রেসীরা বুর্জোয়া। অথচ সত্যকারের বিপ্লবের সুরুতেই ওরা ওদের মুখোস ছিঁড়ে স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলল। আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। গেল-গেল, সব গেল।

ঠিক এমনি ঘটনা ঘটেছিল চীনে। প্রতিক্রিয়াশীল চিয়াং আর তাঁর কুয়োমিণ্টাং সরকারের বিরুদ্ধে যখন একটার পর একটা যুদ্ধে জয়ী হতে লাগল মুক্তি ফৌজ, ততই ভয় পেতে লাগল সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা। সক্রিয় হয়ে উঠল দালালের দল। তারা নানাভাবে ভাঙ্গন ধরাবার চেষ্টা করতে লাগল বিপ্লবীদের মধ্যে। চক্রান্তের জাল বিস্তার করতে লাগল তারা।

এইসব শ্রেণীশত্রু দালাল, চক্রান্তকারীদের সম্পর্কে সাবধান করে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে মাও এক ঘোষণায় হুঁশিয়ার করে দিলেন বিপ্লবীদের। বললেন, কোন দিকে তাকাবে না, কোন কথা শুনবে না। শেষ পর্যন্ত বিপ্লব চালিয়ে নিয়ে যাও। কারণ এ বিপ্লব শুধু চিয়াং কাইশেকের বিরুদ্ধে নয়, এ বিপ্লব বিশ্বের সকল প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী ও ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে। বিপ্লব শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামবে না। থামলে চলবে না।

থামেনি লাল ফৌজ। দিনের পর দিন এগিয়ে গিয়েছিল তারা। জয় থেকে আরো বড় জয়ের দিকে।

অন্ধ্রের বিপ্লবী কমরেড রাও থামেনি। এ বিপ্লব তো আপন স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়, এ যে জনযুদ্ধ। সমস্ত মানুষের মুক্তি সংগ্রাম। এ সংগ্রামে জয়ী হতেই হবে।

পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নারী। নারী পুরুষের মিলিত আঘাতে শ্রেণী শত্রুর দল শেষ হয়ে যাচ্ছে একে একে। একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এর জন্যে হয়তো অনেক কষ্ট, নির্যাতন, অত্যাচার সহ্য করতে হবে। মৃত্যু ঘটাও কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু গভীর সর্বহারা অনুভূতি নিয়ে এবং জনগণকে প্রাণ মন দিয়ে সেবা করার মনোভাব নিয়ে এগোলে, সমষ্টিগত স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দিলে এবং যা কিছু করা জনগণের স্বার্থেই করার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগোলে অত্যাচার এবং মৃত্যু কষ্টের নয়,

আনন্দের। চেয়ারম্যান বলেছেন, দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত কর্ম তৎপরতার মতই বিপ্লব সর্বদা আঁকা বাঁকা পথ ধরে চলে এবং কখনই তা সরল পথে চলে না।

বলেছেন, জনগণ, কেবলমাত্র জনগণই হচ্ছেন বিশ্ব ইতিহাস সৃষ্টির চালক—শক্তি।

সর্বহারা নিপীড়িত নির্যাতীত জনগণের মধ্যে নারীরও স্থান, নারীও পুরুষের সমান অধিকারে অধিকারিনী।

মার্কস বলেছেন, আধুনিক যন্ত্র শিল্পের ক্রিয়ায় মজুরদের মধ্যে সকল পারিবারিক বন্ধন যত বেশি মাত্রায় ছিন্ন হতে থাকে, তাদের ছেলে মেয়েরা যত বেশি করে সামান্য কেনা বেচার বস্তু ও পরিশ্রমের হাতিয়ারে পরিণত হতে থাকে, ততই পরিবার ও শিক্ষা বিষয়ে বাপ-মার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পবিত্র সম্বন্ধ বিষয়ে বুর্জোয়াদের বাগাড়ম্বর ঘৃন্য হয়ে ওঠে।

সমস্ত বুর্জোয়া শ্রেণী সমস্বরে চিৎকার করে বলে—কিন্তু তোমরা কমিউনিষ্টরা যে মেয়েদের সাধারণ সম্পত্তি করে ফেলতে চাও।

কিন্তু বুর্জোয়া নিজের স্ত্রীকে নিতান্ত উৎপাদনের হাতিয়ার হিসাবেই দেখে থাকে। তাই যখন সে শোনে যে উৎপাদনের হাতিয়ারগুলি সমবেতভাবে ব্যবহার করার কথা উঠেছে, তখন স্বভাবতই মেয়েদের ভাগ্যেও তেমনি সকলের ভোগ্য হতে হবে, এছাড়া আর কোন সিদ্ধান্তে সে আসতে পারেনা।

ঘুণাক্ষরেও তার মনে সন্দেহ জাগেনা যে আসল লক্ষ্য হল উৎপাদনের হাতিয়ার মাত্র হয়ে থাকার দশা থেকে মেয়েদের মুক্তিসাধন।

তাছাড়া, মেয়েদের উপর এই সাধারণ অধিকারটা কমিউনিষ্টরা প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করবে এই ভান করে আমাদের বুর্জোয়ারা যে এত ধর্মক্রোধ দেখায় তার চেয়ে হাস্যস্পদ আর

কিছু নেই। মেয়েদের সাধারণ সম্পত্তি করার প্রয়োজন কমিউনিষ্টদের নেই; প্রায় স্মরণাতীত কাল থেকে সে প্রথার প্রচলন আছে।

সামান্য বেশ্যার কথা না হয় ছেড়ে দেওয়াই হল, মজুরদের স্ত্রী-কন্যা হাতে পেয়েও আমাদের বুর্জোয়ারা সন্তুষ্ট নয়, পরস্পরের স্ত্রীকে ফুঁসলে আনাতেই তাদের আনন্দ।

বুর্জোয়াদের সাধে আজ বাদ সাধছে শ্রমিক শ্রেণী। নির্বিবাদে যে যথেচ্ছাচার তারা চালিয়ে এসেছে তার মূলে আঘাত লাগছে বারবার। তাদের বহুদিনের সাধের স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে।

ভারতের মাটিতে আজ যে দিন বদলের পালা।

গোয়েন্দা অফিসার বলল, যাদের জন্য এবং যে জন্য আপনাদের আন্দোলন তারা তো তা পাচ্ছে, আর কেন?

কমরেড সম্পূর্ণা হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যই কি শেষ হয়ে গেছে?

হয়নি?

না। সুরু হয়েছে মাত্র; বিপ্লবের দীর্ঘ পথের এখনও অনেক বাকী।

তা থাক। হাসল গোয়েন্দা অফিসার। নিজের ভুল স্বীকার করে আপনি ঘরে শ্বশুর শাশুড়ী সন্তানদের কাছে ফিরে যান। স্বামীকেও বুঝিয়ে সুঝিয়ে পথে নিয়ে আসুন।

পথেই তো বেরিয়েছি। বিপ্লবের পথে।

অসীম ধৈর্য্য নিয়ে হাসল গোয়েন্দা অফিসার। এ সমস্ত মিথ্যা ঝামেলা।

ঝামেলা?

নিশ্চয়ই। কি প্রয়োজন ছিল এসব ঝামেলার মধ্যে যাবার?

চেয়েছিলাম তো ঝালেমায় না যেতে।

তাহলে গেলেন কেন?

কেন গেলাম জানেন? ক্রোধে ক্ষোভে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল কমরেড সম্পূর্ণার সমস্ত মুখ। বলেছিলেন, যখন দেখলাম, না খাওয়ার, আমার সন্তানকে মানুষ করতে না পারার সমস্যার সমাধান জড়িয়ে রয়েছে কৃষক শ্রেণীর সমস্যার সমাধানের সাথে। সেই সমাধানের পথ চেয়ারম্যান মাও-এর চিন্তাধারার নির্দেশিত পথ। সেই পথই তো ধরেছি, আমার আর কোটি কোটি দরিদ্র মেহনতী মানুষের সন্তানের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য!

কৃষ্ণাম্মার মুখের দিকে চেয়ে আছে শংকর। তাকে দেখছে। অবাক হচ্ছে। ভেবে পাচ্ছে না অনেকক্ষণ ও দূরের অন্ধকার পর্বতশ্রেণীর দিকে চেয়ে আছে কেন? অন্ধকারের মধ্যেও চোখ দুটি অমন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে কেন? কি ভাবছে ও? কার কথা চিন্তা করছে!

বার কয়েক কথা বলার চেষ্টা করলো সে। ওকে ডাকতে চাইল। কিন্তু পারল না। ওর ধ্যান ভঙ্গ করতে ইচ্ছা হল না তার।

হঠাৎই এক সময় কৃষ্ণাম্মা সচকিত হল। ফিরে চাইল তার দিকে। বিস্মিত কণ্ঠে বলল, একি কখন খাওয়া হয়ে গেল আপনার?

অনেকক্ষণ।

অনেকক্ষণ? হ্যাঁ। হাসল শংকর। বলল, আপনাকে দেখছিলাম, ধ্যান ভাঙ্গাতে ইচ্ছা করেনি।

কৃষ্ণাম্মাও হাসল। বলল, ধ্যান নয়, একজনের কথা একটু আগেই মনে পড়েছিল। আমি তাঁর কথাই চিন্তা করছিলাম। আর নিজের অযোগ্যতাকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম। আমি কিছু করতে পারলাম না।

কি পারলেন না?

যে কাজের ভার আমার ওপর তাতে আমি সন্তুষ্ট নই। আমি আরো কিছু করতে চাই।

করেন না কেন ?

তেমন নির্দেশ যে আমার ওপর নেই। আমাদের যার ওপর যে দায়িত্ব তাই পালন করতে হয়। পশুগুলো রাইফেল বাগিয়ে সকাল বিকাল হানা দেয় গ্রামে, ইচ্ছামত পীড়ন করে। নোংরা কথাবার্তা বলে। ইচ্ছা হয় শেষ করে দিই। যে হাতে পীড়ন করছে সে হাত ভেঙ্গে দিই। যে মুখে অশ্লীল কথা বলছে সে মুখখানা গুঁড়িয়ে দিই। ইচ্ছা করলে পারি তা, কিন্তু পারি না, কারণ তেমন নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

যদি পেতেন তেমন নির্দেশ !

সামান্য আলোতে কঠিন দেখিয়েছিল কৃষ্ণাম্মার সুন্দর মুখখানা। তীব্র ঘৃণা ঝরে পড়েছিল কণ্ঠে, পশুগুলোকে নিশ্চয়ই শেষ করে দিতাম।

তাহলে গ্রামের মানুষকে যে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হত।

বাধা তো এখানেই। সেই জন্যেই তো পারি না। হঠাৎ নীরব হল কৃষ্ণাম্মা। তুরন্ত ঘৃণার অভিব্যক্তি ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। বলল, কিন্তু তাতেই কি রেহাই পাওয়া যাচ্ছে ? পশুর দল কি অত্যাচার কিছু কম করছে ?

না। বরং দিনের পর দিন অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে চলেছে। অহিংসার পূজারী অন্ধ্রের কংগ্রেসী সরকার, যারা শতমুখে প্রচার করে অহিংসা পরমধর্ম। অহিংসা দিয়েই দেশ থেকে বিদায় করেছে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে। অনশন করে একদিন কাঁপিয়ে তুলেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে। হিংসার পথে নয়, হিংসায় হিংসা বাড়ে। সত্য অহিংসা।

সেই সত্যাশ্রয়ী অহিংসার মানসপুত্ররা শ্রীকাকুলামের প্রত্যেকটি গ্রামের এক মাইল, কোথাও আধ মাইলের মধ্যে সেণ্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের এক একটি ক্যাম্প বসিয়েছে। হাতে তুলে দিয়েছে হিংসাকে রোধ করার জন্য অহিংসার পুষ্পধনু রাইফেল। নেকড়ের ক্ষুধা নিয়ে

ঝাঁপিয়ে পড়ছে তারা গ্রামের ওপর। নারী, শিশু, বৃদ্ধ কেউ রেহাই পাচ্ছে না তাদের কাছ থেকে। মেয়েদের ওপরে বলাৎকার চলেছে সমানে। পশুক্ষুধা মেটাতে গর্ভবতী হয়েছে নারী, যে কদিন পরে মা হবে সেও বাদ পড়ছে না।

না-না এ হতে পারে না। এ সত্য নয়, মিথ্যা, অপপ্রচার। অহিংসা মন্ত্রে কলঙ্ক লেপনের অপচেষ্টা। দুষ্টবুদ্ধি কমিউনিষ্টদের শয়তানি।

কিন্তু টেক্কালি তালুকের একটি গ্রামে পুলিশের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল একদিন। মানুষ তখন যে যার কাজে ব্যস্ত। সাবধান হবার সুযোগ পেল না। ওদের হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে যে কোনে আশ্রয় নেবে তেমন অবসর মিলল না। ওরা বেড়াজালে আবদ্ধ করে সমস্ত গ্রামটাকে ঘিরে ফেলেছে।

সুরু হল মারপিট। শিশু বৃদ্ধ কেউ রেহাই পেল না। কিন্তু কেন তাদের ওপর এই পীড়ন কেউ জানল না। কি তাদের অপরাধ তাও বলল না। কারো হাত পা ভেঙ্গে দিল, কারো মাথা ফাটাল। সন্তানকে মারছে দেখে ছুটে এল মা। শয়তানের দল লাথি মেরে ছিটকে ফেলে দিল মাকে।

তারপর? ওরা চলে গেল?

না গেল না। শুধু মারধোর করার জন্যে তো ওরা আসেনি। ওদের উদ্দেশ্য যে অন্য। উপোসী পশুর দল গ্রামটির ওপর হামলা করে তাদের পশুক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্যে গ্রামের মানুষকে মেরেছে, শুধু তাদের কাজে যদি বাধা দেয় এই আশঙ্কায়।

ওদের অত্যাচারে আহত মানুষগুলো যখন যন্ত্রণায় ছটফট করছে, ওরা তখন ওদের পশুত্বের চিহ্ন এঁকে দিল কটি নারীর ওপর। যে কৃষক বধূ একখানি কচি মুখের স্বপ্ন দেখছিল, পরম স্নেহে মমতায় লালন করছিল গর্ভস্থ ভবিষ্যৎকে, ওদের পৈশাচিকতায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল একসময়।

অহিংসার পূজারীদের শান্তিরক্ষকের দল উৎসব শেষে ফিরে গেল এক সময়। আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল একটি শান্ত স্নিগ্ধ গ্রামের শান্তি-প্রিয় কিছু মানুষের মনে।

নকশালবাড়ির লাল আগুনের স্পর্শে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল শ্রীকাকুলামের মানুষের হৃদয়। শপথ নিয়েছিল। জেগে উঠেছিল কিছু মানুষ। যারা জাগেনি তাদেরও জাগিয়ে তুলল ওদের অত্যাচার।

কমরেড !

শংকরের ডাকে তার দিকে তাকাল কৃষ্ণাম্মা।

এ তো অত্যাচার নয়—জাগরণ। অত্যাচার যত তীব্র হবে মানুষের মনের ভয়, দ্বিধা, সঙ্কোচ দূর হবে ততোই। চেয়ারম্যান বলেছেন, যেখানে অত্যাচার সেখানেই প্রতিরোধ। একদিন ভারতবর্ষ জুড়ে ঐক্য স্থাপিত হবে। সর্বহারা মানুষের দল টিপে ধরবে অত্যাচারীর টুঁটি। আজকের এ অন্যায়ের ক্ষমা সেদিন ওরা পাবে না। ওদের জবাবদিহির কিছু থাকবে না সেদিন।

কবে ? কতদিন এমন অত্যাচার সহ্য করতে হবে ?

দিন তো এসেছে কমরেড।

তাহলে কেন আমাকে অত্যাচার দেখেও নীরব থাকতে হয় ? কেন আঘাত হানতে পারিনা ? কেন ?

কৃষ্ণাম্মার অধৈর্যতায় হেসে ফেলল শংকর। বলল, আপনি বড় ছেলেমানুষ কমরেড, বড় চঞ্চল। চেয়ারম্যান কিন্তু অন্য কথা বলেছেন।

আমি জানি।

তাহলে আপনি ও কথা বলছেন কেন ?

শয়তানদের অমানুষিক অত্যাচার যে অসহ্য লাগে।

তবু আপনাকে তা সহ্য করতে হবে। কারণ সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এমন কোন কাজ আপনি নিশ্চয়ই করতে পারেন না ?

না।

আবার হেসে ফেলল শংকর। বলল, সত্যিই আপনি ছেলেমানুষ কমরেড। উতলা হলে তো চলবে না, আরো বড় আঘাতের জন্য সব সময় নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে। সাধারণ মানুষকে রক্ষা করে তবেই নিজের কথা ভাববেন। কারণ আমাদের মৃত্যু অথবা বেঁচে থাকা সবই জনগণের জন্য।

কথা বলল না কৃষ্ণাম্মা। বাসনগুলো একে একে তুলে গুছিয়ে নিতে লাগল।

শংকর চাইলো আকাশের দিকে। তেমনি অন্ধকার আকাশ। এতোটুকু আলোর চিহ্ন মাত্র নেই। মনে পড়লো চেয়ারম্যানের সেই কবিতাটা। তিনি লিখেছিলেন।

আজও আমার সব কিছু মনে আছে
মনে আছে আমার বত্রিশ বছর আগের এই গাঁয়ের
কথা।
অত্যাচারী জমিদার জোতদাররা তাদের কালো হাত তুলে
নির্মমভাবে চাবুক মারত যে সব চাষীদের পিঠে
আজ সেইসব চাষীদের ঘরে ঘরে লাল পতাকা উড়ছে।
বহুলোকের আত্মত্যাগর ফলেই
জয়ী হয়েছে আজ আমাদের ইচ্ছা।

কমরেড!

কৃষ্ণাম্মার ডাকে তার দিকে চাইল শংকর। ও চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কথা বলল না সে। নীরবে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

আপনি তো আগামীকাল সকালেই চলে যাচ্ছেন? মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল ও।

কমরেডরা ফিরে এলেই জানতে পারবো।

ক্ষণিক আগের যে দুর্বলতাটুকু প্রকাশ করে ফেলেছি তার জন্যে কিছু

মনে করবেন না। আমি এখনও অজ্ঞই থেকে গেছি। আমি দুর্বলতাটুকু নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠতে পারবো। বিদায়!

আপনার আলোটা নিয়ে যান।

ওটা আপনার কাছেই রেখে যেতে বলেছেন কমরেডরা।

পাহাড়ী পথে ধীরে ধীরে নেমে গেল কৃষ্ণাম্মা। ক্ষাণিক পরে তাকে আর দেখা গেল না। শংকর দাঁড়িয়ে রইলো।

মার্কস বলেছেন, আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।

স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিশিয়ান এবং প্লিবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, গিল্‌ড্‌কর্তা (গিল্‌ডের অন্তর্ভুক্ত কর্তা) আর কারিগর, এক কথায় অত্যাচারী এবং অত্যাচারীত শ্রেণী সর্বদাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে, অবিরাম লড়াই চালিয়েছে, কখনও আড়ালে কখনও বা প্রকাশ্যে; প্রতিবার এ লড়াই শেষ হয়েছে গোটা সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠনে অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলির ধ্বংস প্রাপ্তিতে।

ভূতপূর্ব ঐতিহাসিক যুগগুলিতে প্রায় সর্বত্র আমরা দেখি, সমাজ বিভিন্ন বর্গের একটা জটিল বিন্যাস, সামাজিক পদমর্যাদার নানাবিধ ধাপ। প্রাচীন রোমে ছিল প্যাট্রিশিয়ান, যোদ্ধা (knights), প্লিবিয়ান, এবং ক্রীতদাসেরা; মধ্য যুগে ছিল সামন্ত প্রভু, অনু-সামন্ত (vassals), গিল্‌ড্‌কর্তা, কারিগর, শিক্ষানবিশ কারিগর এবং ভূমিদাস। এইসব শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যে আবার আভ্যন্তরীণ স্তরভেদ।

সামন্ত সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে আধুনিক যে বুর্জোয়া সমাজ জন্ম নিয়েছে তার মধ্যে শ্রেণী বিরোধ শেষ হয়ে যায় নি। এ সমাজ শুধু প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন শ্রেণী, অত্যাচারের নতুন অবস্থা, পুরাতনের বদলে সংগ্রামের নতুন ধরণ।

আমাদের যুগ অর্থাৎ বুর্জোয়া যুগের কিন্তু এই একটা স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে; শ্রেণী বিরোধ এতে সরল হয়ে এসেছে। গোটা সমাজ ক্রমেই দুটি বিশাল শত্রু শিবিরে ভাগ হয়ে পড়ছে, ভাগ হচ্ছে পরস্পরের সম্মুখীণ দুই বিরাট শ্রেণীতে—বুর্জোয়া (আধুনিক পুঁজিপতি শ্রেণী, সামাজিক উৎপাদনের মালিক এবং মজুরি-শ্রমের নিয়োগ কর্তা) এবং

প্রলেতারিয়েত (মজুরি-শ্রমিকেরা, উৎপাদনের উপায় নিজেদের হাতে না থাকার দরুন যারা বেঁচে থাকার জন্য স্বীয় শ্রম শক্তি বেচতে বাধ্য হয়)।

বলেছেন, বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে, সেইখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতি-শোভন সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে। যে সব বিচিত্র সামন্ত বাঁধনে মানুষ বাঁধা ছিল তার স্বভাবসিদ্ধ উর্ধ্বতনদের কাছে, তা এরা ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের অনাবৃত স্বার্থের বন্ধন, নির্বিকার 'নগদ টাকার' বাঁধন ছাঁড়া আর কিছুই এরা বাকি রাখেনি। আত্মসর্বস্ব হিসাব নিকাশের বরফজলে এরা ডুবিয়ে দিয়েছে ধর্ম-উন্মাদনার স্বর্গীয় ভাবোচ্ছ্বাস, শৌর্য বৃত্তির উৎসাহ ও কূপমণ্ডূক ভাবালুতা। লোকের ব্যক্তি-মূল্যকে এরা পরিণত করেছে বিনিময় মূল্যে, অগণিত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থানে এরা এনে খাড়া করল ওই একটি মাত্র নির্বিচার স্বাধীনতা—অবাধ বানিজ্য। এক কথায়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভ্রমে যে শোষণ এতদিন ঢাকা ছিল, তার বদলে এরা এনেছে, নগ্ন-নির্লজ্জ সাক্ষাৎ, পাশবিক শোষণ।

মানুষের যে সব বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখেছে, বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসাবিদ, আইনবিশারদ, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী—সকলকেই এরা পরিণত করেছে তাদের মজুরী-ভোগী শ্রমজীবি রূপে।

বুর্জোয়া শ্রেণী পরিবার প্রথা থেকে তার ভাবালু ঘোমটাকে ছিঁড়ে ফেলেছে, পারিবারিক সম্বন্ধকে পরিণত করেছে একটা নিছক আর্থিক সম্পর্কে।

বলেছেন, সাধারণভাবে মালিকানার উচ্ছেদ নয়, বুর্জোয়া মালিকানার উচ্ছেদই কমিউনিষ্টের বৈশিষ্ট্য সূচক দিক। কিন্তু শ্রেণী-বিরোধের উপর, অল্প লোকের দ্বারা বহুজনের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত

উৎপাদন এবং উৎপন্ন দখলী ব্যবস্থার চূড়ান্ত ও পূর্ণতম প্রকাশ হল আধুনিক বুর্জোয়া ব্যক্তিগত মালিকানা।

এই অর্থে কমিউনিষ্টদের তত্ত্বকে এক কথায় প্রকাশ করা চলে: ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ।

বলেছেন, আমরা ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান চাই শুনে আপনারা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। অথচ আপনাদের বর্তমান সমাজে জনগণের শতকরা নব্বইজনের ব্যক্তিগত মালিকানা তো ইতিমধ্যেই লোপ পেয়েছে; অল্প কয়েকজনের ভাগ্যে সম্পত্তির একমাত্র কারণ হল ঐ দশ ভাগের নয়ভাগ লোকের হাতে কিছুই না থাকা। সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ দাঁড়ায় এই যে সম্পত্তির অধিকারের এমন একটি রূপ আমরা তুলে দিতে চাই যা বজায় রাখার অনিবার্য সর্ত হল সমাজের বিপুল সংখ্যাধিক্য লোকের সম্পত্তি না থাকা।

এক কথায়, আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের অভিযোগ এই যে আপনাদের সম্পত্তির উচ্ছেদ আমরা চাই। ঠিক কথা, আমাদের সংকল্প ঠিক তাই-ই।

বলেছেন, আপন মতামত ও লক্ষ্য গোপন রাখতে কমিউনিষ্টরা ঘৃণাবোধ করে। খোলাখুলি তারা ঘোষণা করে যে তাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে কেবল সমস্ত প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার সবল উচ্ছেদ মারফৎ। কমিউনিষ্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসক শ্রেণীরা কাঁপুক। শৃঙ্খল ছাড়া প্রলেতারিয়েতের হারাবার কিছু নেই। জয় করার জন্য আছে সারা জগৎ।

এই মহৎ উদ্দেশ্যেই ১৮৭১ সালে প্যারিস কমিউনের বীরত্বপূর্ণ অভ্যুত্থান ঘটেছিল। প্যারিস কমিউন ছিল মহান, যুগান্তকারী বিপ্লব। পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করার জন্য সর্বহারার যে প্রচেষ্টা, তারই প্রথম পৃথিবীব্যাপী গুরুত্বসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মহড়া ছিল এই প্যারিস কমিউন।

কিন্তু প্যারিস কমিউনের লক্ষ্য অপূর্ণ থেকে গেল। ভার্সাই হতে প্রতি বিপ্লবী আক্রমণে 'কমিউন' যখন পরাজয়ের মুখে, তখন মার্কস বলেছিলেন :

"কমিউন যদি বিনষ্ট হয়,—সংগ্রাম স্থগিত হইবে মাত্র। কমিউনের তত্ত্বগুলি চিরন্তন ও অবিনাশী ; শ্রমিক শ্রেণী মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ঐ তত্ত্বগুলি দেখা দিবে বারংবার।"

এখন কমিউনের সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন নীতিটি কি ?

মার্কসের বক্তব্য অনুসারে তা হল, "পূর্বে তৈয়ারী রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে শুধু মাত্র হাতে তুলিয়া লইয়াই শ্রমিক শ্রেণী উহা নিজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারে না। অর্থাৎ কিনা, রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ব করিবার জন্য সর্বহারা শ্রেণীকে বৈপ্লবিক উপায় প্রয়োগ করিয়া বুর্জোয়াদের সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র বিধ্বস্ত করিতে হইবে এবং বুর্জোয়া একনায়কত্বের স্থলে সর্বহারার একনায়কত্ব স্থাপন করিতে হইবে।"

প্যারিস কমিউনের অপূর্ণ লক্ষ্য শেষ পর্যন্ত ছেচল্লিশ বছর পরে, লেনিনের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে মহান অক্টোবর বিপ্লবের (১৯১৭) মধ্যে জয়যুক্ত হল। লেনিনের পতাকাতলে, অক্টোবর বিপ্লবের পতাকাতলে আরম্ভ হল পৃথিবী জোড়া এক নতুন বিপ্লব,—সবহারার বিপ্লব সেখানে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করল।

সাম্রাজ্যবাদী শয়তানেরা ধর্মসম্ভবনাকে মুছে ফেলার জন্য কম চেষ্টা করেনি। তারা রুশ প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নবজাত সোবিয়েত রাষ্ট্রটিকে গলা টিপে মারার চেষ্টা করেছিল, চালিয়েছিল সশস্ত্র আক্রমণ। কিন্তু বীর রুশ শ্রমিক শ্রেণী দেশের মধ্যস্থ প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিলেন। পৃথিবীর প্রথম মহান সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রটিকে সংহত করে তুলেছিলেন।

লেনিনের আহ্বান শক্তিসম্পন্ন, কারণ তা নির্ভুল। সাম্রাজ্যবাদী যুগের ঐতিহাসিক অবস্থায়, সর্বহারার বিপ্লব এবং সর্বহারার একনায়কত্ব

সম্বন্ধে লেনিন কতকগুলি অবিসংবাদিত সত্য উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। লেনিন দেখিয়েছিলেন যে, ক্ষুদ্র সংখ্যক পুঁজিতন্ত্রী শাসকের মুষ্টিমেয় ক্ষমতাবানেরা, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজ নিজ দেশের জনগণকে শোষণ করে ; কেবল তাই নয়, সমগ্র পৃথিবীতে তারা উৎপীড়ন ও লুণ্ঠন চালায়, প্রায় সমস্ত দেশকে তারা নিজেদের উপনিবেশ ও অধীন রাজ্যে পরিণত করে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হল সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির অনুবৃত্তি। সাম্রাজ্যবাদীদের লালসা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হবার নয়, আন্তর্জাতিক বাজার, কাঁচামালের উৎস ও অর্থলগ্নী করার ক্ষেত্রের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের যে লালসা তা কিছুতেই পরিতৃপ্তি হবার নয়। এই লালসার জন্য এবং পৃথিবীকে নতুন করে ভাগাভাগি করে নেবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বযুদ্ধ বাধায়। এই পৃথিবীতে সাম্রাজ্য-বাদী পুঁজিতন্ত্রের অস্তিত্ব যতকাল থাকবে, ততকাল যুদ্ধের উৎসগুলির সম্ভাবনাও বজায় থাকবে। যুদ্ধের উৎস কি তা বোঝাবার কাজে এবং শান্তির জন্য ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে জনগণকে পরিচালিত করতে হবে সর্বহারা শ্রেণীকেই।

তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন যে, "সাম্রাজ্যবাদ হইল একচেটিয়া, পরগাছা স্বরূপ, বা ক্ষয়িষ্ণু ও মৃতকল্প পুঁজিতন্ত্র, ইহা হইল পুঁজিতন্ত্র বিকাশের চূড়ান্তপর্ব, অতএব, ইহা সর্বহারা বিপ্লবের পূর্বাহ্ন। সর্বহারার মুক্তি আসিতে পারে একমাত্র বিপ্লবের পথে, উহা নিশ্চয়ই সংস্কারবাদের পথে আসিতে পারে না। উপনিবেশগুলির ও পরাধীন দেশগুলির জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে পুঁজিতন্ত্র দেশগুলির সর্বহারা মুক্তি আন্দোলনের মৈত্রী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের মৈত্রীটিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারে ঐ মৈত্রী ; অতএব ঐ মৈত্রী যে সমগ্র পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার চূড়ান্ত অবসান ঘটাইবে, তাহা অবশ্যম্ভাবী।"

সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগের ঐতিহাসিক অবস্থায় লেনিন

মার্কসবাদকে এক নতুন পর্য্যায়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণী ও মানুষকে পথ দেখিয়েছিলেন—যে পথে অগ্রসর হলে তারা সত্যই পুঁজিতন্ত্রী, সাম্রাজ্যবাদী, দাসত্ব ও দারিদ্র ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে।

মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের সামঞ্জস্য পূর্ণ ব্যাখ্যায় আমাদের এ যুগটা হল সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগ-সমাজতন্ত্র ও কমিউ-নিজমের বিজয়ের যুগ ; বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে সহবস্থানের যুগ নয়।

কবিতা লিখেছেন লেনিন, জীবনেব প্রথম এবং শেষ কবিতা। এই কবিতার জন্ম ১৯০৭ সালে ফিনল্যাণ্ডের বাল্টিক নদী তীরস্থ সেই ভিস্তা গ্রামের এক পর্ণ কুটিরে। তখন তিনি আত্মগোপন করেছিলেন ওখানে। ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবের চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায় তাঁর লেখা একটি কবিতায়। লিখেছেন ঃ

সে এক ঝড়ো বছর। ঝঞ্ঝা ছেয়ে ফেলল
সারা দেশ। ছিন্ন ভিন্ন হল মেঘ,
ঝড় ভেঙ্গে পড়ল আমাদের উপর, তারপর শিলাবর্ষণ
আর বজ্রপাত।
ক্ষতগুলি হাঁ হয়ে রইল ক্ষেতে আর গ্রামে
আঘাতের পর আঘাতে।
ঝলকাতে লাগল বিদ্যুৎ, হিংস্র উন্মত্ত হয়ে উঠল
সেই ঝলকানি।
উত্তাপ জ্বলতে লাগল নির্মম, দমবন্ধ হয়ে এল বুকের।
আর আগুনের আভা আলোকিত ক'রে তুলল
নক্ষত্রহীন রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকার।

সারা সৃষ্টি, সমস্ত মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে গেল
এক থমথমে উদ্বেগে পীড়িত হতে থাকল সমস্ত হৃদয়

বুকগুলি যন্ত্রণায় হাঁসফাঁস করতে লাগল
চেপে বন্ধ হয়ে গেল শুকনো সব মুখ।
রক্তাক্ত ঝড়ে হাজার হাজার শহীদ হারাল প্রাণ
কিন্তু বৃথাই দুঃখ সয়নি তারা, বৃথাই পরেনি কাঁটার মুকুট।
মিথ্যা আর অন্ধকারের রাজ্যে ভণ্ডদাসদের মধ্যে
তারা পথ চ'লে গেল ভবিষ্যতের মশালের মতো।

আগুনের ফলকে, অনির্বাণ এক ফলকে
তারা এঁকে দিয়ে গেছে আমাদের সামনে
আত্মোৎসর্গের পথ
জীবনের সনদে, তারা ঘৃণার শীলমোহর লাগিয়ে দিয়েছে
দাসত্বের জোয়ালের উপর, শৃঙ্খলের লজ্জার উপর।

*

মে মাসের সকালের মত এক রক্তিম প্রত্যূষ
উঠল পাণ্ডুর বিষন্ন আকাশে
ঝকমকে সূর্য তার রশ্মির তলোয়ারে
ফেড়ে ফেলল মেঘ, ছিঁড়ে গেল কুয়াশার শবাচ্ছাদন

পৃথিবীর সমুদ্র গহ্বরে বাতিঘরের দীপ্তির মতো,
প্রকৃতির বেদীমূলে কোনো অজানা হাতে চিরকালের
জন্যে জালানো হোমাগ্নির মতো
নিদ্রিত মানুষকে আকর্ষণ করল সে আলোকের দিকে।
উদ্দীপ্ত রক্ত থেকে জন্ম নিল রাঙা গোলাপ,
লাল লাল ফুল, ফুটে উঠল তারা,
বিস্মৃত কবরগুলোর উপর
তারা পরাল গৌরব-মুকুট।

মুক্তি রথের পিছনে
লাল নিশান উড়িয়ে

নদীর মত প্রবাহিত হল জনতা
যেমন ক'রে জেগে ওঠে জলস্রোত।
লাল পতাকা স্পন্দিত হল শোভাযাত্রার উপর,
মুক্তির পবিত্র স্তোত্র উঠল আকাশে,
জনগণ গান গাইতে লাগল প্রেমের অশ্রু ফেলে,
শোক যাত্রার গান তাদের শহীদদের স্মরণে।
জনগণ আনন্দে উচ্ছল,
তাদের হৃদয় ছাপিয়ে গেল আশায় আর স্বপ্নে
সবাই বিশ্বাস করল আগত মুক্তিতে
বিজ্ঞ বৃদ্ধ থেকে কিশোর পর্যন্ত সবাই।

*

অন্ধকারের শক্তিরা ছায়ায় গুঁড়ি মেরে ছিল,
ধূলোর মধ্যে বুকে হেঁটে ফোঁস ফোঁস করছিল;
ওৎ পেতে ছিল তারা।
হঠাৎ তারা তাদের দাঁত আর ছুরি বসিয়ে দিল
বীরেদের পিঠে আর পায়ে।
জনগণের শত্রুরা নোংরা মুখ দিয়ে
পান ক'রে নিল উষ্ণ নির্মল রক্ত,
মুক্তির নিষ্কলুষ বন্ধুরা তখন
কঠিন পথ ভ্রমণে অবসন্ন,
যখন তারা তন্দ্রাতুর আর নিরস্ত্র তখন হঠাৎ আক্রান্ত
হল তারা।

আলোর দিন অদৃশ্য হল,
সীমাহীন অভিশপ্ত একসার কালো দিন জুড়ল
তার জায়গা।
মুক্তির আলো আর সূর্য গেল নিভে,
অন্ধকারে উন্মত হয়ে রইল এক সর্পদৃষ্টি।

জঘন্য হত্যাকাণ্ড, সাম্প্রদায়িক পীড়ন, কুৎসার উৎক্ষেপ
ঘোষিত হচ্ছে দেশপ্রেম ব'লে
কালো ভূতের দল উৎসব করছে
এক বল্গাহীন অশ্রদ্ধায়,
যারা প্রতিহিংসার শিকার হয়েছে
যারা বিনা কারণে বিনা দয়ায়
বিশ্বাসঘাতী আঘাতে নিহত হয়েছে
তাদের—সেই সব জ্ঞাত অজ্ঞাত শিকারের
রক্তে ওরা লিপ্ত।

*

ছিন্ন পদদলিত মুক্তির ফুল
আজ বিনিষ্ট হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে একেবারে,
কালোরা আলোর পৃথিবীর সন্ত্রাস দেখে উল্লসিত,
কিন্তু ঐ ফুলের ফল জন্মদাত্রী মাটির মধ্যে
আশ্রয় নিয়েছে।
মায়ের জঠরে আশ্চর্য সেই কণিকা
দৃষ্টির অন্তরালে গভীর রহস্যে নিজেকে জীইয়ে রেখেছে ;
মাটি তাকে পুষ্ট করবে, সে উত্তাপ পাবে মাটির ভিতরে,
তারপর আবার নতুন এক জীবনে জন্মাবে সে।
নতুন মুক্তির উন্মুখ বীজ বহন করবে সে,
ভেঙ্গে ফেলবে বরফের আস্তরণ,
বেড়ে উঠবে, বিরাট মহীরুহ হয়ে জগৎকে আলোকিত
করে তুলবে তার লাল পত্র বিস্তারে,
সারা জগৎকে, আর জড়ো করবে তার ছায়ার তলে সমস্ত
জাতির জনগণকে।

অস্ত্র ধরো, ভাইরা ! সুখের দিন কাছে !
সাহসে বুক বাঁধো ! ঝাঁপিয়ে পড়ো যুদ্ধে এগিয়ে চলো !

তোমাদের মনকে জাগাও! হীন ভীরু ভয়কে তাড়িয়ে
দাও তোমাদের হৃদয় থেকে!
দৃঢ় করো ব্যূহ! স্বৈরাচারীদের আর প্রভুদের বিরুদ্ধে
সকলে একসঙ্গে দাঁড়াও!
বিজয় ভাগ্য তোমাদের সবল শ্রমিক-বাহুর মধ্যে!
সাহসে বুক বাঁধো! এই দুর্গতির দিন শিগগিরই দূর হবে
ওঠো তোমরা সবাই মিলে মুক্তি-পীড়কদের বিরুদ্ধে!
বসন্ত আসবে···আসছে সে···এসে গেছে সে।
আমাদের বহু আকাঙ্খিত অপূর্ব সুন্দর সই লাল মুক্তি
এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে!

স্বৈরশাসন,
জাতীয়তাবাদ,
গোঁড়ামি,
অকাট্য ভাবে প্রমাণ করেছে তাদের গুণরাজি;
তাদের নামে ওরা আমাদের মেরেছে, মেরেছে, মেরেছে!
ওরা কৃষককে আঘাত করেছে তার অস্থিমজ্জা পর্যন্ত,
ওরা ভেঙ্গে দিয়েছে দাঁত,
ওরা শৃঙ্খলিত মানুষকে কবর দিয়েছে বন্দীশালায়,
ওরা লুট করেছে, ওরা খুন করেছে······
আমাদের মঙ্গলের জন্যে, আইন অনুসারে,
জারের গৌরবের জন্যে, সাম্রাজ্যের সম্মানের জন্যে!

*

হে সৈন্যরা, একগ্লাস ভদ্‌কার মধ্যে
ডুবিয়ে দাও তোমাদের অনুশোচনা!
হে বীরবৃন্দ, চালাও গুলি শিশু আর নারীর উপর!
তোমাদের ভাইয়েদের হত্যা করো যত বেশী পারো,
যাতে তোমাদের ধর্মবাপ খুশি হতে পারেন!
আর যদি তোমার আপন বাপ গুলি খেয়ে পড়ে

তবে ডুবে যাক সে তার নিজের রক্তে,

কেন—এর হাতে ঝরানো রক্তে !

জারের মদ খেয়ে পশু বনে

তোমার আপন মাকে খুন করো বিনা দয়ায় !

*

তোমার জহ্লাদদের নিয়ে,

হে স্বৈরাচারী, চালাও তোমার রক্তাক্ত ভোজের **উৎসব,**

হে রক্ত শোষক, তোমার লুব্ধ কুকুরদের লাগিয়ে

কুরে কুরে খাও জনগণের মাংস !

হে স্বৈরাচারী, আগুন বুনে দাও।

আমাদের রক্ত পান করো, রাক্ষস !

মুক্ত মানুষের সংগ্রাম, তুমি জাগো।

ওড়ো তুমি, লাল নিশান !

আর তোমরা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করো, **সাজা দাও,**

শেষবারের মতো আমাদের পীড়ন করো !

শাস্তি পাওয়ার সময় নিকটে,

বিচার আসছে। জেনে রাখো !

মুক্তির জন্যে

আমরা যাব মৃত্যুর মুখে, মৃত্যুর মুখে,

আমরা ছিনিয়ে নেব ক্ষমতা আর মুক্তি,

পৃথিবী হবে জনগণের !

অসফল সংগ্রামে

প্রাণ হারাবে অসংখ্য লোক !

তা সত্ত্বেও চলো আমরা এগিয়ে চলি

বহু-বাঞ্ছিত মুক্তির দিকে !

হে শ্রমিক !   এগিয়ে চলো !
তোমার সৈন্যবাহিনী চলেছে যুদ্ধে
স্বাধীন শ্রমের জন্যে ।
তাদের দৃষ্টি জ্বলছে ভয়াল ।

আকাশ পর্যন্ত বাজিয়ে তোলো
শ্রমের মৃত্যুঞ্জয়ী ঘণ্টা !
আঘাত করো, হাতুড়ি, আঘাত করো অবিরাম !
অন্ন !   অন্ন !   অন্ন !

এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, কৃষকেরা !
জমি ছাড়া তোমরা বাঁচতে পারো না ।
প্রভুরা কি তোমাদের পিষ্ট করবে এখনও,
তারা কি তোমাদের পীড়ন করবে এখনও অনেক কাল ?
এগিয়ো চলো, এগিয়ে চলো ছাত্ররা !
তোমাদের অনেকে ধ্বংস হবে সংগ্রামে ।
লাল ফিতে জড়িয়ে রাখবে
যুদ্ধে নিহতদের শবাধার ।

এগিয়ো চলো, এগিয়ে চলো, ক্ষুধিতেরা !
এগিয়ে চলো, নিপীড়িতেরা !
এগিয়ে চলো অপমানিতেরা,
মুক্ত জীবনের দিকে ।

উপর ওয়ালা জন্তুদের জোয়াল
আমাদের লজ্জা ।
চলো, ইঁদুর গুলোকে তাড়াই তাদের গর্ত থেকে ।
চলো যুদ্ধে, হে সর্বহারা !

নিপাত যাক দুঃখ-দুর্দশা !
নিপাত যাক জার আর তার সিংহাসন !
নক্ষত্রখচিত মুক্তির প্রত্যুষ ঐ দেখো
ঝকমক করে তার দীপ্তি।

সুখ আর সত্যের রশ্মি
জনগণের চোখের সামনে ফুটে ওঠে।
মুক্তির সূর্য মেঘ ভেদ করে আলোকিত করবে আমাদের।

জারের দুর্বৃত্তদের উদ্দেশে
"দূর হও ভাগো তোমরা"
বলবে পাগলাঘন্টীর জোরালো স্বর
মুক্তিকে আবাহন করে।

নিপীড়ন, ওখরানা,
চাবুক, ফাঁসি কাঠ, নিপাত যাক !
মুক্ত মানুষের সংগ্রাম, তুমি আগল ভেঙে বেরোও !
অত্যাচারীরা ধ্বংস হোক তোমাদের !

একা নির্মূল করি
স্বৈরাচারের শক্তিকে।
মুক্তির জন্যে মৃত্যু হল সম্মান,
শৃঙ্খলিত জীবন ধারণ হল লজ্জা।

এসো ভেঙ্গে ফেলি দাসত্ব,
গোলামির লজ্জা।
হে মুক্তি আমাদের দাও
পৃথিবী আর স্বাধীনতা।

২৮শে মে, ১৮৭১ সালে প্যারী কমিউনকে রক্তের গঙ্গায় ডুবিয়ে দিয়ে বুর্জোয়া প্রতি বিপ্লবী নায়করা দর্পভরে ঘোষণা করেছিল যে সমাজতন্ত্রকে তারা চিরদিনের মত খতম করে দিয়েছে। কিন্তু কমিউনের মূল তত্ত্বের বিনাশ নেই, তা অবিনশ্বর, প্রমাণ করলেন লেনিন। সর্বহারার স্বাধীনতা এল রাশিয়ায়। মার্কস ও লেনিনের পথ অনুসরণ করে মুক্তি এল চীনে, বিপ্লবের রক্তাক্ত পথে। আপোষহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

'হয় মৃত্যু, নয় স্বাধীনতা !'

নকশালবাড়ির সংগ্রামতো স্বাধীনতার-ই সংগ্রাম! মুক্তি যুদ্ধ।

কিন্তু, কেন এই সংগ্রাম? আমরা কি পরাধীন? তাহলে?

চিন্তা করেছে শংকর। দিনের পর দিন। মানুষের দুঃখ, দুর্দশা তাকে ব্যথিত, চঞ্চল করেছে। পথ খুঁজেছে সে, মুক্তির পথ। তার নিজের, সকলের। ভারতবর্ষের কোটি কোটি নির্যাতীত, নিপীড়িত, অত্যাচারীত মানুষের মুক্তির কথা ভেবেছে। অন্যায় শোষণ আর উৎপীড়নের অবসান চেয়েছে। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও,' এর স্বপ্ন দেখেছে। একটি নির্মল, উজ্জ্বল স্বপ্ন!

১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সাল। মুক্ত হল ভারতবর্ষ। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বুটের নিস্পেষণ থেকে বেরিয়ে এল ভারতবর্ষের মানুষ। স্বাধীন মানুষ। আশা, স্বপ্ন, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনায় সার্থক মানুষ। কারণ, মানুষ জেনেছে, মানুষকে বোঝান হয়েছিল, যত নষ্টের মূলে ইংরেজ। ইংরেজকে যদি দেশ থেকে তাড়ানো যায়, তাহলে ভারতবর্ষে সুখের দিন ফিরে আসবে। দুঃখ দুর্দশার অবসান ঘটবে। মানুষ দুবেলা পেট ভরে খেতে পাবে, ভবিষ্যতের বংশধরেরা অশিক্ষার অন্ধকারে পড়ে থাকবে না আর। শুধু ইংরেজকে তাড়াতে পারলেই হল। ইংরেজ চলে গেলেই বাঁচার অধিকার ফিরে পাবে মানুষ।

কংগ্রেস বুঝিয়েছে মানুষকে। কংগ্রেস স্বপ্ন দেখিয়েছে মানুষকে। কংগ্রেস ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঘর থেকে টেনে বার করে এনেছে মানুষকে।

মানুষ শুনেছে কংগ্রেসের কথা। সত্য বলে বিশ্বাস করেছে। ইংরেজকে তাড়িয়ে দেশকে, জাতিকে, দুঃখ দুর্দশার অভিশাপ মুক্ত করতে চেয়েছে। জেলে গেছে, ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে, প্রাণ দিয়েছে গুলিতে বুক

পেতে দিয়ে। শুধু দেশ নয়, জাতির মুক্তিও কাম্য ছিল মানুষের। অমর বীর শহীদদের।

কিন্তু যাঁরা শহীদ হলেন তাঁরা অমর হতে পারলেন না। মানুষ ভুলে গেল তাঁদের কথা, ভুলে যেতে বাধ্য হল মানুষ। অকৃতজ্ঞ মানুষ! শুধু বই-এর পাতার মধ্যে বেঁচে রইলেন তাঁরা, সেই সব মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের দল। যাঁরা মানবমুক্তির জন্য হাসতে হাসতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে ছিলেন। যাঁরা ফাঁসীর দড়ি গলায় পরে বলেছিলেন, বন্দে মাতরম্।

আবার অনেক শহীদ হারিয়ে গেছেন বিস্মৃতির অন্ধকারে। মানুষ তাঁদের কথা জানে না। তাঁদের নামও শোনেনি কোনদিন। অনামী, অখ্যাত সেই সব বীরের দল মানবমুক্তির জন্যেই জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।

অকৃতজ্ঞ মানুষের দল মুক্তিকামী সেই সব মৃত্যুঞ্জয়ী বীরেদের কথা হেলায় ভুলে গেল। যাঁরা বিদেশী শাসকদের নাগপাশ থেকে দেশকে, জাতিকে মুক্ত করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জীবন দিয়ে গেলেন, তাঁদের কথা মনে রাখার দায়িত্ব অনুভব করল না মানুষ।

কিন্তু কেন? কেন মানুষ অকৃতজ্ঞ হল? কেন ভুলে গেল অমর শহীদ সেইসব মৃত্যুঞ্জয়ী বীরেদের কথা? কেন? কেন? কেন?

মানুষ কি চেয়েছিল? দেশের মুক্তি? স্বাধীনতা? আমরা বুক ফুলিয়ে বলবো, আমরা স্বাধীন, মুক্ত পরাধীনতার শৃঙ্খল আমরা ছিঁড়ে ফেলেছি। বিদেশী শাসকদের সাধ্য হয়নি আমাদের শৃঙ্খলিত করে রাখার।

আমরা কখনো আধপেটা খাবো, কখনো খাওয়া জুটবে না আমাদের আশ্রয় থাকবে না। রোগে, বিনা চিকিৎসায় মরবো। সন্তানর পাবে না শিক্ষা। ঘরের ইজ্জত লুটাবে পথের ধূলায়। তবু বলবো আমরা পরাধীন নেই, স্বাধীন। স্বাধীনতা আমাদের গর্বের, অহঙ্কারের আমরা স্বাধীন।

মুক্ত ভারতবর্ষ। মুক্ত মানুষ।

বিদেশী শাসকদের পরাধীনতার শৃঙ্খল চূর্ণ বিচূর্ণ করে রক্তের বিনিময়ে এ স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি। আমরা শপথ নিয়েছি স্বপ্নময় ভারতবর্ষ গড়ে তোলার।

আমরা নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষের দল, অবিচার অত্যাচারে জর্জরিত মানুষের দল, বেঁচে থাকবার অধিকার হারা মানুষের দল! আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলব, আমরা স্বাধীন।

কংগ্রেস আমাদের এ স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। কংগ্রেসের পতাকাতলে ভারত-মুক্তির আন্দোলন সফলতালাভ করেছে। সার্থক হয়েছে সংগ্রাম। মুক্ত হয়েছে ভারতের জনগণ। ভারত-মুক্তির দাবীদারের অধিকারী একমাত্র কংগ্রেস!

আর কিছু দেয় নি? শুধু স্বাধীনতা! কংগ্রেস আর কিছু করেনি?

করেছে বৈকী, নিশ্চয়ই করেছে। যে কাজ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের অসাধ্য ছিল, সেই কাজ কংগ্রেস হাসতে হাসতে বিনা আয়াসে সমাধা করেছে। খদ্দরধারী সুচী ও শুভ্রতার প্রতীক কংগ্রেসীরা মানুষের জীবনকে পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। পেটের জন্যে নারীর পবিত্রতা হরণ করে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য করিয়েছে।

আমরা উন্নত হচ্ছি, আমরা সভ্যতার শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করতে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছি, যন্ত্রশিল্পে স্বয়ং নির্ভর হচ্ছে ভারতবর্ষ, আর পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে দারস্থ হচ্ছি বিদেশী রাষ্ট্রের দ্বারে।

কংগ্রেসের দৌলতে মানুষ কি পেয়েছে আর কি পায়নি তার হিসাব দেওয়া শক্ত। অভাব অনটন, অশিক্ষা অনাহার, বেকারত্ব কি পায়নি মানুষ? যা মানুষের অকাম্য ছিল, তাও নিতে বাধ্য হয়েছে।

দেশটা কি তাহলে রসাতলে গেছে? মানুষ কি কিছুই পায়নি?

নিশ্চয়ই পেয়েছে। গরীব হয়েছে আরো গরীব, ধনী আরো ধনী। সহরে একের পর এক সৌধ গড়ে উঠেছে, গ্রামের পর্ণ কুটীরে নেমেছে ভাঙন।

অথচ কংগ্রেস একদিন মানুষকে শুনিয়েছিল নতুন কথা। মানুষের অধিকার অর্জনের সংগ্রামের শপথ নিয়েছিল তারা। বলেছিল, দেশ থেকে অশিক্ষা আর অনাহার দূর করা হবে, ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষ হবে একজাতি একপ্রাণ! ধনী দরিদ্রের বিভেদ নয়, জাতি ধর্মের ভেদও থাকবে না।

যে হরিজনদের জন্যে মহাত্মা গান্ধীর দরদের শেষ ছিল না, যাদের অধিকার রক্ষার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, সেই হরিজনরা আজও সমাজ পরিত্যক্ত অবহেলিত, অত্যাচারে তেমনি পিষ্ট। তাদের ভুলের ক্ষমা নেই। সমান ঘৃণা, অবজ্ঞা ও অবহেলা তারা সহে যাচ্ছে। তাদের পিটিয়েও যদি মারা হয় গান্ধী শিষ্যের দল নীরব থাকে।

নীরব থাকে না শুধু ধনীর স্বার্থহানীর ব্যাঘাত ঘটলে। শান্তি রক্ষকের দলকে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। নিরস্ত্র মানুষের বুকের রক্তে ভিজে যায় মাটি। মানুষের অপরাধ, তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়েছিল। প্রতিকার চেয়েছিল তাদের দাবীর মাধ্যমে।

কিসের প্রতিবাদ? কোন অধিকারে? ধনীর বিরুদ্ধে দ্ররিদ্রের প্রতিবাদের অকিধার কোথায়? স্বাধীন দেশ। ধনী দারিদ্র সব সমান। এখানে প্রতিবাদ, প্রতিকার বে-আইনী।

স্বাধীন ভারতবর্ষের মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারবে না। ধনী যদি তাদের বুকের রক্তের বিনিময়ে আরো ধনী হয়, যে কথা মুখ ফুটে বলতে পারবে না! মুনাফাখোরের দল যদি খাদ্যে ভেজাল দিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়—তাই তাদের খেতে হবে। নিজের উপায়ে যদি সংসারের অভাব না মেটে, তাহলে স্ত্রী কন্যাকে দেহ ব্যবসায়ে নাবাতে হবে। কৃষকের জমির ধান যদি জোতদার, জমিদার নিজের খামারে তোলে কেউ কিছু বলতে পারবে না। কারণ ধান কেটে তুলে দিয়ে চাষীর পরিশ্রমটুকু জোতদার জমিদার দয়া করে বাঁচিয়ে দেয়! শ্রমিক যদি তার পরিশ্রমের নায্য মূল্য না পায় তবুও তাকে চুপ করে

থাকতে হবে। অফিসের কেরাণী যদি গিয়ে শোনে, তার মাড়োয়াড়ী প্রভু রাতারাতি শান্তি রক্ষকদের সহায়তায় অফিস তুলে নিয়ে গেছে, তাহলে তাকে নীরবে বাড়ী ফিরে আসতে হবে। সংসারের অনেকগুলি প্রাণীকে উপোসী রেখে যে ছাত্র কলেজের শিক্ষা শেষ করল, সে যদি সারা জীবনে চাকুরী না পায় তবুও অভিযোগ করা চলবে না। শিক্ষা-দানের বিনিময়ে শিক্ষকের যদি পেট না ভরে তিনি সরকারের বিরুদ্ধা-চারণ করবেন না। কারণ বিপক্ষ রাজনীতি বড় ভয়ঙ্কর! সর্বপরি যারা বেকার হচ্ছেন তাঁরা কোনরকম আন্দোলনের ধারে কাছে যাবেন না! ভিক্ষাপাত্র নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়াই হবে তাঁদের পক্ষে শ্রেয়।

কিন্তু ভিক্ষা দেবে কে?

যাঁরা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বাস করেন, নামী হোটেলে দামী খানা খান, দামী মোটরে চড়েন, ক্লাবে পার্টিতে গিয়ে দামী মদ খেয়ে সুন্দরী বান্ধবীর বক্ষলগ্ন হয়ে জাজসঙ্গীত সহযোগে বিদেশী নাচ নাচেন, তাঁরা না—যারা রাতের অন্ধকারে দিনের হিসাব কষে, মানুষের রক্তশোষনের চক্রান্ত করে—তারা?

কারা ভিক্ষা দেবে? কাদের দয়ার ওপর নির্ভর করে মানুষ বেঁচে থাকবে? তারা কারা?

স্বাধীনতা দিবসের উৎসব হয়। প্রজাতন্ত্র দিবসের আড়ম্বর পূর্ণ প্রদর্শনী। লক্ষ কোটি বুভুক্ষু মানুষের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। একটি জিজ্ঞাসা অন্তরের অন্তঃস্থলে গুমরে ওঠে, সত্যই কি আমরা স্বাধীন?

না আমরা স্বাধীন নই। কে বললে আমরা স্বাধীন? যারা বলে আমরা স্বাধীন, হয় তারা মিথ্যা বলে, নিজেকে প্রবোধ দেয় অথবা ব্যঙ্গোক্তি করে।

আমরা স্বাধীন নই, ক্রীতদাস। আমরা স্বাধীন ক্রীতদাস। দেশটা স্বাধীন হয়েছে কিন্তু মুক্ত হইনি আমরা। ধনীক শ্রেনী আর খদ্দরধারী

দালালের দল স্বাধীনতার মদ খাইয়ে আমাদের ক্রীতদাসে পরিণত করেছে। আমাদের পরিয়েছে সোনার শৃঙ্কল। বঞ্চনার শৃঙ্খল। বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেসী শয়তানের দল শুধু নিজেদের পুষ্ট করেছে। দেশ, জাতি তাদের কাছে কিছু নয়, কেউ নয়।

তা যদি হবে তাহলে কি করে ওরা অভাবক্লিষ্ট অনাহারী মানুষদের কাছে দামী সজ্জায় সজ্জিত হয়ে এসে বলে, এখনও আমাদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে! দেশ যতদিন না সর্ব বিষয়ে স্বয়ং নির্ভর হচ্ছে ততদিন আমাদের অভাব আর দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করে যেতে হবে! আমার বিশ্বাস আমার দেশের মানুষ সব কিছু হাসি মুখে বরণ করবেন। আমাদের ব্রত উৎযাপনে সহায় হবেন।

তারপর তিনি নামী হোটেলে গিয়ে ওঠেন। খাবার টেবিল সাজানো হয়। খানা পিনা চলে। দুখানা শুকনো রুটি নয়, মুরগী মসল্লম, কাবাব, কারী, বিরীয়ানী। হরেক রকম মশলাদার রান্না। কোনটা চাখেন তিনি, কোনটায় হাতও দেন না।

খদ্দরধারী দোহারের দল একশোবার হাত কচলে বলেন, ম্যাডাম, আজ যা বক্তিমেটা আপনি ঝেড়েছেন না, শুনে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছিল।

দেবী হাসি মুখে দোহারের দিকে তাকান। জিজ্ঞাসা করেন, ভাল লেগেছে তোমার?

ভাল কি ঠাকুরুণ! মাইরী বলছি, আমার বেশ একটু গর্ব ছিল আমি একজন ভাল বক্তা। অতন্তঃ আপনার থেকে। কিন্তু আপনার গুলের কাছে আমি শিশু। ইচ্ছে হয় আপনার নাতি হয়ে কোলের কাছে শুয়ে শুয়ে বাওয়া-বাওয়া করি। মাইরি বলছি আমি········

থামিয়ে দিয়ে দেবী বলেন, ধরতে পারেনি তাহলে?

হা-হা করে হেসে ওঠে দোহার। ভুঁড়ি নাচে, নাচে হাতের অমৃত পাত্র, নাচে ক'বছরে লালিত মেদ। হাসে আর হাসে। অন্যান্য

দোহাররাও হাসিতে যোগ দেয়। সমস্ত ভোজ সভায় হাসির হর্‌রা ওঠে। হাসি হাসি আর হাসি। দুঃখ নয়, আনন্দ। হাসি জীবনী শক্তি।

দেবী অসন্তুষ্টা হন। হাতের অমৃতপাত্র অভিমানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এত হাসির কি ঘটলো? হোয়াট মেকস য়্যু লাফ?

সভাস্থল নিশ্চুপ। দেবী রুষ্টা হয়েছেন। রোষ বহ্নি ছুটতে সুরু হলে রক্ষা নেই।

এতো হাসি কেন? চিৎকার করে ওঠেন তিনি।

হাসি পাচ্ছে বলে, ম্যাডাম। নিরীহ, ভাল মানুষী উত্তর দোহারের।

দেশের লোক দুবেলা খেতে পাচ্ছে না, পড়তে পারছে না আর আপনারা শোর গরু খাচ্ছেন, আবার হাসছেন? দেশের এই দুর্দিনে হাসতে আপনাদের লজ্জা করে না?

সত্যিই করে ম্যাডাম। দেশের মানুষের দুর্গতির চিত্র যখন একের পর এক আপনি তুলে ধরছিলেন, তখন সে দুঃখ সহ্য করতে না পেরে আমি ডায়াসের পাশে গিয়ে কচোঁক সুধা পান করে হার্টটাকে ষ্ট্রং করে এসে তবে আপনার লেকচাঁরটা সবটুকু শুনেছি। ম্যাডাম, আমি যদি দুঃখের কথা শুনে সহ্য করতে না পারি তাহলে যারা প্রকৃত দুঃখের সঙ্গে লড়াই করছে, তারা সহ্য করবে কেমন করে? আমি নিজে ধরতে পারেনি আপনার ছিচকাঁদুনী, ওরা ধরবে কেমন করে? এত দুঃখ, তবু আপনার 'ওই ধরতে পারেনি তো' তেই কাত হলুম। সত্যি ম্যাডাম আপনি বড় সোজা আর সরল। ধরতে পারলেই বা। ধরতে পারল তো বয়ে গেল।

না-না-তবু...........

একটু পান করুন সব ঠিক হয়ে যাবে।

শাসক শ্রেনীর স্বার্থসিদ্ধির পথকে সুগম করে তোলে নেতার দল। শ্রমিককে ধর্মঘটের পথে নাবায় মালিককে সাহায্য করার জন্যে। লাভবান হয় মালিক পক্ষ।

ধর্মঘটে শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি হয় পাঁচটাকা। মালিক দিতে রাজী ছিল চারটাকা। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পরে বিবেচনা করা হবে। দাবী ছিল পনেরো টাকা। ধর্মঘটকালীন সময়ের দীর্ঘ ছ মাসে একটি পয়সাও পায়না। তবু শ্রমিক জয়ী হয়েছে। দীর্ঘদিনের অভুক্ত শ্রমিকের মুখে হাসি ফুটেছে।

পূজার আগে কাপড়ের মিলে ধর্মঘট হল। দীর্ঘদিন বাদানুবাদের পর নেতারা স্থির সিদ্ধান্তে এলেন ধর্মঘট ভিন্ন দাবী আদায় করা সম্ভব নয়।

সভা হল। শ্রমিকের দল লাল পতাকা উড়িয়ে শ্লোগান দিল, ইন্‌কিলাব—জিন্দাবাদ।

নেতার দল মাইক আঁকড়ে ধরে থুতু ছিটিয়ে ভাষণ দিলেন। মার্কস এঞ্জেলসের শ্রাদ্ধ করে বুর্জোয়া শয়তানী খতম করার আহ্বান জানালেন সভাতে। শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বললেন, ভাইসব, আমরা মরবো তবু দুঃশাসনের কাছে মাথা নীচু করবো না। এ আমাদের বাঁচার লড়াই।

তারপর শ্রমিক দরদী সাচ্চা কমিউনিষ্ট নেতা দামী মোটরে অন্য একটি সভার পথে রওনা দিলেন। মোটরটি তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি। সম্পত্তির মধ্যে যা কিছু, সবই তাঁর পিতার। এসবের কিছুরই অধিকারী তিনি নন। বাড়িতে যে আহার্য্য সামগ্রী তিনি গ্রহণ করেন তাও তাঁর পিতার সম্পত্তির আয় থেকে প্রস্তুত। নিজের বলতে তাঁর কিছুই নেই!

তিনি কমিউনিষ্ট। তিনি সর্বহারাদের একজন। তিনি চান বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থাকে খতম করতে। স্বপ্ন দেখেন সর্বহারাদের দুনিয়ার।

কাপড় মিলের ধর্মঘট মাস চারেক পরে মিটে গেল। শ্রমিক দরদী নেতাই মালিক পক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে মিটিয়ে দিলেন বিরোধ। মালিক বারো টাকা করে বেতন বাড়িয়ে দিতে রাজী হল। দিতে চেয়েছিল দশ টাকা। দাবী ছিল পঁয়ত্রিশ টাকা। জয়ী হল শ্রমিক আন্দোলন।

কিন্তু শ্রমিকদের কারো কারো কণ্ঠে অভিযোগ শোনা গেল। ধর্মঘটের ফলে লাভবান হল মালিক। পূজার মরশুমে তিন বছর আগের জমা মাল বিক্রী করতে পারল মালিক। যা তাকে একদিন কম দামে বাজারে ছাড়তে হত। এ ধর্মঘট শ্রমিকের নয়, মালিকের স্বার্থে। শয়তান মালিক পক্ষ গোডাউন ক্লিয়ার করে নিল।

আরো অভিযোগ শোনা গেল, নেতারা মালিক পক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। মালিককে সাহায্য করেছে। বিনিময়ে····

শংকর নিজে শুনেছে। শ্রমিকদের আলোচনা তার কানে এসেছে। কারণ ধর্মঘটের সময় শ্রমিকদের মধ্যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাকে। শ্রমিকদের মনোবল যাতে অটুট থাকে তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে সে। বস্তিতে বস্তিতে ঘুরেছে। অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। দেখেছে দুর্দশা আর হাহাকারের ছবি। দেখেছে মৃত্যু ; যন্ত্রণা। কাতর আর্তনাদ। অনাহারী, ক্ষুধার্ত মানুষের কান্না। মানুষ পেটের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে।

মালিক পক্ষের দালালদের বিরুদ্ধে রুখে উঠেছে। বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে শ্রমিক ভাঙ্গানো বন্ধ করেছে। যুদ্ধ করেছে মালিকের পাঠানো গুণ্ডাদের সঙ্গে।

এতো করেও পরিণতিটা তার দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে হয়েছিল। পার্টির একজন পরিচিত নেতাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, এ জয় কাদের বলতে পারেন ?

তিনি তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলেন। হেসে বলেছিলেন,

কেন আমাদের, আমরা জয়ী হয়েছি। মালিক পক্ষ আমাদের দাবী মেনে নিয়েছে।

তাই কী?

কেন নয়?

শ্রমিকদের দাবীতো মেটেনি। যে জন্যে এত দুঃখ কষ্ট, অনাহার সহ্য করলো তার কিছুই তো ওরা পেল না।

কেন, বারো টাকা করে মাইনে তো বাড়ল?

মালিক পক্ষ তো দশটাকা দিতে রাজি ছিল।

কিন্তু যে দুটাকা আমরা বাড়াতে পেরেছি তাই কম কি ওদের কাছে?

কমের কথা আমি বলছি না। শান্ত কণ্ঠে শংকর বলেছিল, দুটো টাকা যে ওদের কাছে অনেক, আমি জানি সে কথা। কারণ কটা মাস যে আমি ওদের দেখেছি, জেনেছি।

তাহলে?

কিন্তু যে চার মাস ওরা অনাহার, দুঃখ, মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করল, এই চার মাসে যতটা জীবনীশক্তি ওদের নিঃশেষ হল তার বিনিময়ে কি পেল ওরা? আপোষে নিস্পত্তি হল সংগ্রাম। মালিক পক্ষ দয়া করে দশের উপর দুই বাড়িয়ে দিল। এতো জয় নয়, পরাজয়। এ যুদ্ধের কোন প্রয়োজন ছিল বলে আমার অন্ততঃ মনে হয় না।

তাহলে তুমি বলতে চাইছো আমরা ভুল করেছি?

ভুল নয়, আমরা শ্রমিকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। আমরা আগে থেকে মালিক পক্ষকে সতর্ক করে দিয়েছি। আমরা হাত মিলিয়েছি তাদের সঙ্গে।

হাত মিলিয়েছি! কি বলছো তুমি শংকর? আমার মনে হয় তুমি বোধ হয় স্বাভাবিক নও। তুমি কি বলছো একটু চিন্তা করে বল।

আমরা মালিকের কাছে ঘুষ খেয়েছি।

ঘুষ খেয়েছি ?

মালিক বেশ কয়েক হাজার টাকা আমাদের দিয়েছে।

কে বললে তোমাকে এ কথা ?

আমি জানি। শ্রমিকদের অনেকেই এ কথা বলছে।

কারা কারা একথা বলছে তাদের তুমি চেন নিশ্চয়ই। তাদের নামগুলো তুমি আমাকে দিতে পার ?

পারি কিন্তু দেব না। গরীব মানুষগুলো সত্যি কথা বলায় তাদের ওপর হামলা হোক, এ আমি চাই না।

তা বলে তাদের যা ইচ্ছা তারা তাই বলবে। আমাদের পার্টির নামে অপপ্রচার চালাবে, আমরা শুনবো, দেখবো অথচ প্রতিকার কোরব না, এও তো হতে পারে না।

অতএব তাদের মারধোর করতে হবে। ঝলসে উঠেছিল শংকরের কণ্ঠ। কিন্তু তাদের কাছে প্রমাণ করতে পারবো না তারা যা বলছে তা সত্যি নয়।

কোম্পানী আমাদের পার্টি ফাণ্ডে চাঁদা দিয়েছে।

কথাটা তাহলে মিথ্যে নয়, সত্যই আমরা তাহলে ঘুষ খেয়েছি। কয়েক হাজার টাকা ঘুষ খেয়ে শ্রমিকদের আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিয়েছি।

একে তুমি ঘুষ বলছো কেন শংকর ?

বলছি এই কারণে, যে বুর্জোয়া শ্রেণীকে আমরা ঘৃণা করি, বুর্জোয়া শাসনেব অবসান চাই, সেই বুর্জোয়াদের সাহায্যে পূর্ণ করে তুলি পার্টি তহবিল। কিন্তু একবার চিন্তা করে দেখেছেন কি, কাদের রক্ত জল করা অর্থ তারা আমাদের দিল ? শুধুমাত্র অর্থের জন্যে কাদের সঙ্গে বেইমানী করলাম আমরা ?

বেইমানী আমরা করিনি শংকর। পার্টি চালাতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। আমরা অর্থ চাই। শ্রমিকদের এতো অর্থ নেই যা দিয়ে

তারা প্রয়োজন মেটাতে পারে। সেই জন্যেই বুর্জোয়াদের অর্থও আমাদের নিতে হচ্ছে। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জেনো দিন যখন আসবে অর্থ সাহায্য করেছে বলে বুর্জোয়ারা নিষ্কৃতি পাবে না। আমরা তাদের খতম করবই।

কিন্তু তাকি সম্ভব হবে?

কেন হবে না?

হবে না এই জন্যে, আমাদের মনগুলো পাষাণে গড়া নয়—রক্ত মাংসের। বুর্জোয়াদের সাহায্য নিয়ে আমরা তাদের কাজকে সমর্থন জানাচ্ছি, তাদের গোলাম হয়েছি। আজ আমাদের যারা বিশ্বাস করেছিল তাদের মনে বাসা বাঁধছে সন্দেহ। আমরা মুখে সর্বহারার কথা বলছি কিন্তু সর্বহারাদের একজন হতে পারছি না। আমরা তাদের মত দুঃখবরণ করছি না, ত্যাগ স্বীকারের এতটুকু আগ্রহ নেই। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে পরিহার করায় ভয়—কিন্তু আমরা কমিউনিষ্ট, সর্বহারাদের নেতা। অন্যের অন্নে লালিত হচ্ছি, সুখ স্বাচ্ছন্দ গ্রহণ করছি; আমরা বুর্জোয়া নই কিন্তু বুর্জোয়াদের জীবন যাত্রার সঙ্গে আমাদের তফাৎটা কোথায়?

তুমি কার কথা বলছো?

বলছি অনেকের কথাই। আমার নিজের কথাও। কারণ আমাদের সংসার স্বাচ্ছন্দের সংসার। অভাবের এতটুকু চিহ্ন মাত্র নেই। দাদাদের বন্ধুরা অনেকেই ধনী। বিরাট পুঁজিপতির সন্তান কজন। তাদের আদর্শে আমার দাদারা নিজেদের পরিচালিত করে। বুর্জোয়া ভাবধারা গ্রহণ করেছে তারা। আমার দাদারা তা নয় কিন্তু তাদের অনুগামী হতে চায়, সাধ্যমত চেষ্টা করে। তাহলে দাদারা কী? শুধু পুঁজিপতিরাই বুর্জোয়া? বুর্জোয়া জীবনযাত্রা যারা অনুকরণ করে তারা নয় কেন?

নয় এই জন্যে তোমার দাদাদের বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত করা চলে না বলে।

কিন্তু তাদের দালাল বলা চলে তো ?

তোমার থিওরী অনুযায়ী ?

যদি বলি, হ্যাঁ।

তিনি হেসে বলেছিলেন, আমার আপত্তি নেই।

তাহলে যাঁরা বিলাস বাহুল্য বর্জন না করেও সর্বহারাদের একনায়কত্বের স্বপ্ন দেখেন তাঁরা তাহলে কী ?

শংকরের প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে পারেন নি।

একজনের কাছে প্রশ্ন করে উত্তর না পেলেও অন্য জনের কাছে পেল শংকর। কথায় নয়, কাজে। তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করেছিল, পেয়েছি—পেয়েছি, আমি পথ পেয়েছি!

জীবনে চলার পথ। মুক্তির পথ। বিপ্লবের পথ, ত্যাগে। দুঃখ দারিদ্র তুচ্ছ, মৃত্যু নিমিত্ত মাত্র। প্রকৃত বিপ্লবী, সর্বহারাদের একজন হতে হলে নিজেকেও সর্বহারা শ্রেণীর একজন করে গড়ে তুলতে হবে। তা নয়, বিলাস বাহুল্যের মাঝে থেকে শুধুমাত্র মুখের কথায় বিপ্লবের তুবড়ি ছোটালে চলবে না। নিজেকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, মনে প্রাণে একজন হতে হবে সকলের। সর্বহারার দুঃখ বেদনা অনুভব করতে হবে জীবনের মাধ্যমে। কথায় নয়।

চটি পরা একদিন ছেড়েছে শংকর। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া জামাগুলি দিয়ে দিয়েছে তাদের যাদের কিছু নেই। যাদের দিয়েছে তারা প্রথমে নিতে চায়নি। জোর করে দিয়েছে সে। বলেছে, এ দয়ার দান নয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত আছে বলেই দিচ্ছি। তোমরা নাও, আমাকে ভারমুক্ত কর।

তিনি হেসে জিজ্ঞাসা করেছেন, তুমি কি সন্ন্যাসী হতে চাও শংকর?

আমি সাধু হতে চাই।

এতদিন কি অসাধু ছিলে?

তা নয়, এতদিন আমি নিজের জন্যে ভাবতাম, চিন্তা করতাম। নিজের সুখ সুবিধা স্বাচ্ছন্দের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতাম। অন্যের প্রয়োজনের কথাটুকু চিন্তা না করে সুযোগ পেলেই আমি আমার নিজের প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে নিতাম ভাল করে।

এখন যে তুমি নিজের প্রয়োজনটুকু মেটাবে না এমন কথা তো বলিনি আমি।

আপনার কিছু বলার অপেক্ষা করে আমি তো কিছু করি নি।

তাহলে কি বাহবা কুড়োবার জন্যে বা অল্পদিনে জনপ্রিয় হয়ে ওঠো, এই আশায় এমন কাজ করছো ?

তাঁর কথা শুনে আঘাত পেয়েছিল শংকর। সে ভাবতে পারেনি এতদিন দেখবার পরও তিনি তার সম্বন্ধে এমন কথা বলবেন। কথা বলেনি সে। নীরবে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল।

তিনিও একটু নীরব ছিলেন। ডেকেছিলেন, শংকর!

সে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

তুমি কি আমার কথায় রাগ করলে ? মৃদু কণ্ঠে জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

রাগ করবো কেন ?

রাগ করাটাই তো স্বাভাবিক। তুমি যা নও তোমাকে যদি তাই বলা হয়, তাহলে রাগ করার অধিকার নিশ্চয়ই তোমার আছে।

কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনি, সত্যিই আমি রাগ করিনি। কারণ আমি জানি, বিশ্বাস করি, আপনি যা বলেছেন তা নিশ্চয়ই আমার ভালর জন্যেই বলেছেন।

কথাটা শুনে নীরবে হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। আচ্ছা, তুমি হঠাৎ চটি পরা ছেড়ে দিলে কেন ?

শংকর হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল, আপনি চটি পরা ছেড়েছিলেন কেন ?

আমি! কথাটা শুনে একটু চিন্তা করেছিলেন তিনি। তারপর বলেছিলেন, কথাটা শুনলে হয়তো তুমি বিশ্বাস করতে চাইবে না, কিন্তু সত্য। সহরে জন্মেছি আমি, সহর জীবনে অভ্যস্থ। গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বলতে গেলে কবার সখের গ্রাম যাত্রা। বন্ধুর বাড়ি যাওয়া

বা পিকনিক করা। তারপর একদিন গ্রামে এসে পড়লুম। গ্রামের জীবন যাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে প্রথম প্রথম অসুবিধে হয়েছিল বেশ কিছুটা। তারপর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হয়। গ্রামের অসমতল, আঁকা বাঁকা পথে চটি পরে যে সময়ে আমি যতটা পথ অতিক্রম করি, একজন গ্রামের মানুষ আমার চেয়ে অনেক অল্প সময়ে চলে যায়। গন্তব্য স্থানে তাড়াতাড়ি পৌঁছাবার জন্যে কখনো মাঠের মধ্য দিয়ে, কখনো বা জলা পার হয়ে যেতে হয়। দেখে দেখে আমিও একদিন খালি পায়ে পথে নাবলুম। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হল। তারপব দেখি, বাঃ বেশতো, খালি পায়ে হাঁটতে মজা তো কম নয়। তাছাড়া....

বাধা দিয়ে শংকর বলেছিল, আমি কিন্তু এদিকটা ভাবিনি।

হেসেছিলেন তিনি। পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, অন্যদিকটাও সত্য শংকর। কিন্তু যা করবে বিচার বিবেচনা করে তবে করবে। হঠাৎ ঝোঁকের বশে কিছু করতে যেওনা, তাহলে একদিন নিজের কাছে ঠকবার ভয় থাকবে। তুমি যে ত্যাগ স্বীকার করছো, কিসের জন্যে করছো? কার জন্যে করছো? সকলের একজন হতে হবে শংকর। আমিকটুকু ত্যাগ করতে হবে। আমি আলাদা নই, সকলের একজন। আর সকলের একজনের এই সংখ্যাতো বড় কম নয়, গোটা ভারতবর্ষের শতকরা পঁচানব্বই বা তার থেকে বেশির একজন। ভারতবর্ষের জনগণ সকলে সমান অধিকারী। ভারতবর্ষের নাগরিকদের সমান ভোটাধিকার। কিন্তু সংবিধান রচয়িতাবা পুঁজিপতি ধনিক শ্রেণীর অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করে গেছেন পুরো মাত্রায়। অর্থাৎ ভাবতবর্ষের শতকরা চার থেকে পাঁচ জন মানুষের স্বার্থরক্ষা হয়েছে। এই জন্যেই জমিদার জোতদারের দল চাষীকে বঞ্চিত করে, মালিক-শ্রেণী শ্রমিকদের ঠকিয়ে সম্পদ বাড়ায়, চোরাকারবারীর দল অসৎ পথে মুনাফা লোঠে। আইন আছে, আইন রক্ষকের দল আছে, আছে সবই। ঠুঁটো

জগন্নাথের মত নামে মাত্র আছে শুধু। কিন্তু কাজের কাজে কিছু নেই। নেই এইজন্যে, তাতে স্বার্থহানী ঘটবে ওই পাঁচজনের। অথচ তুমি নিজে কিছু করতে পার না। কিছু করতে গেলেই আইন, শান্তি রক্ষকের দল তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার শাস্তি পেতে হবে তোমাকে।

তাহলে কি এইভাবেই চলবে?

না, চলবে না, চলতে পারে না। চলতে দেওয়া উচিৎ নয়। কংগ্রেসকে তার কায়েমী স্বার্থের গদি থেকে হাটিয়ে দিয়ে যখন যুক্তফ্রন্ট শাসন ক্ষমতা দখল করল তখন আমাদের মনে হয়েছিল, কংগ্রেস রচিত ভূমি সংক্রান্ত যে আইন বলবৎ রয়েছে, তা অন্ততঃ পাঁচজনের দল মানবে, মানতে বাধ্য হবে। কিন্তু এখন দেখছি তা হবেনা, হতে পারেনা। কারণ যাঁরা এসেছেন, যেপথে এসেছেন সে পথে অন্যায়কে নিশ্চিহ্ন করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। একমাত্র কারণ আইন। ধনীক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে যে আইন সে আইনকে আইন সম্মত ভাবেই মানতে তাঁরা বাধ্য। কারণ মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণের সময় বুর্জোয়া আইনকে মেনে চলবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাঁরা।

তাহলে?

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, আইন মানুষের অধিকার রক্ষার জন্যে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্যই আইন। আইনের চোখে উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্রের কোন প্রভেদ নেই। আইনের বিভিন্ন ধারায় সে কথা বলা হয়েছে বারবার। কিন্তু আইন রক্ষকের দলই যেখানে আইন ভঙ্গকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে, সেখানে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্ভব কেমন করে? সম্ভব নয়। তার একমাত্র কারণ বুর্জোয়া আইন, রাষ্ট্র, বুর্জোয়াদেরই স্বার্থরক্ষা করে চলে। সেখানে তুমি আমি মরলাম কি বাঁচলাম তাতে তাদের কিছু এসে যায় না। তারা নিজেরা বাঁচতে চায়, স্বার্থরক্ষা করে চলে ষোল আনার ওপর আঠারো আনা। যুগ

যুগ ধরে যে কায়েমী স্বার্থ মানুষের বুকের ওপর পাষাণের মত চেপে বসে আছে, সেই পাষাণটাকে আমরা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিতে চাই। চাই সব কিছু অন্যায় অসহ্য আর পাপের মূল উৎপাটন করতে। আর একমাত্র তা সম্ভব বিপ্লবের পথে। বিপ্লব ছাড়া সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। সামন্তবাদ, পুঁজিবাদকে খতম করে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।

তাকি ইলেকসনের মাধ্যমে সম্ভব নয় ?

আপোষ নীতির মধ্যে বিপ্লব সফল হতে পারে না। আমরা যখন সকলে একসঙ্গে ছিলাম তখন বলতাম জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব। বিপ্লব ভিন্ন যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় তা সেদিন যেমন আমরা বিশ্বাস করতাম আজ যারা আছেন তাঁরাও বিশ্বাস করেন। সকলকে, সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে তাঁরা মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বিপ্লব সফল করতে চান। সেই কর্মসূচী অনুযায়ী তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু বিপ্লব সমাধা করতে কতদিন লাগবে, কতদিনে বিপ্লবের উপযোগী হয়ে উঠবে মানুষ, তা তাঁরা জানেন না। আমরা আলাদা হলাম মতের মিল না হওয়ায়। বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরী হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না, বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি করে নিতে হবে। কিন্তু একদিন সবিস্ময়ে দেখলাম বিপ্লবের পথ থেকে সরে যাচ্ছে আমাদের দলের কিছু প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ। প্রতিক্রিয়াশীল বলছি এইজন্যে, মন্ত্রী হলে লাভ অনেক, ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়। আখেরে গুছিয়ে নিতেও কষ্ট পেতে হয় না। বললেন, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। কিন্তু বিপ্লব কি ? মানুষ ! অসংখ্য নিপীড়িত, নির্যাতীত, বঞ্চিত মানুষ ! মানুষই তো বিপ্লব। মানুষের জন্যই বিপ্লব। অমানুষদের হাত থেকে অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার নামই বিপ্লব।

শংকর, আমরা মার্কসবাদী—লেনিনবাদী। সর্বহারার অধিকার রক্ষার লড়াই আমাদের। মার্কসের নীতিকে আমরা গ্রহণ করেছি।

লেনিনের পথ আমাদের পথ। মাও সে তুঙ চিন্তাধারার রূপ দিচ্ছি আমরা। কমিউনিষ্টদের মূল নীতিতে লেখা আছে, 'প্রত্যেকে যতক্ষণ না রুটি পাচ্ছে ততক্ষণে কেউ কেক পাবে না।' কিন্তু কি দেখছি? সাচ্চা কমিউনিষ্ট কিন্তু এতটুকু ত্যাগ স্বীকারে রাজি নন। এ যেন সেই, আমার বাড়ি আছে, গাড়ি আছে বা আমার কয়েক শো বিঘে জমি আছে; কিন্তু বাড়ি গাড়ি আমার বাবা আমার স্ত্রীকে দিয়ে যান অথবা আমাদের কয়েক শো বিঘে জমি আছে বলে যে অভিযোগ তা যদি আমাকে বঞ্চিত করে আমার বাবা আমার পুত্রকে দান পত্রের দলিল করে দেন তা কি আমার হল? সত্যইতো তাকি হয়? হতে পারে, না হয়েছে কোথাও?

আমরা আজ সকলের শত্রু—ওরা পরস্পরের শত্রু। দুদল একই পথে চলেছে কিন্তু মুখে বলছে অন্য কথা। চৌদ্দ পার্টির বিপ্লবী সরকার আজ আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে পুলিশের দলকে। পুলিশের দল আজ আমাদের খুঁজে ফিরছে সমস্ত তরাই অঞ্চলে। ঘরে ঘরে সন্ধান করে ফিরছে। কানুবাবুর মাথার মূল্যও হয়তো ঘোষিত হয়েছে। সেই সঙ্গে জঙ্গল এবং আরো অনেকের। যেন কানু বাবু আর কজনকে খতম করে দিতে পারলেই নকশালবাড়ির এই আন্দোলন শেষ হয়ে যাবে—তীর ধনুকের ক্ষ্যাপামী বন্ধ হবে। কিন্তু কেন এ আন্দোলন, কিসের আন্দোলন ওঁরা বুঝলেও স্বীকার করেন না। বিপ্লবী সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, মানুষের নিরাপত্তার। মন্ত্রীমশাই নকশালবাড়ির হাটতলায় ঠাণ্ডা গলায় বড় বড় কথা বলে গিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সরকারের পক্ষ থেকে। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতির কতটুকু রক্ষা করেছিলেন তিনি এবং তাঁর সরকার? কিছুই করেন নি তাঁরা। করা সম্ভবও নয় তাঁদের পক্ষে। কারণ বুর্জোয়া আইনের কঠিন নাগপাশের বাঁধনে যে তাদের হাত পা বাঁধা। সাধ করে তারা সে বাঁধন মেনে নিয়েছেন। স্বপ্ন দেখছেন আরো বেশি ক্ষমতা দখলের। রাজ্য নয়,

কেন্দ্রে দখল নেবেন তাঁরা। সরকার গড়বেন। তার আগে যদি জমিদার জোতদারদের স্বার্থ রক্ষায় মানুষের জাগরণকে দলিত করতে হয়, করবেন। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে হয়, দেবেন। সংশোধন করে নেবেন ভবিষ্যতে। যে ভবিষ্যৎ ভবিতব্যের গর্ভে।

অনেকক্ষণ কথা বলার পর চুপ করেছিলেন তিনি।

শংকরও নীরব ছিল অনেকক্ষণ। তারপর বলেছিল, আমি কি করবো?

কি করবে? প্রশ্নটা তাকেই করেছিলেন। বলেছিলেন, তুমি তো কাজ করছো শংকর। এমনি ভাবেই কাজ করতে হবে তোমাকে।

আবার সেই কিন্তু। মৃদু ধমক দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, আমি বুঝি এ কাজে তুমি সন্তুষ্ট নও। তুমি চাও লড়াই করতে। সেদিন যখন আসবে নিশ্চয়ই তুমি যাবে। কিন্তু এখন নয়। কারণ কি জানো, যুদ্ধ শুধুমাত্র রণক্ষেত্রের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনা। একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া ছিল গর্বের। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়ার মধ্যে মহত্ব ছিল। কিন্তু আজ যে ঘরে বাইরে যুদ্ধ। প্রতিটি পদক্ষেপে আজ আমাদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে। 'নিরক্ষর মানুষ অন্ধ, তার প্রতিপদে চোরাগর্ত আর দুঃখ-দুর্বিপাক।' আমরা বুদ্ধিজিবীর দল এই অন্ধত্ব দূর করার মহান দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে বিপ্লবের পথে এগিয়ে দেব মানুষকে। যুদ্ধ করবে কৃষক-শ্রমিক। আমরা তাদের সহযোগী হব কিন্তু কখনো এগিয়ে গিয়ে তাদের স্থান দখল করে নেবার চেষ্টা করবোনা।

নকশালবাড়ির বীর কৃষক-শ্রমিক যুদ্ধ করেছে। শ্রেণী শত্রুর রক্তে হাত রাঙিয়ে বিপ্লবের পথে এগিয়ে গেছে তারা। এসেছে মৃত্যু, আঘাত। তবু তারা টলেনি। মাথা নত করেনি। পালায়নি ভীরু কাপুরুষের মত।

এ তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এ লড়াই তাদের বাঁচার লড়াই।

লড়াই করছে তারা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে। মৃত্যু ভয় তুচ্ছ করে এগিয়ে গেছে। তারা বুঝিয়ে দিয়েছে বীরের মৃত্যু নেই। বীর কখনো মরেনা। মরে কাপুরুষের দল।

শুধু পুরুষ নয়, এগিয়ে এসেছে মেয়েরাও। মিছিল বার করেছে তারা। প্রতিবাদ জানিয়েছে।

সশস্ত্র পুলিশের দল বাধা দিয়েছে। মিছিল কারিনীদের এগিয়ে যেতে দেবেনা তারা।

পুলিশের হাতে রাইফেল কিন্তু ওদের বুকে আগুন। নির্ভয়ে এগিয়ে গেছে মেয়ের দল, ধ্বনি দিয়েছে, নকশালবাড়ির জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব....

জিন্দাবাদ।

এ বিপ্লব চলবে।

চলবে-চলবে-চলবে।

এগিয়ে চলেছে মেয়েরা। নির্ভিক, দৃঢ় পদক্ষেপ। তাদের চলার পথে মৃত্যুভয় তুচ্ছ হয়ে গেছে। তারাও এগিয়ে যাবে, আগে, আরো আগে।

হঠাৎ পুলিশের হাতে গর্জে উঠল রাইফেল। শান্তিপূর্ণ মিছিল কারিনীদের ওপর একদিন পরাধীন ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ মেয়েদের গুলি করতে লজ্জা বোধ করেছিল, সেইজন্যে কয়েক শো কুষ্ঠীকে ছেড়ে দিয়েছিল তারা। ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল মিছিল। তারা বুঝেছিল ভারত নারীর মন কর্তব্যে অটল। মৃত্যুকে আজ তারা ভয় পায় না।

স্বাধীন ভারতবর্ষের শান্তি রক্ষকদের দল বিনা দ্বিধায় গুলি চালাল নারী মিছিলের উপর। হয়তো ওরা ভেবেছিল দু একজন মরলেই ওরা পালিয়ে যাবে।

কিন্তু কেউ পালাল না। গুলির আঘাতে যারা পড়ে গেল তাদের

দিকে শুধু একবার চেয়েই এগিয়ে গেল কয়েক শো মেয়ের মিছিলটি। মৃত্যু দেখেও ওরা বিচলিত হল না। ভ্রুক্ষেপ করল না। ওরা সম্পূর্ণ নির্বিকার ধ্বনি দিল, নকশালবাড়ির জন গণতান্ত্রিক বিপ্লব....

জিন্দাবাদ।

এ বিপ্লব....

চলবে-চলবে-চলবে।

বিচলিত হল ওরা। ওই পশুর দল। মৃত্যু বিচলিত করল ওদের। ওরা ভয় পেল। ভেবে পেল না এবার কি করবে।

গুলির শব্দে প্রথমে মানুষ পালিয়েছিল। একে একে ফিরে এল সকলে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সে দৃশ্য।

পুলিশ পরাস্ত হয়েছে। পশুশক্তি পরাজিত। ওরা ফিরে এল এবার। যারা মিছিলে যোগ দেয়নি তারাও এল এবার। সঙ্গে নিয়ে এল তীর ধনুক।

রাইফেল উঁচিয়ে মৃত দেহ করডন করতে চাইল পুলিশের দল। ওরা উঁচিয়ে ধরলো তীর ধনুক। এবার শুধু আঘাত সহ্য করা নয়, ওরাও আঘাত হানতে প্রস্তুত। থাকনা পুলিশের হাতে গুলিভরা রাইফেল।

সাহসী হল না পুলিশের দল। শ্রমিক কৃষক রমণীদের মৃতদেহগুলি ওরা তুলে নিয়ে গেল। চিতাশয্যায় শুইয়ে আগুন দিল।

নকশালবাড়ির বীর শ্রমিক-কৃষক পুরুষ রমণীর চিতার আগুনে রক্তবর্ণ ধারণ করল আকাশ। সেই আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে। আসমুদ্র হিমাচল রক্তের আলপনায় রাঙা হয়ে উঠল।

শপথ নিল মানুষ নতুন পথের।

সে পথ মুক্তি যুদ্ধের।

স্বপ্ন দেখছিল শংকর।

একটুখানি লাল আগুনের শিখা। আগুন নয়, যেন রক্ত শিখা। টকটকে গাঢ় তার রঙ। ছোট্ট, কাঁপা কাঁপা একটু অগ্নিশিখা। শংকর স্পষ্ট দেখল, সেই ছোট্ট অগ্নি শিখাটুকু মাটি থেকে একটু একটু করে ওপরে উঠতে লাগল। ওপরে—আরো ওপরে। মেঘের স্তর ভেদ করে আকাশের স্পর্শ পেতে চাইল যেন সেই অগ্নিশিখা। কিন্তু বাধা দিল মেঘের দল। হিংস্র গর্জনে গর্জে উঠল তারা। ঝড় তুললো, বজ্র হানলো। নিভিয়ে দিতে চাইলো অগ্নিশিখাটাকে। অক্টোপাশের মত গ্রাস করতে চাইলো। কালো মেঘের আস্তরণে মুছে গেল অগ্নি-শিখা, নিভে গেল, শেষ হয়ে গেল। আকাশের সীমানায় পৌছানো সম্ভব হল না তার পক্ষে।

অন্ধকার, বিষাদ। অগ্নিশিখার লক্ষ্যে পৌছানোর যাত্রা শেষ হল না। ব্যর্থতার হাহাকারে ভরে গেল শংকরের মনটা। নিজের দিকে ফিরে চাইলো সে। একাকী দাঁড়িয়ে আছে। শূন্য—ধূ-ধূ প্রান্তর। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বালি-বালি-আর বালি। বালুকাময় শূন্য মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে একটা নিঃসঙ্গ প্রাণ। একটা মানুষ।

আবার চাইলো সে আকাশের দিকে। দেখতে চাইলো সেই অগ্নি শিখাটুকু। যা দেখে প্রাণে উত্তাপ অনুভব করেছিল, স্বপ্ন দেখেছিল। অগ্নিশিখার লক্ষ্যে পৌছানোর স্বপ্নও যে তার মনের-প্রাণের-অন্তরের স্বপ্ন। সেও যে অমনি স্বপ্ন দেখছিল। আলোর স্বপ্ন—সত্যের স্বপ্ন!

স্বপ্ন মিথ্যা, আলো নিভে গেছে। রাহু যেমন তার করাল মুখোব্যাদন করে সবকিছু গ্রাস করার জন্যে ছুটে আসে, তেমনি সেই ছোট্ট অগ্নি শিখাটুকুকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে বজ্র বিদ্যুৎ অন্ধকার

ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অশুভ শক্তিরা একজোট হয়ে নিভিয়ে দিয়েছে আলো। গ্রাস করেছে প্রাণের অগ্নিশিখা।

বিশাল রুক্ষ মরু প্রান্তরে একাকী দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রাণ। ব্যর্থতার হাহাকার ভরা মন নিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে। বুকের গভীরে গুমরে উঠছে তুরন্ত একটা যন্ত্রণার পিণ্ড। প্রাণটা ছটফট করছে। মাথা কুটছে। মুক্তির পথ খুঁজছে। মুক্তি-আলো-আগুন।

নেই, নেই, নেই। আছে আছে, আছে, নেই! নেই, আছে। কোথায়? কোথায়-কোথায়? প্রাণে। রক্তে অস্থিতে মজ্জায়। মুক্তি-আলো, অন্ধকার অসহ্য। আমি আলো চাই, দূর করতে চাই অন্ধকার, নিশ্চিহ্ন করতে চাই অশুভ শক্তিকে, পাপ-অন্যায়। ন্যায়, সত্য, মুক্তি। কোনপথ? সত্য পথ। সে পথের সন্ধান? কোন পথে—কোন পথে?

আমি নিভতে দেব না আগুন। আলোর যাত্রা পথের অশুভ শক্তির সঙ্গে আমি যুদ্ধ করবো। আমি ছিনিয়ে আনবো মুক্তি। মানুষের মনকে আমি কলুষ মুক্ত করবো। প্রতিটি গৃহকে স্বপ্ন সম্ভাবনায় ভরিয়ে তুলবো।

মুক্তি-মুক্তি, আলো, আগুনের স্পর্শে উজ্জিবিত হোক প্রাণ, মন, আত্মা।

মুক্তি চাই, আমি সকলের মুক্তি কামনা করি, মানুষের মুক্তি, আমার মুক্তি।

আমি পশু শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করবো।

আমি যুদ্ধ করবো।

কমরেড!

কাদের পদশব্দ এগিয়ে আসছে। কাছে, আরো কাছে। ডাকছে তাকে আহ্বান জানাচ্ছে। তাকে জাগিয়ে তুলতে চাইছে।

কমরেড, কমরেড !

ওই-ওই আবার ডাকছে তারা। শত সহস্র কণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছে। বন্ধু বলে কাছে টানতে চাইছে। জাগো, জাগো। কমরেড জাগো, বন্ধু জেগে ওঠো তুমি। অশুভ নিদ্রা থেকে উঠে আমাদের কাছে এসো।

কমরেড !

ডাকছে, তারা ডাকছে। লক্ষ কণ্ঠের ডাক। আহ্বান। মুক্তির পথে চলার আহ্বান। দুর্গম দুরুহ পথের যাত্রা। তুমি এসো, বন্ধু তুমি এসো।

আমি কি ঘুমিয়ে আছি ? না, না আমিতো জেগেছিলাম। আমার প্রাণটাকে উত্তাপে ভরিয়ে রেখেছিলাম। মুক্ত-উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠেছিলাম সেই গান। ডাক দিয়ে বলেছিলাম,

জাগো জাগো জাগো সর্বহারা
অনশন বন্দী কৃতদাস
শ্রমিক দিয়াছে আজি সাড়া
উঠিয়াছে মুক্তির আস্বাদ
সনাতন জীর্ণ কু'আচার
চূর্ণ করি মিলি জনগণ
ঘুচাও এ দৈন্য হাহাকার
জীবন মরণ করি পণ।
শেষ যুদ্ধ শুরু আজ কমরেড
এসো মোরা মিলি একসাথ
গাও ইন্টারন্যাশানালে।
মিলাবে মানব হাত।

শত সহস্র লক্ষ কণ্ঠে আমি এ গান গেয়েছি। আমার এ গান শুনে সাড়া দিয়েছে মানুষ। নিদ্রা ভেঙ্গে জেগে উঠেছে। নির্ভয়ে এগিয়ে

এসেছে হাতে হাত রেখেছে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে। এগিয়ে গেছে দীপ্ত পদক্ষেপে।

অত্যচারীর দল ভয় পেয়েছে। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বার বার সাবধান করেছে। বলেছে, সাবধান। এগিও না তোমরা, থাম।

বলেছি,

কথা ব'লোনা তোমরা! ফাঁসি দাও,
গলা কাটো, গুলি করো, তোমাদের ঘোড়ার
খুরে দলে দাও।
তোমাদের অপকীর্তির পুরস্কার পাবে তোমরা পদক
আর ক্রুশ·······

শুধু মনে রেখো,
এক বীরের মৃত্যু হাজার হাজার বীরের জন্ম দেয়।

সেই হাজার হাজার লক্ষ কোটি বীরের মৃত্যু ঘটানো তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেদিন আর নেই, যেদিন তোমাদের অত্যাচারের চাবুক মানুষের পিঠে পড়তো। তোমাদের সে আঘাত নীরবে সহ্য করতো মানুষ। নত মস্তকে পালন করতো তোমাদের প্রতিটি আদেশ; অত্যাচারীত মানুষের বুকের রক্তের বিনিময়ে তোমাদের ঘরে জমে উঠতো সম্পদের পাহাড়।

আজ আর সেদিন নেই। দিন বদলের পালায় মানুষ জেগেছে। মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করেছে, চিনেছে। যেখানে অত্যাচার সেখানেই প্রতিরোধ।

কিন্তু, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম কেন? কেন-কেন-কেন?

কমরেড!

জেগে উঠল শংকর। চোখ মেলে চাইল। পূর্ব দিগন্তে

আলোর ইসারা। রাতের অন্ধকার দূর হচ্ছে। সূর্য ওঠার লগ্ন সমাগত।

কমরেড! মৃদুকণ্ঠে ডাকল চেন্না রাও।

চেন্না রাওয়ের মুখের দিকে তাকাল শংকর। ওর সঙ্গীদের দিকেও। অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলল, আমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম! কখন ফিরলে

ফিরেছি একটু আগে। কবার ডাকলাম। সাড়া পেলাম না।

আমি স্বপ্ন দেখছিলাম কমরেড।

স্বপ্ন!

হ্যাঁ কমরেড। একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম তোমরা আমাকে ডাকছো, জাগাতে চাইছো। আমি জেগে উঠতে, সাড়া দিতে চাইছিলাম, কিন্তু পারছিলাম না। আমার যেন কি হয়েছিল। আমি হাহাকার করছিলাম।

সঙ্গী একজন বলল, আপনি ভয় পেয়েছেন!

না কমরেড, ভয় আমি পাইনি। আমার নিজের জন্যে ভয় আমি পাইনি। কিন্তু আমি ভয় পেয়েছি। আমার মনে আজ শঙ্কা জেগেছে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের যাত্রা পথে বাধা সৃষ্টির জন্য কিছু মানুষ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। লক্ষ্যে পৌঁছাতে বাধা দিচ্ছে। আমরা যে পথে এগিয়ে যেতে চাই তারা তা চাইছে না।

একথা বলছো কেন? জিজ্ঞাসা করল চেন্না রাও।

আমি যে দেখলাম কমরেড। দেখতে পেলাম বন্ধুর ছদ্মবেশে কিছু শত্রুর মুখ। তাদের লোভ লালসা মাখা কুটিল চাহনি। তারা পথের বিপ্লবী সেজে এগিয়ে চলেছে ভিন্ন পথে। প্রতিটি বিপ্লবীকে হতে হবে ধীর স্থির প্রতিজ্ঞায় অটল। বৈজ্ঞানীক দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে যেতে

হবে। দমন করতে হবে চাঞ্চল্য। হৃদয়াবেগকে প্রাধান্য দিলে চলবে না। বিচার বিবেচনাহীন কাজ আমাদের জন্য নয়। কারণ, আমরা যে বিপ্লবী, চাটুকার নই।

কমরেড!

চেয়ারম্যান বলেছেন, বিপ্লব হচ্ছে জনগণের উৎসব। এই উৎসব আমাদের সুচীসুদ্ধ ভাবে সমাধা করতে হবে। উৎসব কলুষিত হোক আমরা চাইবো না। আমরা ক্ষমা করবো না তাদের, যারা আমাদের শত্রু, জনগণের শত্রু। কিন্তু জনগণের ক্ষতি হোক এমন কাজ আমরা নিশ্চয়ই করবো না। তা যদি করি তাহলে জনগণের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করা হবে। আমরা জানি জনগণ আমাদের বিশ্বাস করতে পারছে না। তারা অনেকেই হয়তো ভাবছে আমারও বুঝি সার্কাস পার্টির একটি। মাইক মুখে লাগিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে পথে পথে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছি আমরা শ্রেষ্ঠ। আমাদের তাঁবুতে লক্ষ দর্শকের আসন সংরক্ষিত করা যায়। আমরা মানুষকে আনন্দ দিতে পারি, আমাদের আছে বাঘ সিংহ জলহস্তী। আছে ক্লাউন। শুধুমাত্র ক্লাউনই আপনাদের চিত্ত বিনোদনে সমর্থক। আমাদের সার্কাসে ক্লাউনই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। ক্লাউনই সব। ক্লাউনের রঙ্গ রসিকতা মানুষকে আনন্দ দেয় সত্যি কিন্তু ক্লাউনের জীবনও তো মানুষের জীবন। ক্লাউনও যে আমাদের একজন। আমরা জনগণের একজন করে নিয়েছি ক্লাউনকে। তাই জনগণকে বিশ্বাস করা আমাদের কর্তব্য। জনগণের দুঃখ, ক্ষতি অথবা বেদনাদায়ক কিছু করা আমাদের পক্ষে উচিৎ নয় বলেই আমার বিশ্বাস। আমাদের পথ বিপ্লবের, শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নয়। কারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা অবসানের জন্যেই এ লড়াই। এ লড়াই আমাদের জিৎতে হবে। শত্রুর কুৎসার জবাব দিতে হবে, কুৎসা রটানর পথ বন্ধ করে। কারণ, এযে আমাদের বাঁচার লড়াই।

চুপ করল শংকর। চেন্না রাও ডাকল, কমরেড।

বল।

একথা তুমি বলছো কেন?

বলছি অনেক দুঃখে কমরেড। বলছি, আশঙ্কার কারণে। আমাদের সাবধান হতে হবে। বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়া সন্ত্রাস সৃষ্টিতে নয়। আমাদের পরিচয় অন্যায়ের শত্রু ন্যায়ের রক্ষক। আমরা চাই জনগণের মুক্তি। আমরা অভিনেতা নই, বিপ্লবী। আমাদের পথ বিপ্লবের পথ। শ্রেণী শত্রুর ধ্বংস চাই আমরা।

আবার নীরব হল শংকর। চেন্না রাও আর তার সঙ্গীরা ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বুঝতে পারল না, এমন কথা ও কেন বলছে! একি ওর স্বপ্নের কথা?

তাই চেন্না রাও মৃদুকণ্ঠে ডাকল, কমরেড!

শংকর তার মুখের দিকে চাইল। বলল, কী?

তুমি স্বপ্ন দেখেছো?

স্বপ্ন! ম্লান একটু হাসল শংকর। বলল, এমন কেন দেখলাম বলতো?

কি দেখলে?

দেখলাম ছোট্ট একটু অগ্নিশিখা, লাল টকটকে তার রঙ। মানুষের খুনে রাঙা সেই অগ্নিশিখা মাটির স্পর্শ ত্যাগ করে ওপরে উঠতে লাগল। দূরে, আরো দূরে। মেঘের স্তর ভেদ করে আকাশের স্পর্শ পেতে চাইল। কিন্তু বাধা দিল মেঘের দল। ক্রুদ্ধ গর্জনে গর্জে উঠল, ঝাঁপিয়ে পড়লো ঝড়। বজ্র বিদ্যুৎ একসঙ্গে ছোট্ট অগ্নি শিখাটুকু নিভিয়ে দিতে চাইলো। অন্ধকারে হারিয়ে গেল সেই লাল আগুন রাঙা আলো। শূন্য রিক্ত বালুকাময় মরুভূমিতে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম একাকী।

তারপর?

তোমরা ডাকলে। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দুঃস্বপ্নের জগৎ থেকে আমি ফিরে এলাম। কিন্তু আমার বুকে মুচড়ে ওঠা হাহাকারটা এখনও কাঁপছে।

কেন ?

কি জানি। আমি বুঝতে পারছিনা। কেন এমন হল মনে পড়ছে না। আমি জানি, বিপ্লব জনগণের উৎসব হলেও সাধারণ উৎসব নয়। আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সাধনের পথে যেন বন্ধুবেশী শত্রুর দল বাধা সৃষ্টি করতে চাইছে। উৎসবকে ভুল পথে পরিচালিত করতে চাইছে তারা। জনগণ থেকে দূরে নিয়ে যেতে চাইছে। বৃহত্তর জীবনাদর্শকে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ সংঘাতের মধ্যে জড়িত করতে চাইছে তারা। প্রতিবিপ্লবীর রূপ নিচ্ছে তাদের কাজ।

কে বললে ?

কেউ বলেনি, আমার মনে হচ্ছে। হয়তো এ আমার মনের দুর্বলতা। হয়তো এ আমার পূর্ব জীবনের অবশিষ্টাংশ। যা আমি এখন দূর করে উঠতে পারিনি। বিপ্লবের পথকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারিনি। এখনো পিছনে ফিরে চাওয়ার অভ্যাস আমার যায়নি।

শংকরের মুখের দিকে চাইল চেন্না রাও। ওকে দেখল। মনে পড়ল আর একজনের কথা।

ভাস্কর রাও। সুদূর গুণ্টুর জেলার আঠাশ বছরের যুবক ডাঃ ভাস্কর রাও।

ডাঃ ভাস্কর রাও বলেছিলেন, সত্যি, পেটি-বুর্জোয়া কিছু কিছু কমরেডদের দুর্বলতা দেখলে ভারি লজ্জাবোধ হয়। মনে হয় আমিও তো পেটি বুর্জোয়া—শেষে ওরকম করে বসবো না তো ?

সম্পন্ন ঘরের ছেলে ভাস্কর রাও। ছাত্র জীবনে বড় হওয়ার স্বপ্ন

দেখেছিলেন। সুখ-সম্পদ-অর্থ যশের স্বপ্ন! বড় হবেন। অনেক অনেক বড়। বাড়ি করবেন, গাড়ি কিনবেন। সুন্দরী বিদূষী স্ত্রী। সন্তান, ভরা সংসার। দুঃখের এতটুকু ছায়া থাকবে না। হাসি-আনন্দ উৎসবে ভরা থাকবে গৃহ।

ডাক্তারী পড়া সুরু করেছিলেন ভাস্কর রাও। পাশ করে বেরুলেন একদিন। হ'লেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ। চেম্বার সাজিয়ে সুরু করলেন প্র্যাকটিস। রুগীর অভাব হল না। একটি দুটি করে রুগী এল। আসতে লাগল অর্থ। যুবক ডাক্তারের চেম্বার ভরে রইলো সব সময়।

ডাক্তার চোখ পরীক্ষা করেন। প্রেসক্রিপশন লিখে দেন। হাত বাড়ান ফি-র টাকার জন্যে। কর করে নোট পকেটে পোরেন। দয়া মায়া মমতার স্থান নেই ব্যবসায়। ডাক্তারী নয় তিনি তো ডাক্তারীর ব্যবসাই করছেন।

অন্ধ নাচার বাবা, একটা পয়সা দাও।

অন্ধ কিশোর ভিক্ষা চাইছে। ডাক্তার দেখেন তাকে। জিজ্ঞাসা করেন, হ্যাঁরে, তুই সত্যিই অন্ধ তো?

ভিখারী কিশোর বলে, হ্যাঁ বাবা, সত্যিই আমি এখন আর চোখে দেখতে পাই না।

কিশোরের কথাটা মনে লাগে ডাক্তারের। কৌতূহলি হয়ে ওঠে মন। কিশোর তাহলে জন্মান্ধ নয়, একদিন দেখতে পেত। আলো ছিল জীবনে!

জিজ্ঞাসা করেন, আগে চোখে দেখতে পেতিস তুই?

কেন পাব না? মাঠে ঘাটে কতদিন ছুটে খেলা করে বেড়িয়েছি, সাঁতার কেটেছি নদীতে, গাছে চড়েছি পাখীর ছানা চুরি করার জন্যে। আপনার মতই দেখতে পেতাম আমি।

আমার মত দেখতে পেত! নিজের মনেই কথাটি বার কয়েক উচ্চারণ

করেছিলেন ডাক্তার। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাহলে তোর চোখ নষ্ট হল কি করে?

বাবা খাওয়াতে পারেনি। না খেতে পেয়ে চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেছে।

কে বললে তোকে একথা?

সদর হাসপাতালের ডাক্তার। আমার নাকি না খেতে পেয়ে চোখ নষ্ট হয়েছে। তখন একটু একটু দেখতে পেতুম। বাবাকে ডাক্তার বলেছিলেন, ছেলেকে একটু ভাল খাইয়ো। বাবা বলেছিল, এমনিই খাওয়া জোটে না অর্দ্ধেক দিন, ভাল কেমন করে খাওয়াবো ডাক্তার বাবু? ডাক্তার বলেছিলেন, তাহলে তোমার ছেলের চোখ সারবে না। ওষুধের সঙ্গে পথ্যও দিতে হবে। পরের জমিতে কিষাণ, খাওয়া দেবে কেমন করে বাবা! আমার চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেল।

তোর বাবা আছে?

না, বাবাকে মেরে ফেলেছে জমিদারের দারোয়ানরা।

মেরে ফেলেছে? চমকে উঠেছিলেন ডাক্তার।

হ্যাঁ, বাবা জমিদারের জমি থেকে ক'আঁটি ধান চুরি করেছিল। দেখতে পেয়ে জমিদারের দারোয়ানরা লাঠি পেটা করে হাত পা বেঁধে টানতে টানতে জমিদার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তাতেই বাবা মরে গেল। পোড়াবার খরচ ছিল না, দয়া করে জমিদার মশাই বাবার দেহটা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ডাক্তারের মনটা পাষাণে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তিনি ভাবতে পারছিলেন না কিশোরের কথা কি সত্য? এও কি সম্ভব? একটা মানুষ ক'আঁটি ধান চুরি করার জন্যে মেরে ফেলা হল তাকে কিন্তু চুরি করল কেন সে? ক'আঁটি ধান এমন কিছু মূল্যবান নয়। নিশ্চয়ই সে নিরুপায় হয়ে চুরি করতে বাধ্য হয়েছিল। চুরি করে নিশ্চয়ই সে অন্যায় করেছে। অন্যায়ের শাস্তি তার পাওয়া উচিৎ। তার জন্যে

আইন আছে, আদালত আছে, আছেন বিচারকের দল। তাঁরা আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। অপরাধীর শাস্তি দেন কিন্তু যারা আইনকে পদদলিত করে মানুষের শাস্তি দেওয়ার ভার নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে অর্থের জোরে, তাদের বিচার কে করবে? কোন মহামান্য আদালতের কাঠগড়ায় তাদের বিচার হবে?

হয় না, হবে না, হতে পারে না। ধনীক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্যে যে আইন সেখানে ধনীর বিচার হয় না। ধনী শত সহস্র জঘন্য অপরাধে অপরাধী হয়েও নিষ্কৃতি পায়। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনি-মিনি খেললেও আইন তাদের ধরে না। অর্থের কাছে আইন অচল। ধনীর অন্যায়ের শাস্তি বিধান করা মহামান্য আদালতের নেই।

দেখেছেন তিনি। দিনের পর দিন। যে মানুষটা খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার অপরাধে ধরা পড়লো, হত্যা অপরাধে অভিযুক্ত হল, শিশুর খাদ্য, রোগীর ঔষধ জালের জন্যে জেলে গেল, তাদের কেউ কদিন পরে নির্দোষী প্রমাণীত হয়ে বেরিয়ে এল, কেউ ক'বছর জেল খেটে এসে আবার পুরোদমে সুরু করল ভেজাল ঔষধের কারবার। সব কিছুর মূলে অর্থ। অর্থের জোরে অসম্ভব সম্ভব হয়।

অনাহার, পুষ্টির অভাব যে কিশোরের অন্ধত্বের একমাত্র কারণ, যে কিশোরের পিতা পুত্রের ক্ষুধার অন্ন জোটাতে গিয়ে চুরি করতে বাধ্য হয়, ধরা পড়ে জীবন দিতে হয় ধনীর পোষা গুণ্ডার হাতে, সে সমাজ কি মানুষের সমাজ? ধনীর লালসার ক্ষুধায় শত সহস্র মানুষের মনুষত্ব পীড়িত, লাঞ্ছিত, অপমানীত। বাঁচার অধিকার হরণ করে পরিণত করেছে ক্রীতদাসে। ধনীর ক্রীতদাস। অর্থের ক্রীতদাস।

সমাজ ধনীক শ্রেণীর। সমস্ত অধিকার ধনীক শ্রেণীর করতলগত। তারাই সব। তারাই শ্রেষ্ঠ। তারাই সমাজ এবং রাষ্ট্রের ধারক ও বাহক। যে মজুরের বুকের রক্তে গড়ে ওঠে ধনীর সৌধ তাতে তার কোন অধিকার নেই।

চিন্তা করেছেন ডাক্তার। জ্ঞান চক্ষু উন্মেলিত হয়েছে যেন তাঁর। নিজের দিকে ফিরে চেয়েছেন। প্রশ্ন করেছেন, এইকি একমাত্র সত্য?

পথে নেমেছেন ডাক্তার। মানুষকে দেখেছেন। অসংখ্য মানুষ! নিরন্ন, নিপীড়িত, বঞ্চিত, সর্বহারা মানুষের দল। ধনীর চক্রান্তে জীবনে পদে পদে অধিকার হারাতে বাধ্য হয় যারা।

অথচ তারাও মানুষ। তারাও স্বপ্ন দেখেছিল, ভবিষ্যৎ কামনা করেছিল। স্ত্রী পুত্র কন্যার মুখে দুটি ক্ষুধার অন্ন, পরনের বস্ত্র একটু সুখ চেয়েছিল। কিন্তু পায়নি, পেতে দেওয়া হয়না তাদের। পেটের ক্ষুধা যদি নিবৃত্তি হয় তবে অধিকারের প্রশ্ন তুলবে তারা এই আশঙ্কায়। কারণ, মানুষের ঘরে যদি খাদ্য থাকে, চিন্তা করার সময় পাবে তখন। কিন্তু ক্ষুধার অন্ন জোটাতে যদি সব সময় ব্যস্ত থাকে তাহলে সে সুযোগ তাদের থাকবেনা। অতএব পেটে মেরে রাখতে হবে তাদের, যাতে অন্যদিকে মন দিতে না পারে।

মুখে আহার তুলতে গিয়ে থেমে গেছে ডাক্তারের হাত। সুস্বাদু খাদ্য নামিয়ে রেখেছেন।

বিস্মিতা স্ত্রী প্রশ্ন করেছেন, কি হল?

কথা বলতে পারেননি ডাক্তার। কী বলবেন? নীরবে বসে থেকেছেন।

স্বামীর কাছে এসে গায়ে হাত দিয়েছেন স্ত্রী। জিজ্ঞাসা করছেন, শরীর খারাপ?

নাতো!

তাহলে?

কি জানি, আমার যেন কেমন হল।

কি হল?

স্ত্রীর সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি ডাক্তার। কেমন করে বলবেন, কেন তিনি খেতে পারলেন না। দেশের অসংখ্য মানুষ যখন অর্দ্ধাহারে, অনাহারে থাকতে বাধ্য হয়, সামান্য খাদ্য বস্তুতে ক্ষুধা মেটায়, তখন

তিনি কি করে সুস্বাদু আহার্য্য গ্রহণ করবেন ? ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে সাধারণ খাদ্যবস্তু আহার করতে তিনি কি পারেন না ?

সন্তানদের দিকে তাকিয়েছেন। আপন সন্তান তাঁর। সুন্দর স্বাস্থ্য। ওদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য চেষ্টার তাঁর অন্ত নেই। পিতার কর্তব্য পালন করেছেন তিনি। অকাতরে ব্যয় করেছেন অর্থ। কারণ ওবাই যে ভবিষ্যৎ।

চাষীর পর্ণ কুটিরে, শ্রমিকের বস্তি ঘরের অন্ধকারে তখন হয়তো তাদের ভবিষ্যৎরা ক্ষুধার জালায় কাঁদছে অথবা এক টুকরো খাবার কেড়ে খাচ্ছে।

কেন ? কেন ? কেন ?

কেন এই বঞ্চনা ? সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থার এই কি পরিচয় ? এই কি আমরা সকলেই সমান ? ন্যায় নীতি. সাম্যের যথার্থ রূপ ?
যে সমাজের দিক থেকে একদিন মুখ ঘুরিয়ে ছিলেন তিনি, যাদের দিকে চাইবার প্রয়োজন অনুভব করেননি কোনদিন, তাদের দেখেছিলেন তিনি। দেখতে পেয়েছিলেন চরম দুঃখ দুর্দশা আর অত্যাচার। গ্রামের চাষী যে মাটিতে সোনা ফলায় সেই মাটির অধিকারহারা সে। অধিকার নেই তার পরিশ্রমের ফসলে। কারণ সে জোতদার জমিদারের কেনা গোলাম। ছলে বলে কৌশলে ধনী জোতদার তাকে গোলাম বনতে বাধ্য করেছে। নিরুপায় চাষী বাধ্য হয়েছে দাসখত লিখে দিতে। নাহলে বাঁচতে পারবেনা সে। বিরুদ্ধ শক্তি যে প্রবল। আইন তার সহায়। আইনের আশ্রয় নিয়ে অধিকারচ্যুত করে। জমির অধিকার ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় চাষী।

অন্যায়, অত্যাচার ! কিন্তু এই অন্যায়ই ন্যায়। গোলামের অধিকার কোথায় ন্যায় অন্যায়ের বিচার করার ? শক্তি কোথায় প্রবলের সঙ্গে যুদ্ধ করার ?

না না শক্তি আছে। ঐক্যের মাঝে সে শক্তি নিহিত আছে। দশের

শক্তি মিলে রুখে দাঁড়াতে হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে। টুঁটি কামড়ে ধরতে হবে শত্রুদের।

সংবাদপত্র পাঠ করেন ডাক্তার। বুর্জোয়া আর প্রতিক্রিয়াশীলদের সংবাদপত্র। চাষীদের এই অধিকার রক্ষার সংগ্রাম সেখানে ডাকাতি বলে চিহ্নিত। ডাকাতির পথ ধরেছে মুক্তিকামী সৈনিকের দল!

নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেন ডাক্তার। বিচার করেন। কারা ডাকাত? যারা অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, তারা? না, যারা মানুষের অধিকার হরণ করে পশু জীবন যাপনে বাধ্য করাচ্ছে তারা?

উত্তর পেতে দেরী হয় না তাঁর। দেখতে পেয়েছেন পথ। মুক্তি পথের সন্ধান!

স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন ডাক্তার। কদিন আগে সন্তান সম্ভবা স্ত্রী নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছেন। স্ত্রীকে ভর্তি করে স্বাচ্ছন্দের সমস্ত ব্যবস্থা করে গেছেন তিনি। কাজের চাপে কদিন আসতে পারেন নি। শুনেছেন এবার কষ্ট পাচ্ছেন।

কেবিনে ঢুকে স্ত্রীকে দেখলেন ডাক্তার। আসন্ন প্রসব বেদনায় কষ্টের ছাপ ফুটে উঠেছে মুখে চোখে। সেই কষ্টের মধ্যেই স্বামীর মুখের দিকে চাইলেন তিনি। কি যেন দেখতে পেলেন। ওঠবার সামর্থ নেই, শুয়ে শুয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে তোমার?

ডাক্তার সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছো?

সেই কষ্টের মধ্যেই হাসি ফুটল তাঁর মুখে। বললেন, ভাল।

বেডের পাশে রাখা টুলটায় বসলেন ডাক্তার। হাত রাখলেন মাথায়। জিজ্ঞাসা করলেন, খুব কষ্ট হচ্ছে?

আবার হাসি ফুটলো মুখে। একটু যেন লজ্জা পেলেন। শুয়ে শুয়েই মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, না—না!

স্ত্রীকে দেখলেন ডাক্তার। আসন্ন মাতৃত্বের মহিমায় উজ্জ্বল মুখখানির

দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি। একসময় বক্ষ ভেদ করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর।

দুর্বল হাতে স্বামীর একখানা হাত চেপে ধরলেন স্ত্রী। জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে আমাকে বলবে না?

হাসলেন ডাক্তার। ম্লান বিষণ্ণ হাসি। বললেন, বলার মতো কিছু হয়নি।

তবে?

একটা কথা ভাবছিলাম। যে আসবে তার জন্যে কত ব্যস্ততা আয়োজন আমাদের। অথচ....

কি

আমাদের সামর্থ আছে। যে প্রাণ আমাদের কাছে আসছে তাকে গ্রহণ করার জন্যে আমরা উন্মুখ। সে যাতে ভাল থাকে, এতটুকু কষ্ট না পায়, তা দেখা এবং করা আমাদের কর্তব্য। প্রসব বেদনায় আজ কদিন কষ্ট পাচ্ছ তুমি, তবু তোমার মুখে হাসি। আচ্ছা তোমার মত এই হাসি সব মায়ের মুখেই ফুটে ওঠে?

ডাক্তার কেন যে এমন কথা বলছেন বুঝতে পারলেন না স্ত্রী। তবু বললেন, আমি কখনো দেখিনি কিন্তু আমার মনে হয় সব মায়ের মনই সমান।

আমারও তাই মনে হয়। স্ত্রীর কথা সমর্থন করেছিলেন ডাক্তার। আমিও এই কথাই ভেবেছি। মাতৃত্ব নির্মল, পবিত্র, সুন্দর। সন্তান যে তার অন্তরের জিনিস। মাতৃজঠরে আলোর দিন গোনা অনাগত ভবিষ্যৎ যে তার নাড়ি ছেঁড়া ধন। কিন্তু....

কি? ব্যাকুল ভাবে জানতে চেয়েছিলেন স্ত্রী। হেসেছিলেন ডাক্তার। উত্তর দেননি।

ঘর ছেড়েছিলেন ডাক্তার। আগের দিন জন্ম হয়েছে তাঁর চতুর্থ সন্তানের। স্ত্রী অথবা সন্তানকে দেখতে পাননি। স্ত্রীও জানতে পারেন নি স্বামী তাঁর ঘর ছেড়েছেন।

১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাস। শীতের বাতাস হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। একবস্ত্রে গৃহত্যাগী ডাক্তার এসে দেখা করলেন কমরেড পঞ্চাদ্রী কৃষ্ণ মূর্তির সঙ্গে। বললেন, আমি এসেছি!

কেন? জানতে চাইলেন কমরেড কৃষ্ণমূর্তি।

আপনারা কেন এসেছেন?

আমরা?

হ্যাঁ। হেসেছিলেন ডাক্তার। একসঙ্গে মিলতে এসেছি আমি। এসেছি....

ভীষণ কষ্টের জীবন।

জীবন তো কষ্টের নয়!

অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হবে!

সেই কথাই বলুন! হেসেছিলেন ডাক্তার। বলেছিলেন, মাপ করবেন আমাকে। আপনার সঙ্গে তর্ক আমার শোভা পায়না। আমি ডাক্তার

দুহাতে ডাক্তারকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন কমরেডদের কৃষ্ণমূর্তি। বলেছিলেন, লজ্জা দেবেন না আমাকে। প্রত্যেকের কাছেই আমাদের কিছু না কিছু শেখবার আছে। কিন্তু আপনি হঠাৎ স্ত্রী পুত্র, পেশা ছেড়ে চলে এলেন কেন? আপনি আপনার গ্রামে থেকেই তো মানুষের উপকার করতে পারতেন?

গম্ভীর হয়েছিলেন ডাক্তার। গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, তা হয়তো পারতাম, গরীবেব সেবা করার সুযোগ হয়তো পেতাম কিন্তু অন্যায় অত্যাচার তো আমার পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হ'ত না?

কিন্তু এযে কঠিন পথ। এ পথে পদে পদে মৃত্যু ভয়। ধরা পড়লে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হবে।

কথা বলেননি ডাক্তার। মৃদু একটু করো হাসি ফুটে উঠেছিল তাঁর ওষ্ঠ প্রান্তে।

অত্যাচার করেছে পুলিশের দল। পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছে কৃষক কমরেডরা। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর স্পষ্ট বলেছে, জানি, কিন্তু বলবো না।

বিপ্লবের ঘাঁটি, বিপ্লবী কমরেডদের ঠিকানা তারা শত অত্যাচারেও প্রকাশ করেনি। বলেছে, যত খুশি তোমরা অত্যাচার করো। মরবো, কিন্তু বলবো না। কেন বলবো ? আমরা তো কেউ নিজের জন্যে লড়ছি না, লড়াই জনগণের জন্য।

কিন্তু শিক্ষিত পেটি বুর্জোয়া কমরেড জেল জীবনে পাল্টে গেছে। বিশ্বাসঘাতকতা করতে বাধেনি তার। পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। গোয়েন্দা সঙ্গে নিয়ে এসে মিথ্যা চিঠি পাঠিয়েছে। ধরিয়ে দিতে চেয়েছে দলের কমরেডদের।

সেই জন্যেই সাবধানতা অবলম্বন। প্রতিটি পদক্ষেপে হিসাব। সুবিধাবাদীদের চেনা যে বড় শক্ত।

সে পরিচয় একদিন পেয়েছেন ডাক্তার ভাস্কর রাও। লজ্জিত হয়েছেন। বলেছেন. সত্যি পেটি বুর্জোয়াদের চেনা বড় শক্ত।

অথচ পেটি বুর্জোয়া সমাজ থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁদের স খ্যা বড় অল্প নয়। এসেছেন ছাত্র, শিক্ষক শিক্ষিকা, ডাক্তার ; এসেছেন শ্রমিক কৃষক, লেখক অভিনেতা, গায়ক।

এসেছিলেন কমরেড সত্যনারায়ণ। গিরিজনদের অবিসম্বাদী নেতা তিনি। সমাজের প্রলোভন ত্যাগ করে শিক্ষকরূপে এসে-ছিলেন গিরিজন এলাকায়। ১৯৬০ সালে এক আদিবাসী মহিলাকে বিয়ে করে থেকে গেছেন। পিছনে ফিরে তাকান নি আর। হিসাব করতে বসেন নি কি ছিল তাঁর। কি ফেলে এসেছেন।

কমরেড সত্যনারায়ণ আজ রূপকথার রাজপুত্র। তাঁকে নিয়ে কাহিনীর শেষ নেই। পুলিশ আর শ্রেণী শত্রুর দল তাঁর নামে রঙ চড়িয়ে প্রচার করেছে বহু গল্প।

কিন্তু আসল মানুষটি বলেন, সকলে যা পারে, আমি তা পারি না। অন্য কমরেডরা যে সাহস দেখাচ্ছেন, আমার বোধহয় সে সাহস নেই। আপনারা আমার সমালোচনা করুন, শিখিয়ে দিন। আমি শিখতে চাই। অনেক শেখার আছে আমার।

কোন আত্মম্ভরিতা নেই নেই নেতৃত্ব সুলভ দম্ভ। আমি যেহেতু নেতা, সেইহেতু আমি সব বুঝি! আমার জ্ঞানের সীমা পরিসীমা নেই! আমিই সব! আমি যা বলবো তাই সত্য। কারণ, আমি সব কিছু বুঝি বলেই তো নেতা।

কিন্তু চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির উর্দ্ধতন নেতা থেকে সুরু করে সাধারণ কমরেডটি পর্যন্ত এমন বিনয়ী, দেখলে মনে হয় এ যেন স্কুলে শেখা বিনয়। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি বলেন, 'এটা হচ্ছে পার্টির কাজের একটি পদ্ধতি।'

সবার আগে বিনয়ী হতে হবে। সকলের কাছ থেকেই কিছু না কিছু শেখার আছে। শিক্ষক নই, আমরা সবাই ছাত্র।

এসেছিলেন থামড়া গণপতি। আগে অঞ্চল পঞ্চায়েতের, স্কুলের, কো-অপারেটিভের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। সব ছেড়ে এসে হয়েছিলেন পেশাদার বিপ্লবী। একটি পরিচয়— কমরেড।

বিপ্লবের পতাকাতলে এক হয়েছেন সকলে। ছেঁড়া জুতার মত দূরে ফেলে দিয়েছেন পূর্ব-পরিচয়। কি ছিলাম তার হিসাব করতে বলেননি কেউ। নতুন দিনের স্বপ্ন দেখেছেন সকলে। এক শ্রেণী হীন সুষ্ঠ সমাজের। যেখানে মানুষের একমাত্র পরিচয়, মানুষ!

আকাশেসূর্য উঠছে। নতুন দিনের সূর্য রাতের অন্ধকার, দুঃস্বপ্ন পার হয়ে এগিয়ে এসেছে প্রভাতের আকাশে।

চেন্না রাওয়ের মুখের দিকে চেয়ে শংকর ডাকলো, কমরেড।

চেন্না রাও তার দিকে চাইল। মৃদু হাসিমুখে বলল, বল।

আমাকে ক্ষমা করো কমরেড।

আবার হাসল চেন্না রাও। বলল, এ দুর্বলতাটুকু স্বাভাবিক কমরেড। এই দুর্বলতাটুকু আমাদের সকলের মনেই ছিল একদিন। অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থা আমাদের মনকে পঙ্গু করে তুলেছিল। সুবিধাবাদী নীতিবাগিশের দল আমাদের ভুল পথে পরিচালিত করছিল। আমরা মিছিল বার করেছি। চিৎকার করে বলেছি, আমাদের দাবী মানতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো চলবে না—চলবে না। পাশের লোক শুনে টিট্‌কারী দিয়েছে, তোমাদের চীৎকারে দাম আরো বেড়ে গেল। কার্যক্ষেত্রে দেখেছি সত্যই তাই। বুঝেছি, চীৎকার করে দাবী আদায় করা যায় না। তবু চীৎকার করে গেছি আমরা। শাসকশ্রেণী বুঝে গেছে, আমরা শুধু চিৎকার করতেই ওস্তাদ। কারণ সুবিধাবাদের দ্বারা মহৎ কিছু করা সম্ভব নয়। সুবিধাবাদের নীতিতে কিছু সংখ্যক লোক লাভবান হতে পারে, জনগণের দুর্দশা ঘোচে না।

একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণাম্মা। এগিয়ে এসে বলল, এবার আমাদের যাত্রা করা উচিৎ।

কৃষ্ণাম্মার মুখের দিকে তাকাল শংকর। জিজ্ঞাসা করল আপনিও যাবেন ?

হাসল কৃষ্ণাম্মা। বলল, যাবার অনুমতি আমি পেয়েছি এতদিনে।

ওরা এগিয়ে চলেছে কজন। সকলের আগে কমরেড চেন্না রাও আর তার তিনজন সঙ্গী। শংকর চলেছে তার পিছনে। সবার শেষে কৃষ্ণাম্মা। চড়াই উৎরাই পাহাড়ী পথে হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে শংকরের। সকালের সূর্যটা বেশ তেতে উঠেছে ততোক্ষণে। কাঁধের ঝোলাটা মনে হচ্ছে বেশ ভারী।

কৃষ্ণাম্মা বেশ বুঝতে পারল সে কথা। পাশে এসে বলল, আপনার ঝোলাটা বরং আমাকে দিন কমরেড।

শংকর বলল, না থাক।

কৃষ্ণাম্মা আর কথা বলল না। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। ওর চলায় বনহরিণীর ছন্দ। শংকর দেখল ওদের সকলেরই স্বচ্ছন্দ গতি। সকলের কাছেই কিছু না কিছু বোঝা। গ্রামের মানুষের উপহার। ওরা নিয়ে চলেছে কেন্দ্রীয় স্কোয়াডে। যেখানে চলেছে সে।

শ্রীকাকুলামের কেন্দ্রীয় স্কোয়াডের আমন্ত্রনেই সে অন্ধ্রে এসেছে। এখানে আসবার ইচ্ছা তার অনেকদিনের। কিন্তু সে ইচ্ছা দমন করে রাখতে হয়েছিল তাকে। কারণ নিজের ইচ্ছায় সে কিছু করতে পারে না। নির্দেশ পালন করা অবশ্যই কর্তব্য প্রতিটি কর্মীর। সে নির্দেশ আসবে পার্টির কাছ থেকে। পার্টির বিশিষ্ট নেতা এবং সভ্যরা যা স্থির করবেন তাই হবে।

সাতষট্টির নকশালবাড়ীর সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম একদিন শেষ হল। সুবিধাবাদী যুক্তফ্রন্ট, কেন্দ্রীয় সরকারের বেতনভোগী ঝানু আই, সি, এস শক্ত মানুষ ধর্মবীরা সশস্ত্র পুলিশ পাঠিয়ে দিনের পর দিন অত্যাচার চালালেন নকশালবাড়ীর গরীব কৃষকদের ওপর। ধরা পড়লেন বহু কর্মী। ধরা পড়লেন নকশাল পন্থী নেতা কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল, আরো অনেকে। বহু অভিযোগ, খুন, রাহাজানী ডাকাতি। বিনা বিচারে বন্দী হয়ে রইলেন সকলে।

সভ্য দেশের আইন বিনা বিচারের আইনও প্রণয়ন করেছে। অপরাধী-অপরাধী। আমাদের চোখে অপরাধী, আমাদের আইন বলছে অপরাধী, এর ওপর কোন কথা নেই! আমাদের যা খুশি তাই করবো। কারণ রাষ্ট্র-ক্ষমতা আমাদের হাতে। শাসক আমরা। আমরাই সব। আমরা একমাত্র বিচারক।

বিচারকদের স্বেচ্ছাচারিতা, দমননীতিতে আন্দোলন সামান্য ব্যহত হল মাত্র, কিন্তু শেষ হলনা। কারণ পরিচালক কেউ নেই। প্রায় সকলকেই ওরা কারারুদ্ধ করেছে।

প্রশ্ন করেছিল সে, আমাদের সংগ্রাম কি শেষ হয়ে গেল ?

প্রশ্নটা গভীরভাবেই করেছিল সে। জানতে চেয়েছিল। কিন্তু কোন উত্তর না দিয়ে তিনি হেসেছিলেন।

আপনি হাসছেন ?

তুমি তো বেঁচে আছ শংকর ?

কথাটা বুঝতে পারেনি সে। জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন ?

সংগ্রাম কখনো শেষ হয় না শংকর। কারণ জীবনই সংগ্রাম। সংগ্রামের পথ তো সরল নয়। এ যে বড় আঁকা-বাঁকা কঠিন পথ। অজস্র বাঁক। এই বাঁকের মুখগুলিতে প্রয়োজন হলে অবশ্যই থামতে হবে, যদি পিছু হটবার প্রয়োজন হয় পিছু হটতেও হবে, তবে একসঙ্গে। প্যারী কমিউন মাত্র সত্তর দিন টিঁকে ছিল, কিন্তু সংগ্রাম শেষ হয়ে যায়নি। আমাদের সংগ্রামও স্থগিত হয়েছে মাত্র। যতদিন না দেশের কৃষক শ্রমিকরা পূর্ণ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারছে ততদিন সংগ্রাম শেষ হবে না। শংকর তুমি একজন বিপ্লবী। এমন সন্দেহ জাগা বা প্রশ্ন করা তোমার উচিত হয়নি। চেয়ারম্যান ' বলেছেন, It's infinite joy to pit oneself against heven and earth. শংকর, সারা বিশ্ব ভুবনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তেই তো বিপ্লবীর অশেষ আনন্দ। পাঞ্জা লড়ার মত মনোবল চাই বিপ্লবীর। মনকে দৃঢ় কঠিন করে গড়ে তুলতে হবে। আঘাত সহ্য করতে হবে। যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য মনকে প্রস্তুত রাখতে হবে। কোন ক্ষেত্রেই হতাশ হলে চলবে না। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কাছে আমরা পরাজিত হয়েছি সত্য, আমাদের সংগ্রাম শেষ হয়ে যায়নি।

১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারী। রাশিয়ার শ্রমিকরা পিটার্সবুর্গে বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে শান্তভাবে আসছিল জারের কাছে তাদের অভাব অনটনের কথা জানাতে। জারের আদেশে সেই মিছিলের

আত্মবিশ্বাসকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বন্ধুর ছদ্মবেশে যারা শত্রুতা করছে তাদের চিনিয়ে দিতে হবে। বিপ্লব নেতা করে না, করে জনগণ। কৃষক শ্রমিকই তো পারে বিপ্লব করতে। জনযুদ্ধ জনগণের, নেতার নয়। নকশালবাড়ির জনগণের বুকের রক্তে জ্বালা আগুন যেন না নেভে। নিভবে না শংকর। এ আগুন নেভবার নয়। নিভবে সেদিন, যেদিন জনগণের জীবনে আসবে সত্যকারের মুক্তি!

কমরেড!

কৃষ্ণাম্মার কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল শংকর। তার দিকে চাইল।

কৃষ্ণাম্মার কণ্ঠে বিস্ময়। জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি হয়েছে কমরেড?

কি হবে? বিস্মিত শংকর প্রশ্ন করল তাকে।

তুমি দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?

দাঁড়িয়ে পড়েছি? আশ্চর্য হল শংকর। দেখল, অজান্তে কখন চলার গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে তার দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। কিন্তু দাঁড়াতে তো সে চায়নি। এগিয়ে যাবে এই তো তার শপথ। লজ্জিত কণ্ঠে বলল, আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন কমরেড। দাঁড়াতে আমি চাইনি। কিন্তু···

চুপ করে গেল শংকর। কৃষ্ণাম্মাও একটু লজ্জিত। একটু আগে যে সম্বোধন সে করেছে তাতে তার নারীমন লজ্জা পেয়েছে। তবু জিজ্ঞাসা করল, কারো কথা ভাবছিলেন?

একজনের কথা হঠাৎ এই পাহাড়ী পথের চড়াই উৎরাই ভাঙতে ভাঙতে মনে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওঁরা কোথায় গেলেন, দেখছি না তো?

কৃষ্ণাম্মা বলল, সামান্য দূরে একখানি গ্রাম আছে। সেখানকার

একজন কমরেড আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর সঙ্গে কমরেডরা গ্রামে গেছেন। এখুনি ফিরবেন। একটু নীরব থেকে প্রশ্ন করল, যাঁর কথা মনে পড়ায় আপনার চলার গতি ব্যহত হয়েছিল তিনি কি আপনার প্রিয়জন ?

কৃষ্ণাম্মা কি জানতে চায় বুঝতে পারল শংকর। নারী মনের দুর্বার কৌতুহল। এ কৌতুহল তার সহজাত প্রবৃত্তি। মনের গঠন প্রকৃতি তাকে কৌতুহলী করে তোলে। বাধ্য হয় সে।

শংকরের মনটাও মুহূর্তে পরিবর্তিত হল। ভুলে গেল পারি-পার্শিকতা। ছেলেমানুষী পেয়ে বসল যেন তাকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ইচ্ছা করেই ফেলল সে।

কৃষ্ণাম্মা জিজ্ঞাসা করল, কি হল কমরেড ?

অন্য দিকে মুখখানা ঘুরিয়ে নিল সে। রুদ্ধকণ্ঠে বলল, কিছু না।

একটু নীরবতা। কৃষ্ণাম্মার কণ্ঠ শোনা গেল, কমরেড!

তেমনি মুখ ঘোরানো অবস্থাতেই সাড়া দিল, কি ?

না বুঝে যে অপরাধ করেছি তার জন্যে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। একটু চুপ করে রইলো কৃষ্ণাম্মা। বলল, আমি যদি বুঝতে পারতাম আপনি ব্যথা পাবেন, তাহলে কিছু জানতে চাইতাম না।

শংকর রুদ্ধ অথচ মৃদুকণ্ঠে বলল, সত্যিই আমার অতি প্রিয়জন তিনি।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটু বেশ ম্লান হল কৃষ্ণাম্মার মুখখানা। পরক্ষণেই স্বাভাবিকতা ফিরে এল। বলল, তিনি কি···

আমাদের একই পথের যাত্রী। তেমনি মৃদুকণ্ঠে বলল শংকর। স্বীকার করতে লজ্জা নেই ভুল পথ থেকে তিনিই আমাকে টেনে এনেছেন। আমাকে পথ দেখিয়েছেন।

বলেন কি, কৃষ্ণাম্মার কণ্ঠে আবার বিস্ময়ের প্রকাশ।

শংকর বলল, সত্য।

তাহলে আপনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এলেন না কেন? কতজনই তো···

বাধা দিয়ে শংকর বলল, তিনিই তো আমাকে পাঠিয়েছেন এখানে।

তিনি এলেন না?

না। মাথা নাড়ল শংকর। বলল, তাঁর আসবার উপায় নেই যে।

আপনি···

আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে তিনিই আমাকে দীক্ষিত করেছিলেন একদিন। বহুদিন ধরেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। প্রায়ই দেখা হত তাঁর সঙ্গে। তারপর হঠাৎ একদিন হারিয়ে গেলেন তিনি। একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম তাঁর কথা। এমন সময় তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হল আমার। দীর্ঘদিন পরে। দেখলাম দীর্ঘদিনের অদর্শনে বিস্মৃত হইনি আমরা কেউই। আমি তখন দিশাহারা। নিজের প্রতিই আস্থাহারা হচ্ছি ক্রমশঃ। তাঁর মতামত শুনলাম। অকপটে তিনি আমার কাছে তাঁর মতামত প্রকাশ করলেন। আমাকে নতুন পথের সন্ধান দিলেন। বললেন, বিপ্লবের পথ ত্যাগে। আপন সুখ স্বাচ্ছন্দকে আঁকড়ে ধরে থেকে বিপ্লব হয় না। সর্বহারা শ্রেণীর একজন হতে হবে। শুনেছিলাম লেনিনের কথা, মাও সে তুঙয়ের কথা। তাঁদের ত্যাগের কথা, সংগ্রামের কথা। মানুষের প্রতি তাঁদের মমতা, শ্রদ্ধা, ভালবাসার কথা। সাধারণ মানুষের থেকে কখনো ভিন্ন ভাবেননি তাঁরা নিজেদের। আততায়ীর আক্রমণের পরে লেনিন যখন মৃতপ্রায় হয়েছিলেন, চিকিৎসকেরা কিছু খাদ্য নির্দেশ করেছিলেন যা সাধারণ রেশন কার্ডে পাওয়া যায়না—শুধু বাজারেই কোন চোরাকারবারির

কাছে কেনা যায়। বন্ধুবান্ধবের শত অনুনয় সত্ত্বেও, যা নিয়মিত রেশনের মধ্যে নেই, যা সকলে পায়না তা তিনি ছুঁতে অস্বীকার করেছিলেন। এমন দিনও গেছে তাঁর জীবনে যেদিন সাধারণ মানুষ রুটি পায়নি, তিনিও অভুক্ত থেকেছেন সকলের সঙ্গে। অথচ তিনি তখন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর ইচ্ছায় অসাধ্য কিছু ছিল না। কিন্তু নিজেকে তিনি সোভিয়েতের মানুষের থেকে আলাদা কখনো ভাবেন নি। তিনি জনগণের একজন।

দেখেছিলাম তাঁকে। তাঁর নিজস্ব যা কিছু ছিল সবই তিনি পার্টি ফাণ্ডে দিয়ে দিয়েছিলেন নিজের পেট চালান গ্রামের দুস্থ মানুষের সেবা করে। তাদের অসুখে বিসুখে ওষুধ দেন, সেবা করেন রাত জেগে। এমন দিনও যায়, দেখেছি. যেদিন কিছু জোটে না। তবু কোন অভিযোগ নেই, নেই অহংকার। কোনদিন প্রশ্ন করলে হেসে বলেছেন, শংকর বিপ্লবের পথ একটু কঠিন বৈকি। নিজের খাদ্য নিজেকেই পরিশ্রম করে জোগাড় করে নিতে হবে।

একদিন মনে সংশয় জাগতে তিনি চিংকাং পাহাড়ে সংগ্রামের ইতিহাস শুনিয়েছিলেন। বিপ্লব কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয় জেনেছিলাম। হঠাৎ পরাজয়টাকে চিরস্থায়ী ভেবে নেওয়া মূর্খামী ভিন্ন যে আর কিছু নয় বুঝতে পেরেছিলাম। যুদ্ধে জয় যেমন আছে, পরাজয়ও তেমনি মেনে নিতে হয় কখনো কখনো। কিন্তু কেন পরাজয় ঘটল, বিচ্যুতি-দুর্বলতাকে কাটিয়ে ওঠা প্রয়োজন। চিংকাং পাহাড়ের সংগ্রামে, আগষ্ট মাসের পরাজয়ের পর ২৫শে নভেম্বর ১৯২৮ সালে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট রিপোর্টে কমরেড মাও সে তুঙ বলেছিলেন, পরিবেষ্টনকারী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে স্বাধীন রাজত্বের রণনীতি অবশ্যই রকম ফের করতে হবে। শাসকশ্রেণীর রাজত্ব যখন সাময়িকভাবে স্থায়িত্ব লাভ করেছে তখন এক ধরণের রণনীতি, আবার যখন তারা

বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন এক ধরণের রণনীতি গ্রহণ করতে হবে। হুনান ও হুপে প্রদেশে লীস্থুঙ-জেন-এর সঙ্গে তাও শেঙ-চী-এর যুদ্ধ (১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে) এবং কোয়ান-টুঙ প্রদেশে চ্যাংফা-কুয়েই-র সঙ্গে লী-চী-পেন-এর যুদ্ধের (১৯২৭ সালের নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে) সময়ে শাসকশ্রেণীগুলো যেরকম বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল সেই রকম সময়ে আমাদের রণনীতি তুলনামূলকভাবে হুঃসাহসিক হয়ে উঠতে পারে এবং সামরিক কার্যকলাপের দ্বারা তুলনামূলকভাবে বড় বড় এলাকা ছিনিয়ে আনা যেতে পারে। তবে কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে ভিত্তিটা মজবুত করার জন্য আমাদের যত্নবান হতেই হবে, যাতে শ্বেত-সন্ত্রাস যখন আঘাত হানবে তখন আমাদের নিরাপদ নির্ভরস্থল কিছু থাকে। যখন শাসকশ্রেণীগুলির রাজত্ব তুলনামূলকভাবে স্থায়িত্ব লাভ করে, তখন আমাদের অবশ্যই ক্রমে ক্রমে এগোবার রণনীতি গ্রহণ করতে হবে। ঐ রকম সময়ে সামরিক দিক থেকে সবচেয়ে খারাপ কাজ হল হুঃসাহসিক-ভাবে এগিয়ে চলার জন্য আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করা এবং স্থানীয় কাজকর্মের ক্ষেত্রে (ভূমি বণ্টন, রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা, পার্টিকে সম্প্রসারিত করা এবং স্থানীয় সশস্ত্র শক্তি সংগঠিত করা) সবচেয়ে খারাপ কাজ হল আমাদের কর্মীদের এধার ওধার ছড়িয়ে দেওয়া এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে মজবুত ভিত্তি স্থাপনের কাজে গাফিলতি দেখানো। ছোট ছোট বহু লাল এলাকা যে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে, তার কারণ, হয় সেখানে উপযুক্ত বাস্তব অবস্থা ছিল না, অথবা কৌশল-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিষয়ীগত ভুল ক্রটি ছিল। কৌশলগত যে ভুল ক্রটি ঘটেছে, তার একমাত্র কারণ, শাসকশ্রেণীগুলির রাজত্বের সাময়িক স্থায়িত্ব ও শাসকশ্রেণীগুলির মধ্যে বিভেদ—এই হুই ধরণের পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টভাবে নির্ণয়ে ব্যর্থতা। এই সাময়িক স্থায়িত্বের সময় কিছু কিছু কমরেড

দুঃসাহসিকভাবে এগিয়ে চলার জন্য আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করার কথা বলেছিলেন। এমনকি বিস্তীর্ণ এলাকার রক্ষা-ব্যবস্থা শুধুমাত্র লাল রক্ষীদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হোক—এমন প্রস্তাবও তাঁরা করেন। জমিদারদের দেওয়া সৈন্য নিয়ে আক্রমণ চালানো ছাড়াও শত্রুপক্ষ যে নিয়মিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে কেন্দ্রীভূত আক্রমণও চালাতে পারে—একথা তাঁরা যেন ভুলে গিয়েছিলেন। স্থানীয় কাজকর্মের ক্ষেত্রে তাঁরা কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে মজবুত ভিত্তি তৈরীর কাজে চরম অবহেলা দেখিয়েছেন এবং আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে যথেচ্ছ সম্প্রসারণের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সামরিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে এগোনোর নীতি গ্রহণের কথা বললে বা স্থানীয় কাজকর্মের ক্ষেত্রে আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করে কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে মজবুত ভিত্তি তৈরি করে নিজেদের অবস্থান দুর্ভেদ্য করে তোলার নীতি গ্রহণের কথা বললেই তাকে 'রক্ষণশীল' বলে দেওয়া হত। আগষ্ট মাসে হুনান—কীয়াং সি সীমান্ত অঞ্চলের এবং দক্ষিণ হুনানে চতুর্থ লাল ফৌজবাহিনীর যে পরাজয় ঘটলো তার মূলে আছে ওঁদের ভুল ধারণাগুলি।

সীমান্ত অঞ্চলের বিশেষ পার্টি কমিটি (সম্পাদক মাও সে তুং) এবং সেনাবাহিনী পার্টি কমিটি (সম্পাদক চেন-ই) যে নীতিগুলি গ্রহণ করেছিলেন :

শত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করো, লোথিয়াও পর্বতমালার মধ্যবর্তী অংশে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করো এবং পলায়নী মনোবৃত্তির বিরোধিতা করো।

স্বাধীন রাজত্বের এলাকাগুলিতে কৃষি বিপ্লবকে গভীরতর করো।

সেনাবাহিনীর পার্টি সংগঠনের সাহায্যে স্থানীয় পার্টি সংগঠনের বৃদ্ধিসাধনে যত্নবান হও এবং নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে স্থানীয় সশস্ত্র শক্তির বৃদ্ধিসাধনে যত্নবান হও।

হুনানের শাসক শক্তি তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও এবং তুলনামূলকভাবে বেশি দুর্বল কীয়াং-সি শাসকশক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান চালাও।

য়ুং সীনের উন্নতির জন্য প্রবল প্রচেষ্টা চালাও, সেখানে জনগণের একটি স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করো এবং দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও।

সময় বুঝে সমাগত শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার জন্য লালফৌজের ইউনিটগুলিকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করো, আর শত্রু যাতে আমাদের বাহিনীর অংশগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে ধরে একটার পর একটা খতম করে না ফেলতে পারে তার জন্য আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করে দেওয়ার বিরোধিতা করো।

স্বাধীন রাজত্বের এলাকাকে সম্প্রসারিত করার জন্য ঢেউ-এর পর ঢেউয়ের মত করে এগিয়ে যাওয়ার নীতি গ্রহণ করো এবং দুঃসাহসিক অগ্রগতির মাধ্যমে সম্প্রসারণের নীতির বিরোধিতা করো।

এই যথাযত কৌশলগুলি ছিল বলেই একের পর এক জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল। বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় দুটি ছোট দল আর ষাটটি জীর্ণ রাইফেল। তবু তাঁরা এগিয়ে গেছেন দুর্জয় সাহসের ওপর ভর করে। গেরিলা আক্রমণ চলেছে দিনের পর দিন। জনগণ জাগ্রত হয়ে উঠেছে। শত্রুরা অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও পরাজিত হয়েছে।

পরাজিত হয়েছেন তাঁরাও। নিজেদের ভুলে লালফৌজের বাহিনীও। আগষ্ট মাসের পরাজয়ের কারণগুলি হচ্ছে ঃ

(১) কিছু অফিসার ও সৈন্য দোনা-মোনা করছিল, ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে তারা লড়াই করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। আর অন্যরা দক্ষিণে হুনানে যেতে অনিচ্ছুক ছিল। তাদের মধ্যে উৎসাহের অভাব ছিল ; (২) গ্রীষ্মের

ভ্যাপ্‌সা গরমের মধ্যে পায়ে হেঁটে দীর্ঘপথ চলার ফলে আমাদের সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ; (৩) লিংসীয়েন থেকে কয়েক শত লি (৩লি=১ মাইল) দূরে চলে যাওয়ার পর আমাদের সৈন্যরা সীমান্ত অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল ; (৪) দক্ষিণ হুনানের জনগণকে তখনও জাগিয়ে তোলা হয়নি। ফলে আমাদের অভিযান পুরোপুরিভাবে একটা হঠকারী সামরিক অভিযানে পরিণত হয়েছিল। শত্রুর পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ ছিলাম এবং (৫) যথোপযুক্ত প্রস্তুতি ছিল না এবং অফিসার ও সৈন্যরা অভিযানের উদ্দেশ্য কি বুঝতে পারেনি।

পরে, বিপ্লব জয়যুক্ত হবার আগে দীর্ঘদিন কি দুঃসহ অবস্থার মধ্যে তাঁদের লড়তে হয়েছে। পাঁচ হাজার লোকের পুরো সেনা-বাহিনীর শীতবস্ত্রের জন্য তুলোভরা কাঁথা আছে কিন্তু কাপড়ের অভাব। কন্‌কনে ঠাণ্ডায় দু' ভাঁজ করা পাতলা কাপড়ের পোষাক পরে কাটাতে হয়েছে। সামান্য আহার। প্রতিটি লড়াইয়ের পর কিছু লোক আহত হয়েছে। তা ছাড়া অপুষ্টিতে, ঠাণ্ডা লেগে ও অন্যান্য কারণেও বহু সৈন্য অফিসার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। চিংকাং পাহাড়ের ওপর হাসপাতালগুলিতে চীনা ও পাশ্চাত্য দু' ধরণের চিকিৎসারই বন্দোবস্ত আছে, নেই শুধু ডাক্তার আর ঔষধ।

সাধারণত, লড়াই করতে পারার আগে একজন সৈনিকের প্রয়োজন ছয়মাস বা এক বছরের শিক্ষা। কিন্তু কাল সৈন্য দলে ভর্তি হয়ে আজই লড়াইয়ে নামতে হয়েছে শুধুমাত্র সাহসের ওপর নির্ভর করে। ফলে আনাড়ী সৈনিককে অল্প কালের মধ্যেই প্রাণ দিতে হয়েছে। তবু কোন অভিযোগ ছিল না। কারণ সকলেই বুঝেছিলেন, এ তাঁদের মুক্তিযুদ্ধ। গণতন্ত্রের লড়াই।

বহু ঝড় ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে লাল ফৌজ। তাদের দুর্বার গতিরোধ করার সামর্থ বিরুদ্ধ শক্তির হয়নি। পশুশক্তি

পরাজিত হয়েছে। যুগযুগান্তের অন্যায়, পাপ আর অত্যাচারের অবসান ঘটেছে। মুক্ত হয়েছে চীনের জনগণ।

অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর মৃদুকণ্ঠে কৃষ্ণাম্মা ডাকল, কমরেড।

শংকর তার মুখের দিকে চাইলো।

আমাকে ক্ষমা করবেন আপনি। বলল কৃষ্ণাম্মা।

শংকর বুঝতে পারল সব। তবু জিজ্ঞাসা করল, কেন?

আমি ভুল ধারণা করেছিলাম। অবিচার করেছিলাম আপনার ওপর।

আপনার এই অবিচারটুকু কিন্তু আমার কাছে অনেক।

কি? চমকে মুখ তুললো কৃষ্ণাম্মা। তার কালো মুখে এক ঝলক রক্ত।

কিছু না। হাসল শংকর। বলল, আমাদের পথ চলার এখনও অনেক বাকী।

কৃষ্ণাম্মা মাথা নীচু করলো। ধরা পড়ে গেছে সে। লজ্জা পেল। কিন্তু লজ্জার মাঝেও যে এমন আনন্দের স্বাদ জড়িয়ে থাকে এই প্রথম সে অনুভব করলো তার জীবনে।

খানিকক্ষণ পরেই ফিরে এল চেন্না রাও। একাকী। হাতে ছোট একটা পুঁটলি। এসে বলল, কমরেড, আমাদের এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

কৃষ্ণাম্মা জানতে চাইলো, কেন।

পাশের গ্রামে পুলিশী হামলা হয়েছে। আমরা পুলিশের ওপর আক্রমণ করবো। এই তোমাদের খাবার। তোমরা এখানেই অপেক্ষা করবে।

বোনের হাতে খাবারটা দিয়ে কথাটা বলেই ছুটে চলে গেল চেন্না রাও। তাকে বাধা দেয় বা অন্য কথা জিজ্ঞাসা করে তেমন সুযোগ সে দিল না।

চেন্না রাও যাবার সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা এক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে রইলো কৃষ্ণাম্মার। পরক্ষণে মৃদু হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি এখন খাবেন কমরেড?

যেন কিছুই হয়নি, অতি স্বাভাবিক ঘটনা। কৃষ্ণাম্মাকে দেখে এবং তার কণ্ঠস্বর শুনে তাই মনে হল শংকরের। বলল, খাবো, কিন্তু ওরা ফিরবেন কখন?

ছোট পুঁটলিটা ততোক্ষণে খুলে ফেলেছে কৃষ্ণাম্মা। বড় একটা পাথরের ওপর পাতা পাততে পাততে একবার তার মুখের দিকে চাইল। মৃদুকণ্ঠে বলল, কেউ জানে না।

কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে কৃষ্ণাম্মার মুখের দিকে চাইলো সে। বিস্মিতকণ্ঠে বলল, একি বলছেন আপনি?

কৃষ্ণাম্মার ততোক্ষণে খাবার দেওয়া হয়ে গেছে। তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, আপনি খেয়ে নিন।

শংকরের ততোক্ষণে খাবার স্পৃহা চলে গেছে। কিন্তু খাব না বলতেও পারল না সে। খেতে বসে মনে হল খাবার গলা দিয়ে নামতে চাইছে না। কৃষ্ণাম্মা দেখল। যেন বুঝতে পারল তার অবস্থাটা। মৃদুকণ্ঠে বলল, মিথ্যা মন খারাপ করে কোন লাভ নেই। যা সত্য তাই বলেছি আমি।

কিন্তু……। কি যেন বলতে চাইল শংকর।

ম্লান বেদনার একটু হাসি ফুটলো কৃষ্ণাম্মার ওষ্ঠে। বড়ো চোখ দুটিও যেন ছলছলিয়ে উঠল। শান্তকণ্ঠে বলল, সত্যিই কেউ জানে না কি হবে। জানে না শ্রীকাকুলামের মানুষও, যে শিশুটি সবে ভূমিষ্ঠ হল তার ভাগ্যে যে কি লেখা আছে তাও কেউ বলতে পারে না। কারণ ওদের চোখে আমরা অপরাধী। তরুণের স্বপ্ন আমাদের, আমরা স্বপ্ন দেখেছি, ভারতবর্ষের কোটি কোটি কৃষক, যারা যুগ যুগ ধরে শোষিত, অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হয়েছে তাদের মুক্তি আনবো; মুক্তি আনবো শোষণ থেকে, মুক্তি আনবো অন্ধকার থেকে, দারিদ্র আর ক্ষুধা থেকে। আমরা বিপ্লবে বিশ্বাসী, সশস্ত্র কৃষকই যে বিপ্লব সফল করতে পারে এ বিশ্বাসে আমরা দৃঢ়। অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে, বিফল হয়েছে তেলেঙ্গানা, কারণ সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি তখন। কিন্তু আজ আমরা মুক্তি পথের সন্ধান পেয়েছি। মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারার সন্ধান পেয়েছি আমরা। তেলেঙ্গানার ব্যর্থতাকে পেরিয়ে ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম সেই সত্য রূপ পেয়েছিল নকশালবাড়িতে।

সংশোধনবাদী কাউটস্কি যখন মার্কসের শিক্ষার বিপ্লবী মর্মবস্তুকে বরবাদ করে, তাকে নির্বীর্য করে শুধু তার নাম ব্যবহার করে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের হাড়িকাঠে জনতার স্বার্থকে বলি দিতে গিয়েছিল তখন লেনিন লিখেছিলেন :

"মহান বিপ্লবীদের জীবিতকালে নিপীড়নকারী শ্রেণীগুলি অনবরত

তাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়; বর্বরতম বিদ্বেষ, হিংস্রতম ঘৃণা এবং মিথ্যা ও কুৎসার একেবারে বিবেক বিবর্জিত অভিযান চালিয়ে তাদের তত্ত্বগুলিতে আক্রমণ করে। তাদের মৃত্যুর পর চেষ্টা করা হয় তাদের নিরীহ বিগ্রহে পরিণত করার, তাদের যাকে বলে সিদ্ধপুরুষ তাই বানিয়ে তোলার এবং তাদের নামের চারপাশে জ্যোতির্মণ্ডল সৃষ্টি করার; এই চেষ্টার উদ্দেশ্য হল, নিপীড়িত শ্রেণী গুলিকে "সান্ত্বনা" দেওয়া, তাদের ধাপ্পা দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী তত্ত্বের মর্মবস্তুটুকু ফেলে দিয়ে ঐ তত্ত্বকে নির্বীর্য করে দেওয়া, পঙ্কিল করে দেওয়া, তার বিপ্লবী ধারাকে ভোঁতা করে দেওয়া।"

লেনিন এই কঠোর হুঁশিয়ারী দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি। তিনি তখন সেই সংশোধনবাদী শয়তানদের হাত থেকে বিপ্লবের মশাল কেড়ে নেন।

মার্কস এঙ্গেলসের শিক্ষার বিপ্লবী অন্তর্বস্তুকে লেনিন রক্ষা করেছিলেন, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বাড়িয়ে তুলেছিলেন। লেনিনের মৃত্যুর পর স্তালিন সেই বিপ্লবের মশাল হাতে তুলে নেন। আজ সে মশাল জ্বলছে চেয়ারম্যানের হাতে।

ভণ্ড লেনিন পুজারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন চেয়ারম্যানের মন্ত্রশিষ্য কমরেড চারু মজুমদার ঐতিহাসিক নকশাল বাড়ি সৃষ্টি করে। চেয়ারম্যানের উত্তরাধিকারী ভাইস চেয়ারম্যান লিন পিয়াও যেভাবে চেয়ারম্যানের চিন্তাধারাকে, তাঁর জনযুদ্ধের তত্ত্বকে, তাঁর গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্বকে, সাম্রাজ্যবাদের দ্রুত ও সম্পূর্ণ পতন এবং সমাজতন্ত্রের দ্রুত বিস্তৃতির যুগে তাঁর সর্বহারা বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশলকে তুলে ধরলেন, তাকে আত্মস্থ করে ভারতীয় বিপ্লবের পরিস্থিতিতে নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করলেন কমরেড চারু মজুমদার।

চেয়ারম্যান বলেছেন : "যদি বিপ্লব করতে হয়, তা'হলে অবশ্যই একটা বিপ্লবী পার্টি থাকতে হবে।"

নকশালবাড়ির পর মুশাহারি, লখিমপুর ঘেরী। তৈরি হল শ্রীকাকুলাম। যার অভিনব অভিজ্ঞতার সার-সংকলন করে তৈরি হল ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)। আধুনিক সংশোধনবাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ধ্বংস করে ভারতের বিপ্লবী রাজনীতিতে এই সর্বপ্রথম কৃষক পেল তার অনন্য সাধারণ ভূমিকার স্বীকৃতি। অন্নদাতা পেল মুক্তিদাতার মর্যাদা।

নকশালবাড়ীর বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করেছিল সাতষট্টির প্রতিক্রিয়াশীল ফ্রন্ট সরকার। সতের মাস পরে রাজ্যপালের পুলিশবাহিনী গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে বন্দী রাখলো। উনসত্তরের নির্বাচনে জয়ী হয়ে আবার ক্ষমতায় এল যুক্তফ্রন্ট সরকার। প্রতিক্রিয়াশীল নয়, প্রগতিশীল ফ্রন্টসরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কমরেড জ্যোতি বসু বিনা সর্তে মুক্তি দিলেন কৃষক বিপ্লবী ও নেতাদের।

১লা মে ১৯৬৯ মে দিবসে মনুমেণ্টের পাদদেশে সভায় একজন ভারতের তৃতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের শুভ সংবাদ ঘোষণা করলেন, শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড কানু সান্যাল।

ভারতবর্ষের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সত্যকারের বিপ্লবী পার্টি। নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলেছে পার্টি। যে বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপক কৃষক শ্রেণীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশী ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা সফলতা লাভ করছে। পার্টির ডাকে এগিয়ে আসছেন শ্রমিকরা—বিপ্লবের নেতারা, বিপ্লবী কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গণবিপ্লবকে পরিচালিত করার জন্য এগিয়ে আসছেন দলে দলে বিপ্লবী যুব ছাত্ররা, ধনী কৃষকের একটা অংশ, মেহনতী মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

শাসকশ্রেণী আজ ভয়ার্ত—দিশাহারা। বিপ্লবকে ধ্বংশ করতে ওরা চালাচ্ছে হিংস্রতম বর্বরতম দমননীতি, গ্রেপ্তার আটক তো আছেই, সঙ্গে আছে বিচারের প্রহসনটুকু না করে ধরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করা। সেই জন্যেই আজ মারের বদলে পাল্টা মার, হিংসার জবাব হিংসা দিয়েই দেওয়া হচ্ছে, প্রতিটি আক্রমণের বদলা নেওয়া হচ্ছে, ওদের বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে শাসকশ্রেণীর হত্যার এক চেটিয়া অধিকারের দিন শেষ হয়ে গেছে!

মৃত্যু?

যদি মৃত্যু হয়?

এ দুনিয়ায় অমর তো কেউ থাকবে না চিরদিন! মরে কাপুরুষ, বীরের মৃত্যু নেই!

বীরের মৃত্যু নেই। বীর কখনো মরে না।

মরেননি কমরেড বাবুলাল, সুব্বারাও পানিগ্রাহী, পঞ্চাদ্রী কৃষ্ণমূর্তি, নির্মলা কৃষ্ণমূর্তি, রমেশচন্দ্র সাহু, আনকাম্মা, স্বরস্বতী আম্মা, থামাডা গণপতি, গোরাকালা সন্ন্যাসী, গণমাধব রাও, গাডেলা লোকনাথম্, মারিপিন্তি বল্লভ রাও, উম্ম রাও আর ভাস্কর রাওদের। বীর শহীদ কমরেডরা চিরদিন বেঁচে থাকবেন।

নকশালবাড়ির মাটিতে শহীদ হয়েছেন বাবুলাল। একা বাবুলাল পাঁচশো সশস্ত্র পুলিশ। অসংখ্য বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে বাবুলালের বুকের পাঁজর, কিন্তু মুখে বেদনার চিহ্নমাত্র ছিল না। মুখের অম্লান হাসিটুকু দিয়ে বাবুলাল প্রমাণ করে গেছেন প্রকৃত বিপ্লবীর জীবনে মৃত্যু কত তুচ্ছ!

শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেছেন কমরেড থামাডা গণপতি, নির্মলা কৃষ্ণমূর্তি, সুব্বারাও পানিগ্রাহী, রমেশ সাহু এবং ভাস্কর রাও। এঁদের কেউ কবি নাট্যকার, কেউ মাষ্টার ডাক্তার জায়া ও জননী।

যেমন আপন পেশা, সুখ স্বাচ্ছন্দ, সংসার ছেড়ে বিপ্লবের ডাকে ছুটে এসেছিলেন ডাঃ ভাস্কর রাও তেমনি এসেছিলেন সুব্বারাও পানিগ্রাহী। তাঁর নাটক করে হাজার হাজার টাকা উঠেছে—অনুষ্ঠানকারীরা সেই টাকা দিতে চেয়েছে তাঁকে, সিনেমা থেকে ডেকেছে, দেখিয়েছে সুখের প্রলোভন, ধনী হওয়ার রাস্তা, কিন্তু সব কিছু তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলেছেন, আপন সুখের চেয়ে বৃহত্তর সুখ আমার কাম্য।

বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন তিনি। তাঁর ওপর আক্রোশে শাসকশ্রেণী তাঁর ভাই ও বোনকে গ্রেপ্তার করেছে। অত্যাচার চালিয়েছে তাদের ওপর। কিন্তু কেন এই অত্যাচার, যারা অত্যাচার করেছে তারাও জানেনা কেন ?

তেমনি আজকের সশস্ত্র সংগ্রামের পথে শ্রীকাকুলামের মানুষ নিজেরা নামেনি। নামতে বাধ্য হয়েছিল তারা। ১৯৬৭ সালের ৩১ শে অক্টোবর লেভিডি অঞ্চলে দুজন কমরেডকে হত্যা করল বিনা কারণে। হয়তো কারণ ছিল, তা হল পার্টির আদর্শ প্রচার। কুড়ি বছরের সংসদীয় পথ যে গরীব সর্বহারাদের কিছুই করেনি তা শুধু প্রমাণ সহ দেখিয়ে দিচ্ছিল জনগণকে। দেখাচ্ছিল কুড়ি বছর আগে যার শুধুমাত্র কয়েক বিঘা জমি ছিল, কুড়ি বছরের মধ্যে তার কয়েক শো বিঘা জমি হল কেমন করে ? কেমন করে কুড়ি বছরে ধনী আরো ধনী, গরীব আরো গরীব হল ! কোন পথে ? কাজের পরিশ্রমের ফসলে, বুকের রক্তের বিনিময়ে ?

শ্রীকাকুলামের গিরিজনরা (পাহাড়ী) কেমন ভাবে দিনের পর দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। তাদের শ্রমের ফসল অন্যায় ভাবে লুঠে নিয়ে মুনাফার পাহাড় জমাচ্ছে জমিদার আর মুনাফাবাজের দল। কোন পথে, কেমন করে তারা ফাঁকি দিচ্ছে নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষগুলিকে !

মানুষ জাগতে লাগল। তাদের পরিশ্রমের ফসল যে অন্যায়ভাবে ঠকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, বুঝতে পারল তারা। প্রতিবাদ জানাল। দাবী করল ন্যায্য মূল্য।

খেপে উঠল জমিদার মহাজনের দল। দুজন কর্মীকে গুলী করে হত্যা করল তারা।

এই ঘটনার পর গিরিজন কৃষকরা ক্ষোভে ফেটে পড়ল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল তাদের কণ্ঠ। পাপের শাস্তি বিধান করল নিজেদের হাতে। সুরু হল গিরিজন আন্দোলন।

কুখ্যাত জমিদার জোতদারের দল ভীত হল। নিজেদের সর্বনাশ প্রত্যক্ষ করল তারা। নিজেদের বাঁচাবার জন্য আবেদন জানাল তারা। স্বভাবতই শাসকশ্রেণী গিরিজন আন্দোলনের জঙ্গীপ্রকাশ দেখে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকল না। তারা সশস্ত্র ভাড়াটে বাহিনী প্রেরণ করল। ১৯৬৮ সালের ৩রা মার্চ সুরু হল দমন পীড়ন ও অত্যাচার।

মার খেল মানুষ। সহ্য করল অত্যাচার। তারপর সহ্যের সীমা অতিক্রম করার পর যখন বিপ্লবী জনতা পাল্টা মার সুরু করল, তখন নাগী রেড্ডীর দল বলল, এ অন্যায়। এভাবে বিপ্লব হয় না। এ পথ বিপ্লবের নয়। বিপ্লবের কথা শিখতে হবে পুঁথির পাতা পড়ে। সময় এখনো হয়নি। মিছিমিছি মরে লাভ কি? জীবনের দাম যে অনেক।

স্বাধীন ভারতবর্ষের মানুষ দিনের পর দিন না খেয়ে মরছে। দেখছে কেমন করে তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে জীবনীশক্তি, তবু প্রতিবাদ করবে না, বাধা দেবে না। বাধা দেওয়া অন্যায় হবে বৈকী!

আমরা ধনীর দ্বারে করাঘাত করবো, পায়ে মাথা খুঁড়বো; বলবো, দয়া কর আমাদের, ভিক্ষা দাও! বলবো, আমাদের মের না তোমরা। করুণা করে বাঁচতে দাও।

না।

এ বাঁচা, বাঁচা নয়, মৃত্যু। জীবনের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। যারা মানুষের মনুষ্যত্বকে অহমিকায় মত্ত হয়ে পদদলিত করতে দ্বিধা করে না তাদের ক্ষমা নেই। ক্ষমতার দম্ভে মত্ত অত্যাচারীদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু!

বুলেটের জবাব ওরা বুলেট দিয়েই দিয়েছিলেন। একদিন অতর্কিতে সংখ্যায় বহুগুণ শত্রুবাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লেন। প্রথমে পালাবার চেষ্টা করলেন ওঁরা। দেখলেন সব পথ রুদ্ধ। তখন ঘুরে দাঁড়ালেন ওঁরাও।

পুলিশবাহিনী বলল, পালাবার সব পথ আমরা বন্ধ করেছি, ধরা তোমাদের দিতেই হবে। তোমরা ধরা দাও আমাদের হাতে।

ওঁরা নীরব রইলেন।

কী, তোমরা ধরা দেবে না? জানতে চাইল ওরা।

তবু ওঁরা নীরব।

ওরা বলল, পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি তোমাদের। এর মধ্যে যদি বেরিয়ে এসে আত্মসমর্পণ না করো তাহলে গুলি চালাতে বাধ্য হবো আমরা।

সময় মাত্র পাঁচ মিনিট। ওঁরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। প্রত্যেকের মুখেই বিচিত্র এক হাসির রেখা ফুটে উঠল। সময় মাত্র পাঁচ মিনিট। বড় দীর্ঘ সময় এই পাঁচটা মিনিট!

পাঁচ মিনিট পরে আবার ওরা বলল, পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেছে। এখনো বলছি, তোমরা ধরা দাও। নাহলে আমরা এবার সত্যিই গুলি চালাবো।

এতোক্ষণ পুলিশ যেন ঠাট্টা করছিল! এবার সত্যিই ওরা গুলি চালাবে! কিন্তু ওকি! হঠাৎ গুলির শব্দ কেন? মুখ থুবড়ে

পড়ে গেল কেন একজন রাইফেলধারী পুলিশ! আর একজন···
আরো একজন!

পুলিশের হাতেও গর্জে উঠল রাইফেল। অসংখ্য আগ্নেয়াস্ত্র একসঙ্গে বুলেট বৃষ্টি করছে। ধোঁয়া, বারুদের গন্ধ। মাঝে মাঝে আহত পুলিশের আর্তনাদ।

ওঁরা নীরব। পুলিশের দল ওঁদের কোন আর্তনাদ শুনতে পেল না।

জীবনপণ সংগ্রাম! শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন ওঁরা। তারপর এক সময় ক্ষত-বিক্ষত দেহে ধীরে ধীরে ঢলে পড়েছিলেন মৃত্যুর কোলে, কিন্তু ওঁদের মুখে কোন বেদনার চিহ্ন ছিল না।

যুদ্ধ শেষ হতে পুলিশের দল ছুটে গিয়ে দেখল, ওঁরা গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত : মুখে মৃদু হাসির প্রসন্ন প্রকাশ!

ওঁরা হাসতে হাসতে বরণ করেছেন মৃত্যুকে!

শত্রুবাহিনীর হাতে ধরা পড়লেন ওঁরা কজন। কমরেড সুব্বারাও পানিগ্রাহী, স্বরস্বতী আম্মা, রমেশ সাহু, উন্‌কা আম্মা, নির্মলা কৃষ্ণমূর্তি ও উম্মা রাও।

শত্রুকে বাধা দেওয়া বা যুদ্ধ করার সুযোগ তাঁরা পেলেন না। অসহায়ভাবে লোহার হাতকড়ি পরতে হল হাতে। ওঁদের গ্রেপ্তার করে সগর্বে ফিরে গেল পুলিশবাহিনী।

অন্ধকার সেলে বন্ধু এল ওঁদের কাছে। বলল, কেমন আছেন মিঃ পানিগ্রাহী?

কমরেড পানিগ্রাহী চাইলেন তার দিকে। স্বভাবসিদ্ধ শান্তকণ্ঠে বললেন, আমার কেমন থাকার সংবাদটি তো আমার চেয়ে আপনারাই ভাল জানেন।

এখানে থাকতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো আপনার ?

হাসলেন কমরেড পানিগ্রাহী, বললেন, আপনাদের অতিথি আমি নই, এতএব ভাল মন্দের সংবাদ নেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা।

হাসল বন্ধু! বলল, আপনি যা বললেন তা হয়তো সবই সত্য, কিন্তু আপনাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে সত্যই শ্রদ্ধা করি। আপনার নাটক কবিতা পাঠ করতে আমি ভালবাসি।

আমি ভালবাসি আমার দেশকে, জনগণকে।

আপনার উপযুক্ত কথা। আপনার কাছ থেকে দেশ অনেক কিছুই আশা করে।

দেশের মানুষের সত্যকারের আশা পুরণের ব্রতই তো নিয়েছি।

সেটা কী ?

একমুঠো ক্ষুধার অন্ন।

কিন্তু আপনি তো কবি ?

প্রয়োজনে কবিও সৈনিক হতে বাধ্য হয়। প্রয়োজন অনুভব করেছি তাই মসী ছেড়ে অসি ধরেছি। অন্নহীন মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার শপথ নিয়েছি

বন্ধু হাসল তাঁর কথা শুনে। বলল, এ আপনি ঠিক করেন নি।

আপনাদের বিচারে ?

আপনার কাজের বিচার বা সমালোচনা করি এত বড় দুঃসাহস আমার নেই। কিন্তু আমার মনে হয় আপনি ভুল পথে চলছেন। এ পথ—পথ নয়।

আপনি জানেন সত্যকারের পথ কোনটা ?

আমি ? চিন্তা করেছিল বন্ধু। বলছিল, আপনি ও পথ ত্যাগ করে চলে আসুন।

কোথায় যাবো ?

যে পথে যাচ্ছিলেন। আপনার ভাবনা কি? আমি জানি সৌভাগ্য বারবার আপনাকে ধরা দিতে চেয়েছে। আপনি ধরা দেন নি। আপনি···

হেসেছিলেন কমরেড পানিগ্রাহী। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন ধরা দিইনি বলতে পারেন?

কেন?

জানেন না। কিন্তু আমি জানি। আপনি বলতে পারেন আমরা স্বাধীন না পরাধীন?

কেন সবাই জানে আমরা স্বাধীন।

সবাই জানে আমরা স্বাধীন! বিদ্রূপ করে উঠেছিল কমরেডের কণ্ঠ। বলেছিলেন, সবাইকে জানানো হয়েছে আমরা স্বাধীন। আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। কিন্তু কেমন সে স্বাধীনতা? শুধু ইংরাজ চলে গেল বলেই আমরা স্বাধীন হয়েছি। কিন্তু, আমাদের জীবন থেকে—যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছি কি আমরা? অবাধ নিষ্ঠুরভাবে গরীবকে ধনীর শোষণের নামই কি সমাজতন্ত্র? যে সমাজে উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্রের ব্যবধান, অবিচার অত্যাচার, পীড়ন চলে, অন্যায় ভাবে মুনাফা লোঠে ধনীর দল, গরীবরা মার খায় দিনের পর দিন, প্রতিকার নেই, প্রতিবাদ জানানো অন্যায়, মানুষে মানুষে বন্ধু-আত্মীয়ের সম্পর্ক নয়; শোষক এবং শোষিত শ্রেণী, তার নাম তো স্বাধীনতা নয়! প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে সেদিন, যেদিন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, থাকবে না অন্যায় অত্যাচার, শেষ হবে অত্যাচারীর দল। সেই দিন আমরা স্বাধীন হবো। মুক্ত কণ্ঠে গাইবো স্বাধীনতার জয়গান। সেই পথেই চলেছি আমি। আমি সত্য পথের পথিক।

কিন্তু ভুল করছেন আপনি।

এই ভুলটুকুই আমি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছি। ভুলের সংশোধন হয়, অন্যায়ের হয় না।

ও পথ আপনি ছেড়ে দিন।

ছাড়তে বললেই কি ছাড়া যায়?

পার্টিকে অস্বীকার করুন আপনি।

তারপর?

যদি আমার প্রস্তাবে রাজি না হন…

তাহলে আমাকে হত্যা করা হবে, এই তো? হেসেছিলেন কমরেড পানিগ্রাহী। বলেছিলেন, চেয়ারম্যান বলেছেন, "আমাদের সামনে হাজার হাজার শহীদ বীরত্বের সঙ্গে জনগণের স্বার্থে প্রাণ দিয়েছেন। তাদের সে পতাকা ঊর্দ্ধে তুলে আসুন আমরা এগিয়ে চলি, তাদের রক্ত চিহ্ন বেয়ে।" আমরা তাঁর প্রতিটি কথা বিশ্বাস করি। আমাদের মৃত্যুও ব্যর্থ হবে না কখনো। পার্টিকে অস্বীকার করার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।

এই আপনার শেষ কথা?

আমাদের প্রথম ও শেষ কথা বলে তো কিছু নেই। আমার মত এক-পথের কোন পরিবর্তন হয় না। আমরা শোধনবাদীদের মত মিথ্যার বেসাতী করি না। আমরা জানি, মূল্য ছাড়া বিপ্লব হয় না এবং এ মূল্য রক্তের মূল্য, জীবনের মূল্য। এই হচ্ছে বিপ্লবের নিয়ম। বৃথা চেয়ারম্যান মাও আমাদের শেখাননি, "সংগ্রামে বলিদান অনিবার্য, মানুষের মৃত্যু স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা যদি জনগণের স্বার্থ এবং সংখ্যাধিক জনগণের দুঃখ-দুর্দশা মনে রেখে জনগণের জন্য মৃত্যুবরণ করি তাহলে আমাদের মৃত্যু সার্থক হবে।"

তাহলে বাঁচতে আপনি চান না?

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, বাঁচতে কে না চায় বলুন? কিন্তু যাদের জন্যে আমরা বাঁচতে পারছি না তাঁদের নিশ্চিহ্ন করে মানুষের মত বাঁচতে চাই আমরা।

চলে এসেছিল বন্ধু। কিন্তু চেষ্টা ছাড়েনি। সকলের কাছেই ঘুরেছিল। প্রস্তাব রেখেছিল, তাঁরা যদি তাঁদের পার্টিকে অস্বীকার করেন, তাঁরা যদি লিখে দেন যে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)'র সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নেই, তাহলে তাঁদের হত্যা করা হবে না।

কমরেড নির্মলা কৃষ্ণমূর্তি বলেছিলেন, জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলার আগে অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও আপনার কণ্ঠটা কাঁপবে বলে আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু দেখলাম এতটুকু কাঁপল না আপনার কণ্ঠ।

আমি সত্যিই আপনাদের মঙ্গল চাই।

জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ?

আমি শুধু পার্টির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলেছি।

পার্টি এবং জনগণ কী ভিন্ন ?

আমার মনে হয়……

আপনার মনে হওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। হেসেছিলেন কমরেড নির্মলা। বলেছিলেন, লেনিন একসময় তাঁর পার্টি প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে লেখেন, 'বলশেভিক প্রতিনিধিদের চমৎকারিত্ব কথার ফুলঝুরিতে নয়, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবি বৈঠকখানায় হাজিরা দেওয়ায় নয়……, বরং শ্রমিক জনগণের সঙ্গে সম্পর্কে, সেই জনগণের মধ্যে আত্মোৎসর্গী কর্মে, অবৈধ প্রচারক ও সংগঠকের মামুলী, অদৃশ্য, গুরুভার, করতালিহীন, অতি বিপজ্জনক কাজ চালিয়ে যাওয়ায়।' পার্টিকে অস্বীকার করার অর্থই হল জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা।

তাহলে……

বন্ধুর অসমাপ্ত জিজ্ঞাসার উত্তর দেননি কমরেড নির্মলা। উজ্জ্বল হাসিতে ভরিয়ে তুলেছিলেন মুখখানি।

পার্টির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজি হননি কেউই। ওদের সমস্ত চেষ্টা, কৌশল ব্যর্থ হয়েছে। ওরা বিচলিত হয়েছে। ভেবে পায়নি এমন অটুট মনোবল কোথায় পেলেন ওঁরা।

এ বিশ্বাস লাভ করেছেন ওঁরা দেশ আর জাতির কাছে। ভারতের বিপ্লবী ঐতিহ্যের কাছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস চিরকাল সংগ্রামেরই ইতিহাস। সেই অতীত কাল থেকে অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে চিরকাল ব্যাপক সংগ্রাম করে এসেছে জনগণ। ওঁরাও তো সেই বিপ্লবী জনগণের একজন। ওঁরা অনুসরণ করেছেন সেই পথ, যে পথ হাজার হাজার শহীদের রক্তে চিহ্নিত, ওঁরা বিশ্বাস রেখেছেন ভবিষ্যতের ওপর। ওঁরা আত্মোন্নতিকে ঘৃণা করেন। জনগণের মুক্তি ওঁদের জীবনের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান লক্ষ্য। ওঁরা বিশ্বাসী বিপ্লবে।

বিপ্লব আনবে মুক্তি! নতুন দিনের সূর্য!

বধ্য ভূমিতে জহ্লাদদের উদ্যত রাইফেলের সামনে ওঁরা দাঁড়িয়ে। মুখে ভয়ের চিহ্ন নেই, চোখে নেই মৃত্যু ছায়া। ওঁরা নির্ভিক, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা।

শেষবারের মত প্রশ্ন করল জহ্লাদের দল, এখনও সময় আছে। বল, কি করবে তোমরা?

ওঁরা হাসছেন!

তোমরা বাঁচতে চাও না?

নিশ্চয়ই চাই। আমরা বাঁচবো। বেঁচে থাকবো চিরদিন। শত-সহস্র, লক্ষ-কোটি মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকবো আমরা। মৃত্যু আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না।

তোমরা……

আমরা জনগণের। তোমাদের সাধ্য কি আমাদের মারো?

একের পর এক গর্জে উঠল জহ্লাদদের হাতের রাইফেল। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো ওঁদের দেহগুলি। শেষবারের মত ধ্বনীত হল ওদের মিলিত কণ্ঠ :

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) জিন্দাবাদ !

গেরিলা দল গঠন :

গেরিলা দল সম্পূর্ণ গোপনে গড়তে হবে। এই দলকে সেইরকম স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকেও গোপন রাখা উচিত যাদের সজাগতা এখনও প্রয়োজনীয় মানে উঠতে পারে নি, এমন কি সেই সব পার্টি ইউনিটগুলো থেকেও গোপন রাখতে হবে, যে সব ইউনিট-গুলো এখনও বে-আইনী কাজকর্মের পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ব করতে পারে নি।

এই দল গঠন করার পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে চক্রান্তমূলক। রাজনৈতিক পার্টি ইউনিটগুলোর মিটিংএও এই চক্রান্তের কোন রূপ দেওয়া চলবে না। এটা হওয়া উচিত ব্যক্তিগত ও জনে জনে চক্রান্ত। বুদ্ধিজীবি কমরেডকেই এ ব্যাপারে যথাসম্ভব উদ্যোগ নিতে হবে। সেই কমরেডটি, তার ধারণার সবচেয়ে সম্ভাবনা আছে, এমন একটি গরীব কৃষকের কাছে যাবে ও কানে কানে বলবে, "এরকম এরকম জোত-দারকে খতম করলে কি ভাল হয় না?" এইভাবে গেরিলাদের একজন একজন করে গোপনে বেছে একটি দল সংগঠিত করতে হবে।

এগুলো করার আগে জনগণের মধ্যে, বিশেষ করে গরীব কৃষকদের মধ্যে, সশস্ত্র ক্ষমতা দখলের কথা বেশ কিছু পরিমাণে প্রচার করে নিতেই হবে। কিন্তু গেরিলা আক্রমণ সুরু হওয়ার আগেই একটা গভীর প্রচারের প্রয়োজনীয়তার ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়াটা ভুল। ক্ষমতা দখলের কথা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে রাখতে হবে অর্থাৎ কৃষকদের জাগাতে হবে এবং তাদের নিজেদের গ্রামগুলিকে মুক্ত করার ওপর জোর দিতে হবে। তাদের নিজের নিজের এলাকায় স্থানীয়ভাবে ক্ষমতা দখল করতে হবে যাতে সামন্ত

শোষক নয়, কৃষক জনতাই তাদের স্থানীয় সব ব্যাপারগুলোর একমাত্র মিটমাট করার অধিকারী হতে পারে। এই জন্যই আমাদের স্থানীয় শ্রেণীশত্রুদের নির্মূল করার কাজ দিয়ে সুরু করতে হবে। একবার শ্রেণীশত্রুর হাত থেকে এলাকাকে মুক্ত করতে পারলে (কাউকে মেরে, কেউ পালিয়ে গেলে) অত্যাচারী রাষ্ট্রযন্ত্রের চোখ কানা হয়ে যাবে। তার ফলে পুলিশ জানতে পারবে না কে গেরিলা আর কে গেরিলা নয় এবং কে নিজের জমি এবং কে জোতদারের জমি চাষ করে। (তাতে এমনকি ভূমিসংস্কারের কাজগুলোও জনগণের রাষ্ট্রক্ষমতার অঙ্গ হিসাবে একটা বিপ্লবী সমিতির তত্ত্বাবধানেই হতে পারে।)

গেরিলা দলকে অবশ্যই ছোট, জোটবদ্ধ ও সচল হতে হবে। সুতরাং এর সদস্য সংখ্যা সাধারণতঃ সাতজনের বেশি হওয়া উচিত নয়। সাধারণতঃ একটা দলে গেরিলা সদস্যদের যাচাই-এর মান হবে এই দলটি প্রচলিত সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আচমকা আক্রমণে একটা বা দুটো লোককে খতম করতে পারে কি না।

এই খবরাখবরগুলো অবশ্যই দলের বাইরে প্রকাশিত হওয়া উচিৎ নয়--

(ক) গেরিলাদের নাম

(খ) বিশেষ শত্রু যাকে নির্মূল করার চক্রান্ত করা হয়েছে

এবং (গ) আক্রমণের সময় ও তারিখ

নেতা :

দলটি গঠন হওয়ার পর একজন কম্যাণ্ডার নিয়োগ করা দরকার।

অনুসন্ধান :

বিশেষ শ্রেণীশত্রু, যার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে তার প্রতি স্থানীয় কৃষক জনসাধারণের অধিকাংশের ঘৃণা জাগিয়ে তোলা উচিৎ। এবং এর জন্যই তাদের মতামত জানার উদ্দেশ্যে একটা ছোটখাট

খোঁজ খবরের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ মোদ্দা কথা হল লক্ষ্য স্থির করার সময় আমাদের কোনো মনগড়া ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। বরং জনগণের অধিকাংশের ইচ্ছার দ্বারা চালিত হতে হবে। লক্ষ্য স্থির করার পর শ্রেণীশত্রুর চলাফেরা খুব নিখুঁত-ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে আক্রমণের সবচেয়ে ভালো সময় ও স্থান ঠিক করা যায়। অনুসন্ধানের এই কাজটি বিশেষ করে দলের নেতারই করা উচিৎ।

আশ্রয় স্থল :

নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে গেরিলা কাজের আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজটাকে সবচেয়ে যত্নে সবচেয়ে মনোযোগ নিয়ে অবশ্যই করতে হবে। গেরিলাদের বেলায় প্রত্যেককে কোন লোকের বাড়ি, যার ওপর তার সবচেয়ে বেশি আস্থা আছে সেখানেই তার নিজের আশ্রয় নিজেকেই করতে হবে। অন্য কারোরই এই কাজ তার জন্য করে দেওয়া উচিৎ নয়।

একজন কৃষকের পক্ষে কৃষক জনতার মধ্যে গোপনে লুকিয়ে থাকা সম্ভব। এটা কিন্তু কোন সন্দেহভাজন বুদ্ধিজীবি কমরেডের পক্ষে মোটেই সহজ নয়। এই ব্যাপারে সে সবচেয়ে অসুবিধার মুখোমুখি হয়। সুতরাং তার আশ্রয় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এবং নিরাপদ জায়গায় ঠিক করা উচিত। আশ্রয়স্থলগুলো গেরিলা আক্রমণের জায়গা থেকে দূরে বিভিন্ন গ্রামে আলাদা আলাদা করে ঠিক করা উচিৎ। শহরে একটা বাড়িতে একজন পাশের প্রতিবেশীকে জানতে না দিয়েও গোপন থাকতে পারে। কিন্তু গ্রামে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। সেইজন্য যে বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে তার চারিপাশে আমাদের কাজকর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল লোকের বাড়ি থাকা উচিৎ।

অস্ত্র :

এই স্তরে কোনরকম আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা উচিৎ নয়। গেরিলা ইউনিটকে সম্পূর্ণভাবে দা, বল্লম, সড়কি, কাস্তের ওপর আস্থা রাখতে হবে। দেশী বন্ধুক কেনা বা তৈরি করার ওপর জোর দেওয়া অথবা শ্রেণী শত্রুর কাছ থেকে বন্ধুক দখল করার ঝোঁক দেখা দিতে পারে এই ঝোঁকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে ধৈর্যের সঙ্গে। এই কথা বুঝিয়ে বলতে হবে, আমরা এই পর্যায়ে যদি কিছু বন্ধুকও পাই তাহলে তা রক্ষা করতে আমরা সক্ষম হবো না। এগুলো প্রায় অবধারিতভাবে পুলিশের হাতে চলে যাবে। যদি তা সত্বেও কিছু বন্ধুক জোগাড় হয়ও, আমরা তা নিশ্চয়ই নষ্ট করবো না বা শত্রুর হাতে তুলে দেবো না বরং ভবিষ্যতের জন্য লুকিয়ে রাখবো এবং এর নিষ্ফল ব্যবহারে বাধা দেবো।

বুদ্ধিজীবি ক্যাডার এবং ঐ সমস্ত নেতারা যাদের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘুরে বেড়াতে হয়, তাদের যদি হঠাৎ শত্রু ঘিরে ফেলে তা হলে তাদের ভয় দেখান, ছত্রভঙ্গ করা অথবা মেরে ফেলার জন্য, তারা সঙ্গে ছোট পিস্তল রাখতে পারেন। কিন্তু এর ওপর কখনও অযথা গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ নয়, কারণ এটা জনগণের বদলে অস্ত্রের ওপর এক বিপজ্জনক আস্থা রাখতে উৎসাহ যোগাতে পারে।

পরিকল্পনা :

অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে গেরিলা দলের সঙ্গে একসঙ্গে বসে, এইবার বুদ্ধিজীবি কমরেডটিকে গোটা কাজটা, পিছিয়ে আনার পথগুলো এবং কখন ও কোথায় পরে দেখা হবে সেগুলো খুব বিস্তারিতভাবে সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা করতে হবে।

আক্রমণ :

যথাসম্ভব নিরীহ লোকের ভাণ করে গেরিলারা বিভিন্ন দিক থেকে আসবে। আগে ঠিক করা একটা জায়গায় এসে মিলবে। শত্রুর

জন্যে তারা অপেক্ষা করবে এবং যখন সুযোগ আসবে তখনই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে ও শত্রুকে খতম করবে।

আমরা কখনও অধৈর্য হব না বা তাড়াহুড়ো করবো না, বিশেষ করে প্রথম আক্রমণের ক্ষেত্রে, যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাড়াহুড়ো করে আক্রমণ করে বিফল হওয়ার চেয়ে আমাদের কয়েকটা প্রচেষ্টার জন্যে তৈরি থাকতে হবে. প্রথম কয়েকটা কাজে শত্রুর বাড়ি চড়াও হওয়া এবং অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা কষ্টকর হতে পারে সুতরাং তাকে খুন করার ওপরই কেবলমাত্র বেশি জোর দেওয়া ভালো। পরবর্তী সময়ে যখন জনগণ জেগে ওঠে এবং বিভিন্ন কাজে অংশ নেয়, আক্রমণগুলো নিয়মিত, আরও সহজ, আরও জোরদার হয়, তখন শত্রুকে তার ঘাঁটিতেও খুন করা এবং তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যায়। অবস্থার ক্রমে এত উন্নতি হবে যে একটা গেরিলা কাজের শেষে গেরিলারা নিজেরাই জনগণের কাছে বক্তৃতা করতে, এই কাজের গুরুত্ব বোঝাতে এবং হাতে অস্ত্র নিয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁরা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতেও পারবেন। আক্রমণের পর ধনী কৃষক ক্যাডার যদি থাকে এবং যদি সে ইচ্ছুকও থাকে তবুও তাকে বাদ দিতে হবে। মধ্য কৃষক ক্যাডার এবং বুদ্ধিজীবি কমরেডদেরও সম্ভব হলে বাদ দেওয়া উচিৎ। এরকম ঘটনা বেশি বেশি ঘটলে ক্রমে এইসব ইচ্ছুক লড়াকুদের টেনে আনতে হবে। বস্তুত একটা সময়ে আওয়াজ উঠবে, "যে শ্রেণীশত্রুর রক্তে নিজের হাত রাঙায়নি, সে কমিউনিষ্ট নামের উপযুক্ত নয়।"

ছত্রভঙ্গ :

আক্রমণের পর গেরিলাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে এবং তাদের আশ্রয় নিতে আদেশ করতে হবে। সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করে ফেলতে হবে।

লড়াকুদের মনোবল অটুট রাখার জন্যে দলটির সঙ্গে ঘন ঘন

নিয়মিত এবং গোপনে দেখা করতে হবে। প্রথম আক্রমণের পরে তাদের মনে যে ভয় জাগবেই তাকে রাজনীতি এবং উৎসাহপূর্ণ গল্প দিয়ে তাড়াতে হবে।

রাজনৈতিক কার্যকলাপ :

সম্পূর্ণ শান্ত, কিছু একটা ঘটবে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। জনগণ যদিও অবশ্যম্ভাবীভাবে উৎসাহিত হবে, তবুও তারা তখন দ্বিধাগ্রস্ত এবং নিরপেক্ষ থাকবে। তখন রাজনৈতিক ক্যাডার এবং ইউনিটগুলো গা ঢাকা দিয়ে খুব সন্তর্পণে এগোতে থাকবে। মুখে মুখে প্রচার করে এবং এই কাজের কর্মসূচী বুঝিয়ে বলে আস্তে আস্তে তারা জনগণের ঠাণ্ডা ভাবকে কাটিয়ে তুলবে। এবং তাদের আমাদের দিকে সুনিশ্চিতভাবে জয় করবে এবং তাদের সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতা আদায় করে নেবে।

রাজনৈতিক ক্যাডার বরং নিরপেক্ষ লোকের মত ফিসফিস করে বলা সুরু করবে, "পাজিটা খতম হয়েছে, বেশ ভাল হয়েছে। যারা এটা করেছে তাদের বাহবা। সত্যি একটা বীরের মত কাজ হয়েছে। এইভাবে সবগুলো খতম হয়ে যাক্ এবং ওদের ছেড়ে যাওয়া এলাকা আমাদের নিজেদের হবে। এ সমস্ত জমি, এ সমস্ত ফসল, ধনসম্পদ আমরা পাবো. কারণ এই সব বদমাইসগুলো যদি এখানে না থাকে, তবে পুলিশ কি করে জানবে কার জমি কে চাষ করে?" যে মুহূর্তে জনগণ এতে সাড়া দিতে সুরু করবে রাজনৈতিক ক্যাডাররা ক্রমে অনেক বেশি সাহসী হবে এবং ছোট গোপন গ্রুপ মিটিং করবে।

এক্ষেত্রে যে বুদ্ধিজীবি ক্যাডারটি, যে গোপনে অবস্থাটির বিচার করছিল সে সাহস করে তার সাহসী দলটাকে নিয়ে বেরিয়ে আসবে এবং জনগণকে জাগানোর জন্য সভা করবে। এই পর্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তখন পর্যন্ত গেরিলাদের ভয় ভয় ভাব থেকে মুক্ত

করার জন্য যতই চেষ্টা করে থাকুক না কেন, তার সম্পূর্ণভাবে সফল হওয়া সম্ভব হয়নি কিন্তু এখন বীব লড়াকুরা যখন জনগণের মধ্যেই অবস্থান করবে, যেখানে তাদেব নিজেদের শ্রেণীভাইরা তাদের সহযোগিতা প্রশংসা এবং ভালবাসা জানাচ্ছে, তাদের কাঁধ চাপড়াচ্ছে এবং তখন তাবা নতুন উৎসাহে উদ্দীপিত হয় এবং শত্রুর ওপর ঘৃণা বাড়ে দ্বিগুণ। তারা তখন নতুন পরিকল্পনা ফাঁদে, নতুন লক্ষ্য ঠিক করে এবং নতুন ইউনিট গড়ে। তাদের প্রত্যেকে তখন হয় আগুনে পোড়া ইস্পাত—প্রত্যেকে তখন একাহাতে দশটা শত্রু মারতে পারে।

পুনর্জমায়েত :

গেরিলাদের মনোবল এখন আকাশ ছোঁয়া। তারা নতুন আক্রমণের জন্য উদ্‌গ্রীব, জনগণ জাগছে, তারা তাদের বীর গোষ্ঠীর চারপাশে জমায়েত হতে এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সুরু করেছে। তাবাও নতুন আক্রমণ চায়। তারা উৎসুক চিত্তে এ-শত্রু ও-শত্রুকে চিনিয়ে দিচ্ছে, নতুন লক্ষ্যের পরামর্শ দিচ্ছে। তারা তখন শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য এগিয়ে আসে এবং দলটিকে গুরুত্বপূর্ণ খোঁজখবর সরবরাহ করে। স্বভাবতই পরবর্তী কাজকর্মগুলো আরও বেশি মনোবল ও আরও বেশি শক্তিশালী গণসমর্থন নিয়ে অপেক্ষাকৃত অনুকূল আবহাওয়ায় ঘটতে থাকবে কিন্তু গোপনতার নিয়মাবলী কখনও ভাঙা চলবে না।

গেরিলাগ্রুপটি একসঙ্গে বসে এবং জনগণের পরামর্শ অনুযায়ী ও তাদের দেওয়া খোঁজখবরের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী শ্রেণীশত্রুকে খতম করার পরিকল্পনা নেয়।

পরবর্তী আক্রমণ ঘটে এবং এইভাবে একনাগাড়ে এর বিস্তার বাড়িয়ে নতুন গেরিলা দল সৃষ্টি করে এবং আঘাত করার নতুন নতুন জায়গা বাড়িয়ে তুলে এই প্রক্রিয়া ঘুরতে থাকে। জনগণেব

সক্রিয়তা এবং সমতা গ্রহণ প্রত্যেক নতুন নতুন আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় এবং স্থানীয় শ্রেণীশত্রুদের ওপর সন্ত্রাসের রাজত্ব চেপে বসে।

যখন কয়েকটি আক্রমণাত্মক কাজ ঘটছে এবং শ্রেণীশত্রুকে নির্মূল করার বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইন বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, প্রয়োগ এবং কাজের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক ইউনিটগুলো ফিস ফিস করে ব্যাপক অর্থনৈতিক আওয়াজ তোলে, "শ্রেণীশত্রুর ফসল দখল করো"। এই কথা গ্রাম এলাকায় যাদুমন্ত্রের মত কাজ করে। এমন কি সবচেয়ে পেছিয়ে পড়া কৃষকও তখন এই যুদ্ধে নেমে পড়ে। কয়েকজন এগিয়ে থাকা অংশের দ্বারা সুরু করা ক্ষমতা দখলের লড়াই প্রচণ্ড জন উদ্যোগ ও গণকার্য-কলাপের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। জনযুদ্ধের আগুন সমগ্র গ্রাম এলাকাকে গ্রাস করে।

বিপ্লবী কৃষক কর্মীদের সঙ্গে এক বৈঠকে কমরেড চারু মজুমদার গ্রামাঞ্চলে গেরিলা "অ্যাকশন" সংগঠিত করা সম্পর্কে এই ব্যবহারিক উপদেশগুলি দেন :

বিপ্লবী ছাত্র ও যুবকদের কী করণীয় সে সম্পর্কে তিনি বলেন :

এদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যাতে তারা গরীব-কৃষক-শ্রমিক জনগণকে হেয় চোখে দেখে, যাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সব-কিছুরই ওপর তারা শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে, তাদেরই সেবাদাস বা অনুচর হয়ে ওঠে। তাছাড়া, আঠারো থেকে চব্বিশ বছর বয়সটাতে মানুষ সারাজীবনে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রমী, উৎসাহী, নির্ভীক ও আদর্শনিষ্ঠ হতে পারে। অথচ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় সেই বয়সটাতেই যুব-ছাত্রদের এই জনবিরোধী লেখাপড়ার পরীক্ষায় পাশ করার জন্য ব্যস্ত রাখা হয়। তাই চেয়ারম্যান বলেছেন : যতো বেশি পড়াশুনা করবে, ততো বেশি মূর্খ হবে। আমি সবচেয়ে খুশি

হবো যদি তোমরা এই পরীক্ষা পাশের জন্য নিজেকে অপচয় না করে আজই বিপ্লবী সংগ্রামের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো। চীনের যুব ছাত্র-সমাজও মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সুরুতে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বর্জন করে। সেগুলো আবার চালু হয় প্রায় দু বছর বাদে ১৯৬০ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিজয়ের সময়ে।

চেয়ারম্যান বলেছেন: সত্যিকারের লৌহ প্রকার কি? তা হচ্ছে জনসাধারণ, কোটি কোটি জনসাধারণ, যাঁরা বিপ্লবকে অকৃত্রিম-ভাবে ও আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন। এটাই হচ্ছে প্রকৃত লৌহ প্রকার, এটাকে বিনাশ করা যে কোন শক্তির পক্ষেই অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব। প্রতিবিপ্লবী শক্তি আমাদের বিনাশ করতে পারে না, আমরাই বরং তাদের বিনাশ করব।

কমরেড চারু মজুমদার তাঁর "সংশোধনবাদের নির্দিষ্ট প্রকাশগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করুন" প্রবন্ধে লিখেছেন,—"বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রভাব আমরা আরও দেখি মানুষের চেয়ে অস্ত্রের উপর আমাদের বেশি নির্ভরতায়। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, চেয়ারম্যান মাও-এর শিক্ষা, কমরেড লিন পিয়াও এর শিক্ষা: অস্ত্রের চেয়ে মানুষ বড়। অত্যাচারীত, উৎপীড়িত কৃষক খালি হাতেই এবং হাতের কাছে বা পায় তাই নিয়েই শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামে এবং সংগ্রামের প্রয়োজনে, বিপ্লবের তাগিদে, সে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয় শাসকশ্রেণীর হাত থেকে। এইভাবেই গড়ে ওঠে জনতার সশস্ত্রবাহিনী। বাইরে থেকে অস্ত্র নিয়ে এসে বিপ্লবী যুদ্ধ করা যায় না; কারণ বিপ্লবী যুদ্ধে, চেয়ারম্যান শিখিয়েছেন কেবল নির্ভর করতে হয় জনতার উপর।

"বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে জনসাধারণের যুদ্ধ। কেবলমাত্র জনসাধারণকে সমাবেশ করে এবং তাদের উপর নির্ভর করেই এ যুদ্ধকে চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। আমাদের অভিজ্ঞতাও বলে, উন্নত অস্ত্র দিলেই গেরিলা যুদ্ধ সুরু করা যায় না। সেই অস্ত্র ধারণ করার মত

মানুষ তৈরি করতে হয়। যতদিন সে মানুষ তৈরি না হচ্ছে ততদিন সে অস্ত্র অর্থহীন। সে মানুষ তৈরি হয় একমাত্র বিপ্লবী শ্রেণী-সংগ্রামের মারফতে, শ্রেণীশত্রুদের খতম করার মারফতে। এ কাজ যে গেরিলা ইউনিট করেনি, সেই ইউনিট বন্দুক নিয়েও কিছু করতে পারবে না।"

বিপ্লবী ছাত্র ও যুবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "বিপ্লবী কর্মীরা নিশ্চয়ই ভুল করতে পারে। আজকে ভুল কাজের সমালোচনা করা কমরেডদের সাহায্য করবার জন্য। সমালোচনা করো পার্টিকে গড়বার জন্য, ধ্বংস করবার জন্য নয়—পুরানো পার্টিতে আমাদের যা করতে হয়েছে। পুরানো পার্টি সংশোধনবাদী পার্টি, প্রতিবিপ্লবী পার্টি, সেখানে আমাদের সমালোচনা ছিল ভাঙ্গার জন্য, নতুন পার্টি বিপ্লবী পার্টি, এখানে আমাদের সমালোচনা গড়ার জন্য। কিন্তু ভুল যদি বার বার হয়, আগে তদন্ত করো। পার্টির বাইরে বিপ্লবী জনতার কাছে থেকেও তদন্ত করো। তার আগে কারু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার কোনও অধিকার তোমার নেই।"

আমরা বলি, "চীনের পথ আমাদের পথ।" "চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান।"

কিন্তু কেন? কেন, একথা বলি? শংকর প্রশ্ন করেছিল নিজেকে।

বিরাট দেশ—অথচ কোন ঋণ নেই। এই হল মহান চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিজয়ের একটি জীবন্ত নিদর্শন। চীনের মানুষ চেয়ারম্যানের উপদেশ, "স্বাধীনতা রক্ষা করে, নিজের উদ্যোগে নিজেদের শক্তি ও চেষ্টার 'পরে নির্ভরশীল হবে" গ্রহণ করেই এই আশ্চর্য সফলতা অর্জন করেছেন।

নতুন চীন ক্ষমতায় এসেছে মাত্র কুড়ি বছর আগে। প্রতিক্রিয়াশীল কুও মিনটাং চক্র দেশকে নিঃস্ব করে চম্পট দিয়েছিল। উৎপাদন ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে; কোটি কোটি মানুষ চরম দারিদ্রতার মধ্যে নিমগ্ন, মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যমূল্য আকাশ স্পর্শ করেছে—এমনি অবস্থায় ফেলে গেল চীনকে চিয়াং কাইশেক। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা এর চেয়ে আর কী খারাপ হতে পারে? লক্ষ কোটি টাকার দরকার দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে। কিন্তু কোথায় অর্থ?

দেশ মুক্ত হবার পূর্বে তিনি লিখেছিলেন, "আমাদের নীতি কি হবে? আমাদের নীতি হবে নিজের শক্তির ওপর দাঁড়ান। এবং তার অর্থ হল নিজের চেষ্টায় পুনর্জীবন লাভ করা।" তিনি আরও বলেছিলেন, "পৃথিবীতে সব থেকে দামী জিনিষ হল সাধারণ মানুষ। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ সমস্ত রকম আশ্চর্যজনক কাজ করতে পারবে।"

তিনি আত্মনির্ভরশীল হবার জন্য ডাক দিলেন।

চীন আজ সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উৎপাদনের ব্যক্তিগত মালিকানা সমাজতান্ত্রিক মালিকানায় রূপান্তরিত হচ্ছে। শ্রমিক ও কৃষক শোষণমুক্ত হয়ে উৎপাদনে নিজেরা উদ্যোগী হয়েছেন। এইভাবে আত্মনির্ভরশীলতার সাহায্যে বড় বড় কাজে হাত দেবার জন্যে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, সেগুলো দেশের অভ্যন্তরের উৎপাদন থেকে আসতে সুরু করল। এটা একটা কথাই নয় যে, সমাজতান্ত্রিক দেশ সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় উপনিবেশ থেকে লুণ্ঠন অথবা নোট ছাপিয়ে, ট্যাক্স বৃদ্ধি করে এবং জিনিষের দাম বাড়িয়ে অর্থ সংগ্রহ করবে। এতে নিজের দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের ওপর বোঝা চাপানো হয়। আবার সমাজতান্ত্রিক দেশ সাম্রাজ্যবাদীর দুয়ারে ভিক্ষাপাত্র হাতে দাঁড়াতে পারে না, যেমন প্রতিক্রিয়াশীল কুও মিনটাং সরকার করেছিল। এই ঋণ গ্রহণ মানে কৃতদাসে পরিণত হওয়া।

তাহলে সমাজতন্ত্র গঠনে কোন্ শক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে? নিজের দেশের মানুষের শক্তির ওপর, না বিদেশী "সাহায্যের" অর্থাৎ পুঁজিবাদীদের খপ্পরে আসা? সমাজতান্ত্রিক পথ, না, পুঁজিবাদী রাস্তা,—কোন্‌টা?

তিনি জোর দিলেন নির্ভুল, স্বাধীনতা রক্ষা করে নিজেদের শক্তির ওপর ভরসা রেখে অগ্রসর হতে। এই আত্মনির্ভরশীল নীতি গ্রহণ করার অর্থ নিজের দেশের মানুষের শক্তি ও কঠিন শ্রমের ওপর নির্ভর করে দেশকে গঠন করতে হবে, কষ্টসহিষ্ণু ও মিতব্যয়ী হয়ে।

কিন্তু পার্টির মধ্যে লুকিয়েছিল এক বিশ্বাসঘাতক, তার নাম লিউ শাও-চি। সে বেশ চাতুরীর সঙ্গে মাও-এর নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াল—সংশোধনবাদীরা যা করে থাকে—যাতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আবার দেশে স্থাপন করা যায়। বিদেশী সাহায্যে অর্থনীতির বুনিয়াদ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল। সে চেয়েছিল পুঁজিবাদী প্রথায় অর্থের ম্যানেজিং এজেন্সী চালু করতে। যার ফল হতো মুদ্রামূল্য হ্রাস,

মুদ্রাস্ফীতি ও লটারীর টিকিট বিক্রী ব্যবস্থা করা। লিউ শাও-চি ভেবেছিল শ্রমিক শ্রেণীকে দোহন করে প্রলেতারীয় ব্যবস্থা ভেঙে পুঁজিবাদী প্রথার প্রবর্তন করতে। আসল মতলব ছিল চীনকে আবার উপনিবেশ অথবা আধা উপনিবেশে পরিণত করার।

তিনি বছরের পর বছর যুদ্ধ করেছেন। শেষ পর্যন্ত মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্লাবনে প্রতিবিপ্লবী দুর্গ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। স্বাধীন, আত্মপ্রত্যয় নীতির ফলে চীনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। দেশ মুক্ত হওয়ার পর উৎপাদন বেড়েছে। সমস্ত ক্ষেত্রেই অগ্রগতির লক্ষণ সুস্পষ্ট।

অর্থনৈতিক ভিত্তি যতই দৃঢ়তর হচ্ছে, ততই সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে। রাষ্ট্রের রাজস্ব ও ব্যয় সমান তালে চলছে। রাজস্ব এখন মুখ্যতঃ দেশের অভ্যন্তর থেকেই আদায় হচ্ছে সমাজ-তান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুযায়ী।

অবশ্য গোড়ার দিকে জনগণতান্ত্রিক চীনে আন্তর্দেশীয় বণ্ড ছাড়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল জনগণের উদ্বৃত্ত অর্থের লগ্নি। এই বণ্ডের টাকা সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের জন্যে ব্যয় হয়েছিল। এই বণ্ডগুলির একটি 'জনগণের বিজয় বণ্ড' (People's Victory Bonds) ১৯৫০-এ এবং 'জাতীয় অর্থনৈতিক গঠন বণ্ড' (National Economic Construction Bonds) যেটা ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮তে বাজারে ছাড়া হয়েছিল। এই বণ্ডগুলির মোট মূল্য ছিল ৩,৮৪০ মিলিয়ন ইয়েন। সুদ নিয়ে এই অংশটা ছিল ৪,৮২০ মিলিয়ন ইয়েন। ১৯৬৮-র মধ্যেই এগুলি পরিশোধ হয়ে যায়। ১৯৫৮-র পর বাজারে আর কোন বণ্ড ছাড়া হয়নি। এবং জাতীয় বণ্ড সুদে আসলে সময়মত পরিশোধ করা হয়েছিল।

জনগণতান্ত্রিক চীনের প্রতিষ্ঠার পর মার্কিন আক্রমণ প্রতিরোধ ও উত্তর কোরিয়ার সাহায্যের জন্য চীনকে বৈদেশিক অর্থ

সাহায্য নিতে হয়েছিল মাত্র একবার। চীন সে সময়ে স্তালিন পরিচালিত সোভিয়েত দেশ থেকে মোট ১.৪০৬ মিলিয়ন নয়া রুবল ঋণ গ্রহণ করেছিল। এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সমস্ত ঋণের টাকা ১৯৬৫-তে পরিশোধ করে দেয়।

চীনের আভ্যন্তরীণ বণ্ড ও সোভিয়েত থেকে ঋণ গ্রহণ সাম্রাজ্যবাদী, অথবা সংশোধনবাদী অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল দেশসমূহের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের।

কারণ, চীন বণ্ড ও বৈদেশিক ঋণ নিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক গঠন কার্যের জন্য এবং শ্রমিক শ্রেণীর সুখ-সুবিধা দেওয়ার জন্য। এবং এই ঋণ গ্রহণ ও বণ্ড বিক্রী ছিল অল্প মেয়াদী ব্যাপার। ১৯৪২-৫২ তে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এবং উত্তর কোরিয়াকে সাহায্য করার জন্য যে ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছিল তাতে চীনকে খানিকটা অর্থনৈতিক বিপাকের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তথাপি চীন নতুন করে ঋণ গ্রহণ না করে নিজের দেশের উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে আত্মশক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সমাজতন্ত্র গঠনে নিমগ্ন হয়েছিল।

যখন সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা ঘরে বাইরে ঋণের জালে ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়েছে, তখন একমাত্র চীনই ভারমুক্ত—কোন ঋণ নেই।

পুঁজিবাদীদের শাসকচক্র রাষ্ট্রীয় যন্ত্র প্রয়োগ করে অতি মুনাফা অর্জন করে সাধারণ মানুষকে শোষণ করে। নিজেদের শ্রমিক শ্রেণীকে দোহন করতে পুঁজিবাদীদের কিছুমাত্র দ্বিধা বা সংকোচ নেই। তাদের বিদেশী ঋণ ও দেশী বণ্ড শ্রমিক শ্রেণীকে ঠকাবার জন্যই বাজারে ছাড়া হয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শাসকরা যে ঋণ গ্রহণ করে তা নিতান্তই প্রতিক্রয়াশীল। তারা বাজারে বণ্ড ছাড়ে, বিদেশের কাছে ঋণ নেয় কেবল যুদ্ধের খরচ সংগ্রহ করার জন্য।

ঋণের বেশির ভাগ অর্থই ব্যয় হয় যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুতে। এর ফলে একচেটিয়া ধনিক শ্রেণী দারুণ মুনাফা লোঠে। মরে সাধারণ শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঋণের বোঝা শ্রমিক শ্রেণীর ঘাড়ে এসে পড়েছে। ১৯১৩-তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বণ্ড ছাড়ার ফলে মাথাপিছু গড়ে ১৪ ডলার করে দিতে হয়েছিল সাধারণ শ্রমিককে। যুদ্ধ চলাকালীন সেটা বেড়ে উঠেছিল ৮০ ডলারে। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঋণের বোঝা এসে দাঁড়িয়েছিল ১,৩০০ ডলারে। বর্তমানে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে আমেরিকার সাধারণ নাগরিককে দিতে হচ্ছে ২.০০০ ডলালের ওপর।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী—যারা পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে সব থেকে ধনী, এদের সরকারী হিসাবেই স্বীকার করা হয়েছে, ১৯৬৮-র জুলাই পর্যন্ত তাদের আন্তর্দেশীয় ঋণের পরিমাণ ৩৫১৭০০ মিলিয়ন ডলার। অঙ্কটা নিজের দেশের মোট রাজস্বের দ্বিগুণ। বিদেশী ঋণের পরিমাণ ১৯৬৮-র মে পর্যন্ত ৩৩,১০০ মিলিয়ন ডলার।

ব্রিটেনের ঋণপত্র ছাড়ার দরুণ আজ ঘরোয়া ঋণ ৩৩,৫০০ মিলিয়ন পাউণ্ড। অর্থাৎ ১৯৬৮র মোট রাজস্বের তিনগুণ। আর বিদেশী ঋণ হল, ১৯৬৮র জুন পর্যন্ত ৫,৬০০০ মিলিয়ন পাউণ্ড।

সোভিয়েতের প্রদত্ত হিসাব মত ১৯৬৪-৬৬ তিন বছরে বাণিজ্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে ১,০০০ মিলিয়ন রুবল। এবং এ ঋণ পুঁজিবাদী দেশ থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

ভারত সরকারের গত বছরের (১৯৬৯) সরকারী বিবরণ থেকে জানা যায় জাতীয় ঋণের পরিমাণ ১১৯,৫০০ মিলিয়ন টাকা অর্থাৎ বার্ষিক রাজস্বের চার পাঁচ গুণ বেশি।

কিন্তু, চীনে কোন ঋণ নেই। না আন্তর্দেশী, না বিদেশের ঋণ। এবং এর মূলে, স্বাধীনতা রক্ষা, অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ, আত্মপ্রত্যয়, পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী হওয়া।

আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগে তিনি বলেছিলেন, "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, আমরা আমাদের অর্থনৈতিক অসুবিধা দূর করতে পারব। সমস্ত সমস্যার সমাধানের একটি মাত্র জবাবই আছে, নিজের হাতে সব কাজ করা।"

এই নীতি গ্রহণ করেই চীনের মানুষ তাদের দারিদ্রতা ও পিছিয়ে থাকার ছবির আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে; পুরাতন আধা ঔপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশকে স্বাধীন, আত্মনির্ভরশীল, আত্মপ্রত্যয়ী ও সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। এই অর্থনীতির দরুণই দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে ঋণের চিহ্ন মাত্র নেই।

চীনের আর্থিক আয় হচ্ছে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির স্রোত বেয়ে। রাজস্বের শতকরা নব্বই ভাগ পাওয়া যাচ্ছে রাষ্ট্রীয় শিল্প ব্যবস্থার দরুণ। মোট রাজস্বের শতকরা সাতভাগ আসছে কৃষি থেকে এর ফলে যেমন কৃষকের আয় বাড়ছে, তেমনি জীবনযাত্রার মানেরও উন্নতি হচ্ছে।

মূলধনের টাকা পাওয়া যাচ্ছে ব্যাঙ্কের আমানত থেকে। আর্থিক সঙ্গতি অত্যন্ত দৃঢ়। নোটের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল। জনসাধারণের যে সব দ্রব্য খুবই প্রয়োজনীয়--তার ওপর সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে-- যাতে দাম না বাড়ে।

শ্রমিকের বেকার হবার আতঙ্ক নেই। কৃষকের চিন্তা নেই শীতের ও অনাহারের। কাউকে আয়কর দিতে হয় না। শ্রমিক কর্মচারীর চিকিৎসার খরচ নেই—শ্রমিক বীমা প্রভৃতির জন্যেও ব্যয় নেই। বাড়িভাড়া ও অন্যান্য খরচ (আলো প্রভৃতি) নামমাত্র।

চেয়ারম্যানের নীতি হল: "আর্থিক অবস্থার উন্নতি কর, জিনিষের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখ।"

আমাদের আর্থিক অবস্থা দিন দিন উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে। ধনী আরো ধনী হচ্ছে—গরীব হচ্ছে ভিখারী। ভিখারীর জীবনই আজ সব চেয়ে উন্নত মানের। একমাত্র চিন্তা শুধু পেটের। পেটটুকু ভরলেই আর কোন বালাইয়ের ধার ধারে না। কারণ ভিখারীর ভোটাধিকার নেই। ভোটাধিকার না থাকার অর্থই হল মুক্তি। আমরা ক্রমশঃ মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছি।

অথচ একদিন আমাদের কী না ছিল! সুখ ছিল, শান্তি ছিল—ছিল সম্পদের ছড়াছড়ি।

ইতিহাস মিথ্যা বলে না। দীর্ঘদিনের ইতিহাসের ছায়াপথে ভারতের সুখ শান্তি সম্পদ আস্তে আস্তে নিঃশেষ হল। দীর্ঘদিনের বিদেশী শাসন নিঃশেষ করে দিল একটা দেশকে। ভেঙ্গে দিয়ে গেল মানুষের মেরুদণ্ড। পাঠান-মুঘল, ফরাসী-ইংরাজ, পর্তুগীজ—কে লোঠেনি ভারতের সম্পদ? ভারতের ঐশ্বর্য্যে নিজের দেশের ঐশ্বর্য্য বাড়ায়নি? সবাই—সকলেই এসেছে আর লুঠে নিয়ে গেছে। ভালবাসেনি কেউ, লুঠেরা কখনো ভালবাসতে পারে না। বিদেশীর ভালবাসা বিনা স্বার্থে জন্মায় না।

কিন্তু এত লুণ্ঠনের পরেও নাকি ভারতের সম্পদ শেষ হয়নি। আছে—অনেক আছে। সব সম্পদ শেষ হবার পরও মানুষগুলো আছে। আছে তাদের বুকের উষ্ণ রক্ত।

মেরুদণ্ডহীন ভারতবর্ষ! দীন ভারতবর্ষ! পরাধীন ভারতবর্ষ!

গর্জে উঠেছিল বাঙ্গালী কিশোর যুবকের হাতে পিস্তল। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম। ফাঁসির দড়ি গলায় পরে উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি দিয়েছিলেন, বন্দে মাতরম্!

কেন দিয়েছিলেন? কিসের জন্য দিয়েছিলেন? অসংখ্য শহীদের বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে আপশহীন সংগ্রাম, আত্মবিসর্জন, কেন? কি চেয়েছিলেন তাঁরা? মুক্তি! মুক্তি কী শুধু বিদেশী

শাসকদের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে—অন্যায়, অত্যাচার-পীড়ন থেকে নয়? তাঁরা কি শুধু মাত্র নামে স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন? মানুষের মুক্তি কি তাঁদের কাম্য ছিল না?

ছিল-ছিল-ছিল! শংকরের সমস্ত অন্তরাত্মা একসঙ্গে গর্জে উঠেছে। ভারত-মুক্তির মধ্যে মানব-মুক্তির স্বপ্ন নিশ্চয়ই তাঁরা দেখেছিলেন। বিদেশী শাসকদের দূর করে নিশ্চয়ই তাঁরা সুখ, শান্তি স্বাচ্ছন্দে ভরা, একজাতি, একপ্রাণ, একতার পথে এগিয়ে যেতেন। ক্ষুধার্তের মর্মভেদী করুণ ক্রন্দন, দুর্বলের ওপর অত্যাচার নিশ্চয়ই তাঁরা বন্ধ করতেন। তাঁদের পথে ভারত যদি মুক্ত হত মানুষ নিশ্চয়ই আপন অধিকার ফিরে পেত।

আজ কি তাহলে মানুষের কোন অধিকার নেই? আজকের ভারতীয় গণতন্ত্র কি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নি? মানুষ কি আজও পরাধীন?

নিশ্চয়ই নয়, আমরা স্বাধীন। ভোটের বাক্সে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ধনী-দরিদ্র-উচ্চ-নীচ সবল দুর্বলের ব্যবধান শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রে দূর হয়েছে, ভোটের বাক্সে। যে ধনী মানুষটির ছায়া দর্শনের সৌভাগ্য ঘটেনা, একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ভোট দিতে পারি। এর চেয়ে পরম সৌভাগ্য আর কি হতে পারে আমাদের? আমরা যে সকলেই সমান। গরীব দেশের গরীব নাগরিক আমরা, আর কি চাই?

স্বাধীনতার হাত বদল হয়েছে আপোষ নীতিতে। দেশের অঙ্গচ্ছেদ করে যাঁরা স্বাধীনতা নিতে অস্বীকার করেছিলেন, কার্যক্ষেত্রে বাধ্য ছেলের মত ভারত বিভাগ মেনে নিলেন তাঁরা। কথায় আর কাজে যাদের দুস্তর ব্যবধান, স্বাধীনতার প্রাক্কালেই প্রমানিত হল, তাঁরাই হলেন ভারতের ভাগ্য বিধাতা। স্বেচ্ছাচারী জহ্লাদের দল হলেন ন্যায় নীতি স্বাধীনতার রক্ষক।

ইতিহাসে বাইশটা বছর কিছু নয়। কিন্তু বাইশটা বছরের ইতিহাস দেশের অসংখ্য মানুষের জীবনে তিক্ততার সৃষ্টি করেছে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দিয়েছে দেশটাকে। দেশের সম্পদ, মানুষের জীবন নিয়ে ছিনি মিনি খেলছে।

দেশ উন্নত হচ্ছে। মানুষের জীবন হয়ে উঠবে সম্ভাবনাময়। দুঃখ থাকবে না, থাকবে না দারিদ্র। মানুষ পেট ভরে খাবে, হাসবে, সুখ আর শান্তির দিন ফিরে পাবে। সেই জন্যই বিদেশের দেশে দেশে ভারতের ছোটাছুটি। আদান প্রদান। দেশকে স্বয়ং নির্ভর করে গড়ে তুলতেই হবে।

ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাশিয়া ভারত থেকে যে মাল নেয় তার দাম দেয় ঐ মালের আন্তর্জাতিক দাম অপেক্ষা অনেক কম হারে, পক্ষান্তরে ভারতে যে মাল তারা রপ্তানী করে তার দাম আদায় করে নেয় অনেক বেশি। মিথ্যা নয়। সাম্প্রতিক একটি চুক্তি বলে রাশিয়া আগামী তিন বছর ভিলাই থেকে এক মিলিয়ন টন ইস্পাত কিনবে; কিন্তু দাম দেবে ইস্পাতের দাম অপেক্ষা শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ কম হারে। শুধু তাই নয়, ভারত থেকে রাশিয়া যে কৃষিজ ও খনিজ দ্রব্য কেনে তার দাম দেয় আন্তর্জাতিক হার অপেক্ষা শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ কম হারে। অথচ রাশিয়া যে যন্ত্রপাতি ভারতে পাঠায় তার দাম আন্তর্জাতিক হার অপেক্ষা শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ বেশি আদায় করে। রাশিয়া ভারতের কাছে নিকেল বিক্রয় করে টন প্রতি ৩০,০০০ টাকা দামে, অথচ ইয়োরোপে নিকেলের দাম টন প্রতি ১৫,০০০ টাকা মাত্র। রাশিয়া ভারতকে পনেরো হাজার ট্রাক্টর দিয়ে দাম নিয়েছে ইয়োরোপের ট্রাক্টরের তিনগুণ বেশি। ভারতে ১৩টি পাবলিক সেক্টর ভুক্ত কারখানায় বর্তমানে ৯৪০ জন রুশ ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত আছেন (ভারতীয় বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সম্ভবত তাঁদের বেকারত্বের একমাত্র কারণ অযোগ্যতা

নয়, তাঁরা ভারতীয়)। এবং তাঁদের গড় মাসিক বেতন ৩৫০০০ টাকা ও বহুবিধ সুখ সুবিধা (আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি মাসিক বেতন পান ১০,০০০ টাকা, একজন রাশিয়ান ইঞ্জিনিয়ার তাঁর চেয়ে সাড়ে তিনগুণ বেশি) দেওয়া হয়। এবং যে তেরটি কারখানা রাশিয়ার সাহায্যে চলছে তার মধ্যে দশটি চলছে লোকসানে, তিনটিতে লাভ হয় অতি সামান্য। অদূর ভবিষ্যতে বাকি তিনটি যদি লোকসানে চলে তাহলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই বর্তমানে তেরটির মধ্যে দশটিতে লোকসান, তিনটিতে সামান্য লাভ, কম লাভ নয়। এখন দশটি কারখানার তিন বছরের লোকসান খুব একটা বেশি নয়, মাত্র ১০৫ কোটি টাকা! ১৯৬৬-৬৭ ও ৯৬৮-৬৯এর হিসাব অনুযায়ী।

এখানেই শেষ নয়। রাশিয়া আমাদের বন্ধু। অনগ্রসর ভারতকে স্বাবলম্বী করে তুলতে রাশিয়া তার বন্ধুত্বের বাহু প্রসারিত করে দিয়েছে। তাঁরাই তৈরি করেছেন বোকারোর ইস্পাত কারখানা। নির্মাণে ব্যয় হবে মাত্র ২২০০ কোটি টাকা। হয়তো বোকারোর মত কারখানা তৈরি করতে, ওর চেয়ে অনেক কম টাকা লাগে, কিন্তু একটু বেশিই লাগবে। এখানেও সেই কারণ, রাশিয়ান এক্সপার্ট, টেকনিশিয়ান, ইঞ্জিনীয়ারদের মাহিনা, আন্তর্জাতিক দাম অপেক্ষা বহুগুণ বেশি দামে রাশিয়ান যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং যে সব জিনিষ এখানে উৎপাদিত হয় তাও রাশিয়া থেকে নিয়ে আসা। কারখানার প্রয়োজনীয় ইঁটটি পর্যন্ত রাশিয়া থেকে আনা হবে।

এর ওপর যে সমস্ত যন্ত্রপাতি আসছে সেগুলি সেকেলে, পরিত্যক্ত এবং বর্তমানে অচল। হৃষিকেশের ঔষধ কারখানায় যে সমস্ত যন্ত্রপাতি রাশিয়া পাঠিয়েছে তা আধুনিক তো নয়ই, বরং পুরান ধরণের বলে প্রমানিত হয়েছে। যেখানে ১০ টন টেট্রামিলিন দরকার সেখানে কিনতে বাধ্য করিয়েছে ১২০ টন!

রাশিয়ার সাহায্যে নির্মিত হায়দ্রাবাদের কারখানায় বছরে এক

কোটি টাকার মাল উৎপন্ন হয়, খরচ পড়ে আট কোটি টাকা। বছরে লোকসানের পরিমাণ সামান্য মাত্র শত কোটি টাকা। এবং হৃষিকেশের কারখানায় পেনিসিলিন তৈরি করার কথা ছিল কিন্তু রাশিয়া সেখানে তৈরি করছে পশু খাদ্য! এখন প্রশ্ন উঠতে পারে পেনিসিলিন কারখানায় পশু খাদ্য তৈরি হয় কি করে? পশু খাদ্যের কারখানায় পশু খাদ্য ভিন্ন অন্য কিছু তৈরি করা কি সম্ভব?

বোকারোয় ইস্পাত কারখানা চালু হওয়ার কথা ছিল ১৯৬৮ সালে। এখন শোনা যাচ্ছে ১৯৭৪ সালের আগে তাঁরা কারখানা নির্মাণের কাজ শেষ করতে পারবেন না। এবং বোকারো কারখানার যন্ত্রপাতি ভারতে পাঠাবার আগেই রাশিয়া একবার চীনে পাঠিয়েছিল। কিন্তু চীন বেশ কয়েক বছর আগে এই মালগুলি অকেজো বলে রাশিয়াকে ফেরৎ পাঠায়। চীনের ফেরৎ দেওয়া অকেজো যন্ত্রপাতি দিয়েই বোকারোর ইস্পাত কারখানা নির্মিত হচ্ছে। কারখানা নির্মাণ শেষ হলে সুরু হবে উৎপাদন। বর্তমানে ভারতের অন্যান্য ইস্পাত কারখানায় প্রতি টন ইস্পাতে খরচ পড়ে ১২০০ টাকা, কিন্তু বোকারো কারখানায় প্রতি টন ইস্পাত উৎপাদনের খরচ পড়বে ২৮০০ টাকা। এখানেও লাভ!

এ পর্যন্ত রাশিয়া ভারতকে ঋণ দিয়েছে ১০১২ কোটি টাকা। অর্থনীতিবিদরা হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, সোভিয়েত ঋণের পরিমাণ আপাত মূল্য বা ফেস ভ্যালু অনুসারে হলেও আসল মূল্য অনেক কম। কারণ ওই টাকার একটা বিরাট অংশ, (সবটা হলেও মন্দ হত না) ধরতে গেলে বেশির ভাগই রাশিয়া নিজেদের টেকনিশিয়ান প্রভৃতির মাইনে, পরিত্যক্ত আবর্জনার গুদামে পড়ে থাকা অচল যন্ত্রপাতির মূল্য বাবদ নিয়ে সরে পড়ে। প্রকৃত বন্ধুর মত কাজই ভারতের সঙ্গে করে রাশিয়া।

কিন্তু কেন করে? কিসের জোরে তাদের এত সাহস? একটা

দেশকে সাহায্যের নামে নয়া সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দুঃসাহস তাদের হল কেমন করে?

হয়তো এ তাদের দুঃসাহস নয়, নীতি। নয়া সাম্রাজ্যবাদী নীতি। সাম্রাজ্যবাদীর দল আজ পৃথিবীর দেশে দেশে সাহায্যের নামে শোষণ চালাচ্ছে। বন্ধুর ছদ্মবেশে করছে চরম শত্রুতা। তাদের বাধা দেয়, প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে তেমন সাহস নেই। এই সাহসটুকুর অভাব ঘটে স্বার্থের সংঘাতে। স্বেচ্ছাচারীর দল তাদের স্বেচ্ছাচারের বনিয়াদ ঠিক রাখার জন্যে এইসব নয়া সাম্রাজ্যবাদীদের হাত ধরে, বন্ধু বলে পরিচিত করে, শয়তানকে বানায় দোসর। কারণ তাদের বিপদের দিনে একমাত্র এরাই হবে সহায়।

দেশের মানুষ? জনগণ!

তারা তো দাস আমাদের। আমরাই সব, সত্য! আমাদের ইচ্ছায় চলবে জনগণ। যদি না চলে, মরবে। জনগণ কেউ নয়। শুধু আমরা।

শংকর ভেবেছে। দেখেছে। মানুষ গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। কারণ সে দুটি খেতে চেয়েছিল। কেন তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, জিজ্ঞাসা করেছিল। উত্তরে পেয়েছিল আঘাত। কারণ স্বেচ্ছাচারীর হাতে শক্তি, অস্ত্র তার সহায়—নিরস্ত্র মানুষ শুধু চিৎকার করতে পারে। ভোটের বাক্সও তো ওদের হাতে। শেষ নেই দালালের।

স্বাধীনতার বাইশ বছরের মধ্যে একটা দেশ সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। ভুল নীতি, অযোগ্য পরিচালনা, স্বজন পোষণ মনোভাব, সমাজের এক শ্রেণীর প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব, দুর্নীতি, তোষণ, সাম্প্রদায়ী-কতাকে প্রশ্রয় দেওয়া, যত কিছু অন্যায় অনাচার, পাপ করা সম্ভব, তাই করেছে। সাধারণ মানুষ, দেশের জনগণকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বেইমানী করেছে মানুষের সঙ্গে একমাত্র কারণ, আমিত্ব।

আমরাই সব। আমাদের ইচ্ছাই ইচ্ছা। বিদেশের হাটে দেশ আর মানুষকে বিকিয়ে দিতে ওদের বিবেকে এতটুকু বাধেনি। ওরা বিবেক বিবর্জিত।

অথচ মুখে জনগণের নামে লাল ঝরানো কথা। সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে দীর্ঘ বাইশটা বছর। আজও হচ্ছে।

বামপন্থী দলগুলো শুধু দলীয় কোন্দলে ওস্তাদ। নেতৃত্বের কোমর বাঁধা ঝগড়ায় পটু। মুখে মার্কস এঙ্গেলস, লেনিনের কথা। তাঁদের পথে চলার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিপরীত। সাধারণ মানুষের জন্য কেউ নেই। তাদের শুধু ঠকানো হয় বারবার।

সেই জন্যেই শংকর সরে এসেছিল। পাপীদের দোসর হয়ে থাকতে সে পারেনি। থাকলে হয়তো তার নিজের কিছু ভাল হত। কিন্তু শুধুমাত্র নিজের ভাল তো সে চায় নি!

সে ভেবেছিল জনগণের কথা। অন্যায়, অত্যাচার আর শোষণ থেকে মানুষের মুক্তি। মানব মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল সে। আর সে জানে আপসহীন সংগ্রামের দ্বারাই সেই মুক্তি আনা সম্ভব মার্কস এঙ্গেলসের নির্দেশিত পথ, মহান অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়, মাও সে তুঙ চিন্তা ধারাই সে মুক্তি আনতে পারে ভারতীয় জনগণের জীবনে।

আজকের এ স্বাধীনতা কি আমাদের স্বাধীনতা, ভারতের লক্ষ কোটি খেটে খাওয়া মানুষের স্বাধীনতা? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেছে সে। যদি এ স্বাধীনতা লক্ষ কোটি জনগণের স্বাধীনতা হয়, তাহলে কেন এ স্বাধীনতার মর্যাদা শয়তানদের হাতে পড়ে বারবার লাঞ্ছিত অপমানীত হয়? কেমন করে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর দল তাদের নয়া সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালাতে সাহস করে? কেন তাদের শোষণ বন্ধ হয় না? কেন?

না, আমরা স্বাধীন নই। বুকের রক্ত দিয়ে শত্রুর হাত থেকে কেড়ে নিতে পারিনি স্বাধীনতা, তাদের পরানো শোষনের শিকল

আমরা ছিন্ন করতে পারিনি আমাদের বলিষ্ঠ বাহুর আঘাতে। স্বরাজ মিলেছে আমাদের, কিন্তু স্বাধীনতা পাইনি।

সেই না পাওয়া স্বাধীনতাই আমরা পেতে চাই। শেষ করতে চাই অন্যায় অত্যাচার। গরীবের খুনে গড়ে ওঠে যাদের সুখের ইমারত, তাদের সে ইমারত চূর্ণ বিচূর্ণ করতে চাই। আমরা আত্ম নির্ভর হতে চাই। বন্ধ করতে চাই রাশিয়া, আমেরিকার নয়া সাম্রাজ্যবাদী শোষণ।

আমরা গড়ে তুলবো এক শ্রেণীহীন সমাজ। মানুষের সমান অধিকার। দুঃশাসনের গর্বিত স্পর্দ্ধা অহঙ্কার ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিতে চাই আমরা।

সেই পথে এগিয়ে চলেছি। এগিয়ে যাব। যতক্ষণ না অত্যাচারীর দল নিঃশেষ হচ্ছে আমরা থামবো না। বিপ্লবের রক্তাক্ত পথ পরিক্রমা আমাদের শেষ হবে সেইদিন। যেদিন ঃ

ও সোনায় ভরা শস্যক্ষেত !
এখন তোমায় দেখে
ভাবতে পারে কেউ
সে কি খাটুনি খেটে
তোমায় সাজাল এমন সাজে !
তুমি যে হয়েছ সিক্ত
সে তো নয় রাতের শিশিরে ;
তোমার শরীরে ঝরেছে
যে কৃষকের ঘাম।

চাষীর গর্ব আনন্দের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠবে। শ্রমিকের চোরা কুঠরিতে আসবে আলো। নতুন দিনের নতুন আলোয় মানুষ গাইবে নতুন দিনের সঙ্গীত।

আসবে, সেদিন আসবে !

সে দিন আসছে।

আজ :

...দিক হতে দিকে বিদ্রোহ ছোটে

বসে থাকবার বেলা নেই মোটে

রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে পূর্বকোণ

সূর্যটা মধ্য গগনে জ্বলছে। উত্তাপ ছড়াচ্ছে। ক্লান্ত দুপুর। একটা ম্লান বিষন্নতা শ্রেণীবদ্ধ পাহাড়গুলির মধ্যে বিরাজ করছে। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। সকালের পাখিদের কাকলিধ্বনি এখন এই বিষন্ন দুপুরে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে। মধ্য বসন্তের বাতাসে গ্রীষ্মের আমেজ!

শংকরের খাওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই। কৃষ্ণাম্মা কিছু তফাতে ছোট একটা খাদের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। চেয়ে আছে দূরে সমতলের দিকে। বাগামের ক্ষেত। রূপালী ফিতের মত উড়িষ্যা সীমান্তের নদী, তারপরই উড়িষ্যার সুউচ্চ পাহাড় শ্রেণী।

চড়াই উৎরাই পার হতে হতে সকালে চেন্না রাও বলেছিল, আরো গোটা চার পাঁচ পাহাড় আমাদের পার হতে হবে, তারপর 'সেন্টার' এর সঙ্গে দেখা হবে আমাদের।

শংকর জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ পৌঁছাতে পারবো আমরা?

আশা তো করছি সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাব। উত্তর দিয়ে ছিল চেন্না রাও।

হিসাব করেছিল শংকর। ছটা দিনের হিসাব। ছ দিন আগে বাংলা ছেড়ে অন্ধ্রের পথে পাড়ি দিয়েছিল। হাওড়া ষ্টেশনে এসে মাদ্রাজ গামী ট্রেন ধরেছিল। বাংলার পর উড়িষ্যা, অন্ধ্রের মাটিতে পা দিয়েছিল। দেখেছিল মাটি ও মানুষে কোন তফাৎ নেই। ভাষার ব্যবধান হৃদয়ের উত্তাপে ধুয়ে মুছে গিয়েছিল।

তিনি একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, তুমি শ্রীকাকুলাম যাবে শংকর?

শ্রীকাকুলাম! অন্ধ্রের শ্রীকাকুলাম।

মনে পড়েছিল আর একটি নাম, তেলেঙ্গানা। ব্যর্থ তেলেঙ্গানা, বিফল তেলেঙ্গানা। অন্ধ্র প্রদেশের তেলেঙ্গানার কৃষক নারী পুরুষ, নিজাম আর ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ পাঁচ বছর লড়াই করেছিল। জেলে গেছে, সাজা খেটেছে আর সংশোধন বাদীদের প্ররোচনায় ভোট দিয়ে সুদিনের নিরর্থক আশায় কষ্টভোগ করেছে দিনের পর দিন।

শ্রীকাকুলাম সংশোধনবাদীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছে। জনগণের কাছে পরিচিত করেছে তাদের আসল রূপ। এগিয়ে গেছে আপন লক্ষ্য পথে। সে পথ বিপ্লবের পথ। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সাথে উপলব্ধি করেছে, মাও সে তুঙ চিন্তাধারা সত্য সত্যই বর্তমান যুগের সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর (Proletarian) আদর্শের সর্বোচ্চ রূপ, আর তা সত্য সত্যই বাস্তববাদী শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

পাঁচ বছর আগে, চীন বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সহ-সভাপতি লিন পিয়াও সারা দুনিয়ার কমিউনিষ্টদের জন্য সূত্রীকরণ (Generalise) করেছিলেন যে, "শত্রুর বিরুদ্ধে সমগ্র শক্তিকে সমাবেশ ও প্রয়োগ করার একমাত্র পথ গেরিলা যুদ্ধ। গেরিলা যুদ্ধই মৌলিক কিন্তু অনুকূল অবস্থায় চলমান যুদ্ধের সুযোগকে কোন ক্রমেই ছাড়া চলবে না।"

মার্কস, এঙ্গেলস বলেছিলেন, "শান্তিপূর্ণ উপায়ে পুঁজিপতিদের ক্ষমতা লুপ্ত করে পুঁজিবাদী সম্পত্তিকে সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করা অসম্ভব। পুঁজিবাদী সমাজে কলকারখানার সর্বহারারা সবচেয়ে বিপ্লবী ও সবচেয়ে অগ্রসর শ্রেণী এবং সর্বহারা শ্রেণীই, পুঁজিবাদী শোষণ-শাসনে ক্ষুব্ধ অন্যান্য মেহনতী জনগণকে নিজেদের নেতৃত্বে একজোট করে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে পারে এবং বিপ্লবী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে।"

মার্কস, এঙ্গেলসের নির্দেশিত পথে, লেনিনের নেতৃত্বে জয়যুক্ত

হল মহান অক্টোবর (২৫শে অক্টোবর ১৯১৭) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। বিপ্লবের লাল পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ধরলেন সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী।

সর্বহারা শ্রেণীর প্রিয় নেতা কমরেড স্তালিন তাঁর ১৯২৫ সালের বিখ্যাত বক্তৃতায় মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক (নভেম্বর) বিপ্লবের বাণীকে আরও বিকশিত করলেন প্রাচ্যের পরাধীন দেশের মুক্তির পথের নিশানা ঠিক করে দিলেন তিনি।

তাঁর সেই মহান নির্দেশকে অনুসরণ করে মাও সে তুঙ আধাসামন্ত-তান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক চীনে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব—যার কেন্দ্রীয় কাজ সশস্ত্র কৃষিবিপ্লব, তার নেতৃত্ব দেন। সফল হয় লংমার্চ (অনুদি লংমার্চ উইথ চেয়ারম্যান মাও) মুক্ত চীনে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতন্ত্র।

আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক ভারতে আজ মাও সে তুঙ চিন্তাধারার সূচনা নকশালবাড়িতে। দাবানলের রূপ নিয়েছে শ্রীকাকুলামে, ছড়িয়ে পড়েছে ভারতে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে।

শ্রীকাকুলামে যাওয়ার কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি শংকর। জিজ্ঞাসা করেছিল, সত্য ?

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, সত্যই।

মুহূর্তে মনটা এক অনাস্বাদিত পুলকে ভরে উঠেছিল। পরক্ষণে বলেছিল, আমার অনাবশ্যক কৌতুহলকে আপনি ক্ষমা করবেন, তবু আমি জিজ্ঞাসা না করে পারছি না, আমার এ সৌভাগ্যের কারণ কি ? কি এমন যোগ্যতা আমি দেখাতে পেরেছি, যার জন্যে আমাকে এমন সুযোগ দেওয়া হচ্ছে ?

তার মুখের দিকে চেয়ে এক মুহূর্ত স্থির ছিলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কি নিজেকে অযোগ্য ভাবতে শিখেছো, শংকর ?

তাঁর সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসার উত্তরে সহসা কিছু বলতে পারেনি সে। নীরব ছিল। অযোগ্য! এমন কথা সে কোনদিন ভাবেনি। বিচার করেনি যোগ্যতার শুধু কাজ করে গেছে। পালন করেছে নির্দেশ। সাধ্যমত চেষ্টা করেছে মানুষের ভাল করার। মানুষকে আপন করে নিয়েছে আপনার জন হয়ে উঠেছে সকলের। বলেছে আমি কর্তব্য পালন করে গেছি।

শুধু কর্তব্য?

আমি স্বপ্ন দেখেছি মুক্তির। আলোব প্রত্যাশী আমি। চাই অত্যাচারের অবসান, ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা।

কোন পথে?

সংশোধনবাদীদের মাধ্যমে নিশ্চয়ই সম্ভব নয়।

কেন নয়?

সংশোধনবাদ মানেই তো সুবিধাবাদ। বিপ্লব কখনই আপোষ নীতিতে হয় না। আপোষহীন সংগ্রামই শ্রেণী ঐক্য গড়ে তোলে। বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে।

আর কথা বলেননি তিনি। অনেকক্ষণ নীরব ছিলেন। কি যেন চিন্তা করেছিলেন গভীরভাবে। এক সময় মৃদু কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল তাঁর। তিনি ডেকেছিলেন, শংকর!

বলুন!

ইচ্ছা ছিল আমিই যাব। কিন্তু আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই তোমার নাম প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলাম।

কেন?

এ প্রশ্নের উত্তরটা তিনি সঙ্গে সঙ্গে দেননি। বলেছিলেন, আমার একটু অসুবিধা আছে।

কি অসুবিধা? শুনতে চেয়েছিল শংকর।

আমি—আমি অসুস্থ। কথাটা মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন তিনি

চমকে উঠেছিল সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিল তাঁর মুখের দিকে। চকিতে একটা কথা মনে পড়েছিল। ক'মাস আগে একবার এমন একটা সন্দেহ তার মনেও জেগেছিল। একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গিয়েছিল। কার যেন কাতরতা শুনতে পেয়েছিল। উঠে আলো জ্বেলে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিল। সে মুখ বিবর্ণ, পাংশু। ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল, কি হয়েছে আপনার?

অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে পেতে বলেছিলেন, কিছু হয়নি, তুমি শুয়ে পড়।

নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে আপনার।

না-না।

আপনি আমার কাছে লুকাচ্ছেন। আমি আপনার কাতরতা শুনতে পেয়েছি।

ও কিছু নয়। এমন আমার হয়। কাল সকালেই ঠিক হয়ে যাবে।

শুয়ে পড়েছিল সে। তিনিও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন একসময়।

সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে আশ্চর্য হয়েছিল শংকর। দেখতে পেয়েছিল তিনি তখনও ঘুমাচ্ছেন। অথচ অন্য দিন তার ঘুম ভাঙ্গার অনেক আগেই তিনি উঠে পড়েন। কোন কোন দিন ঘুম থেকে ডেকে তোলেন পর্যন্ত। সেই প্রথম ব্যতিক্রম দেখতে পেয়েছিল সে। নিজের কাজ থাকা সত্ত্বেও বেরুতে পারেনি।

বেশ কিছুটা বেলায় ঘুম ভেঙেছিল তাঁর। তাকে দেখতে পেয়েছিলেন।

জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন আছেন?

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ভালই। তুমি কখন ফিরলে?

আমি আজ কোথাও বেরোয়নি।

যাওনি ?

না।

ছিঃ ছিঃ! ধিক্কার দিয়েছিলেন যেন। তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন যাওনি ?

কাল আপনার ওই রকম···

কথাটা শেষ করতে পারেনি। ধমক দিয়ে বলেছিলেন, আমার কাছে বসে থেকে কি করলে তুমি ? নিজের কাজকে অবহেলা করলে কেন ? তুমি যে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন, একথা আমার আগে জানা ছিল না।

সত্যই অন্যায় করেছে বুঝতে পেরেছিল শংকর। নিজের কাজকে অবহেলা করেছে সে। মৃদুকণ্ঠে বলেছিল, সত্যি আমার অন্যায় হয়েছে।

ভবিষ্যতে এমন যেন না হয়। শান্তকণ্ঠে তিনিও কথাটা বলেছিলেন। কিন্তু তার মনে হয়েছিল যেন কঠিন আদেশ জানালেন তিনি। বলেছিলেন, শংকর দায়িত্বজ্ঞানহীনতা জীবনের অভিশাপ।

সেই তিনি প্রথম স্বীকার করেছিলেন, তিনি অসুস্থ। দীর্ঘ পথে যাত্রা করা আজ আর সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। বলেছিলেন, শংকর তুমি ঘুরে এসো, দেখে এসো।

বিদায় দেওয়ার আগে বলেছিলেন, সাবধানে যাবে। চোখ এবং কান খোলা রাখবে। জানবে তুমি যে পথে চলেছো তার প্রতিটি পদক্ষেপে বিপদের সম্ভাবনা। সারা অন্ধ্রের গ্রাম, সহর, রেল ষ্টেশন গুপ্তচরে ছেয়ে দিয়েছে সেখানকার কংগ্রেস সরকার। এতটুকু ভুল যদি করো তাহলে সে ভুলের সংশোধন হয়তো হবে না।

পথ চলার প্রতিটি নির্দেশ দেওয়া ছিল। সে নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছে সে। ট্রেনের কামরায় উঠেছে গুপ্তচর। পাশে বসেছে। অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। সংবাদের আদান প্রদান করেছে। অন্ধ্র

আগমনের কারণ জানতে চেয়েছে। শংকর তার ব্যাগ থেকে বার করে দেখিয়েছে পরিচয় পত্র। একটি বিখ্যাত কোম্পানীর কাজের লোক সে।

অপ্রস্তুত হয়েছেন ভদ্রলোক। ধরা পড়ে গিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন। মনে মনে হেসেছে শংকর, এই বুদ্ধি নিয়ে গুপ্তচর হয়েছে!

পূর্ব নির্দিষ্ট ষ্টেশনে নেমে ট্যাক্সি নিয়েছে শঙ্কর। নির্দেশ দিয়েছে হোটেলে যাওয়ার। কিন্তু পথিমধ্যে গাড়ি থামিয়েছে পুলিশ। জেরার পর জেরা। যথাযথ উত্তর দিয়েছে সে। নিঃসন্দেহ হয়ে রেহাই দিয়েছে পুলিশ।

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করেছে, পুলিশ ট্যাক্সি থামিয়ে অমন জিজ্ঞাসাবাদ করল কেন?

পালটা প্রশ্ন করেছে ড্রাইভার, ট্রেনে কেউ আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে নি?

মনে পড়েছিল শঙ্করের। বলেছিল, এক ভদ্রলোক কিছু কিছু জানতে চেয়েছিলেন আমার কাছে।

হেসেছিল ড্রাইভার যুবক। বলেছিল, ভদ্রলোক বলে আপনার মনে হলেও তিনি পুলিশের গুপ্তচর ছাড়া আর কিছু নন। আর শুধু ট্যাক্সি নয়, বাস, লরি সব কিছুতেই ওদের খোঁজাখুঁজি।

কি খুঁজছে ওরা?

গেরিলা।

গেরিলা? অবাক হয়েছিল শঙ্কর। জিজ্ঞাসা করেছিল, এমনি-ভাবে গেরিলা ধরছে ওরা?

ধরতে আর পারছে কই? শুধু খোঁজাখুঁজিই সার হচ্ছে পুলিশের। কেউ তো আর গেরিলার লেবেল এঁটে বেরুচ্ছে না। নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠেছিল ড্রাইভার যুবক।

পৌঁছে দিয়েছিল হোটেলে। সেখানে স্নান সেরে বিশ্রাম নিয়েছিল। রাতের খাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিল এক সময়।

ক্লান্ত শরীর কিন্তু ঘুম আসেনি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছিল। এখানেই তাকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। যথা সময়ে কমরেডরা এসে নিয়ে যাবেন।

তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। দরোজায় শব্দ শুনে ঘুমটা ভেঙ্গে গিয়েছিল তার উঠে দরোজা খুলে দিয়েছিল। বলিষ্ঠ স্বাস্থের অধিকারী একটি যুবক এগিয়ে এসে হাতটা জড়িয়ে ধরে মৃত্থ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি প্রস্তুত কমরেড ?

নিশ্চয়ই।

আস্থন।

যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়েছিল সে। হোটেলের দরোজায় দাঁড়িয়ে থাকা অনেকগুলি ট্যাক্সির একটিতে তুজনে উঠে বসেছিল।

মিটার ডাউন করে ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় যাবেন কমরেড ?

ড্রাইভারের মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠেছিল শঙ্কর। মুখটা তার বড় পরিচিত।

মৃত্থ হেসেছিল সকালের পরিচিত ট্যাক্সি ড্রাইভার যুবকটি।

কৃষ্ণাম্মা দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি তার স্থদূর প্রসারিত। মধ্যাহ্নের সূর্যটা পশ্চিমে হেলার সময় হয়ে আসছে। চেন্না রাও অপেক্ষা করতে বলে গেছে তাদের।

রাস্তার মাঝে হঠাৎ ট্যাক্সি থামিয়েছিল সহযাত্রী যুবক। অপেক্ষা করতে বলে দরজা খুলে দেখে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সংকীর্ণ একটি গলি পথে।

তুজনে চুপচাপ বসেছিল ট্যাক্সিতে। গাড়ির মধ্যের আলো নেভানো। একটি কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল, কমরেড সিগারেট।

ধন্যবাদ, আমি সিগারেট খাইনা।

একটু অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। যুবক আপন সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করেছিল।

একটু পরেই ফিরে এসেছিল যুবক তার উদ্দেশ্যে বলেছিল, আপনি নামুন এখানে। ড্রাইভার যুবককে বলেছিল, আপনি এখন ফিরে যান কমরেড। এনার জিনিষগুলি হোটেল থেকে…

যুবক উত্তর দিয়েছিল, আশা করছি সেগুলির ব্যবস্থা এতক্ষণে নিশ্চয়ই হয়েছে। আচ্ছা ধন্যবাদ।

শংকর বলেছিল, ধন্যবাদ

হেসেছিল যুবক। বলেছিল, আবার দেখা হবে।

নিশ্চয়ই হবে।

ওরা দুজন এগিয়ে গিয়েছিল। যুবক গাড়ি নিয়ে ফিরে এসেছিল।

সে রাত্রে বিশ্রাম মিলেছিল। পরিচয় হয়েছিল চেন্না রাও আর তার সহযাত্রী কমরেডদের সঙ্গে। পুলিশ, গোয়েন্দাদের সতর্ক প্রহরার মধ্য দিয়েই বিভিন্ন সহর গ্রাম ঘুরিয়ে এখানে নিয়ে এল তাকে। ছ'টা দিনে কখনো সহরে, কখনো গ্রামে কারো না কারো বাড়ি আশ্রয় নিয়েছে। সে কে? কি তার পরিচয়, জানবার এতটুকু কৌতুহল প্রকাশ করতে দেখেনি একটি শিশুর মুখেও। নির্বিকার ভাবে খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করেছেন সকলে। পরমাত্মীয়ের মত কাছে বসে খাইয়েছেন। ব্যাস! আর কিছু নয়। শুধু বিদায় নেবার সময় হাত জড়িয়ে ধরে বলেছেন, আবার আসবেন!

আসবে, নিশ্চয়ই আসবে।

সেদিন আসছে। সকলে আসবে পরস্পরের সঙ্গে মিলবে। ব্যবধান ঘুচে গিয়ে এক হয়ে যাবে।

নতুন দিনের সূর্য করজ্জ্বল প্রভাত লগ্নে মৈত্রীর বন্ধনে বাঁধা পড়বে মানুষ!

কমরেড।

কৃষ্ণাম্মার আহ্বানে তার দিকে ফিরে তাকাল শংকর। তাকে দেখল। বলল, আমাকে কিছু বলবেন ?

কৃষ্ণাম্মার চোখ দুটো ছল ছল। কণ্ঠ অবরুদ্ধ। বলল, আমার মনে হয় ওঁদের কোন বিপদ হয়েছে।

বিপদ ?

হ্যাঁ, কমরেড! আমার মন বলছে। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম সে দৃশ্য!

কি দেখলেন ?

ওঁদের রক্তাক্ত মৃতদেহগুলি। এক জায়গায় জড়ো করে শয়তানের দল আনন্দে, উৎসব করছে। ওদের চোখের দৃষ্টিতে পশুর ক্ষুধা! ওরা ভোজ সারবে কমরেডদের উষ্ণ রক্ত মাখা তাজা মাংসে!

কৃষ্ণাম্মার কথাগুলো শুনতে শুনতে বারবার শিহরে উঠল শংকর। ওর মুখের দিকে ভালভাবে তাকাল। দু-চোখের দৃষ্টি কেমন যেন অস্বাভাবিক বলে মনে হল। ভীষণভাবে চমকে উঠল সে। তবে কি কৃষ্ণাম্মা‥‥না-না‥‥‥তা কেমন করে সম্ভব? অসহায় বোধ করলো সে নিজেকে। কি করবে, সহসা ভেবে পেল না। কথা বলতে পারল না।

কৃষ্ণাম্মা আবার দূরের দিকে দৃষ্টিটাকে প্রসারিত করে দিয়েছে। চেয়ে আছে একদৃষ্টে। কি দেখছে, ভাবছে, ওই জানে!

শংকর মৃদুকণ্ঠে ওকে ডাকল, কমরেড!

কিন্তু সে ডাক ওর কানে পৌঁছাল না। শুনতে পেলনা কৃষ্ণাম্মা।

শংকর বুঝতে পারল ও বিচলিত হয়েছে। ওর নারীমন আতঙ্কে ভরে গেছে। দুঃস্বপ্ন দেখেছে! ভয়, শঙ্কা আতঙ্ক ও চেপে রাখতে পারেনি। মনের দুর্বলতাটুকু রোধ করা সম্ভব হয়নি ওর পক্ষে।

অন্ধ্রের মেয়ে কৃষ্ণাম্মা। যে অন্ধ্রের মেয়েরা ঘর সংসার, পুত্র,

কন্যা, পরিজন ত্যাগ করে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সহ্য করেছে পুলিশের অত্যাচার, পুরুষের সঙ্গে অ্যাকশনে যোগ দিয়ে হাত রাঙিয়েছে শ্রেণী শত্রুর রক্তে দেশের শত্রু, মানুষের শত্রুদের বুকে আঘাত হানতে এতটুকু বিচলিত হয়নি হাত কাঁপেনি

অন্ধ্রের মহিলা কমরেডরা প্রথম দিকে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন নি। কিন্তু ২৭শে মে (১৯৬৯) কমরেড কৃষ্ণমূর্তি ও অপর দু'জন কমরেডের হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁরা বললেন, আমরাও অস্ত্র ধরবো। কমরেডদের হত্যার প্রতিশোধ নেব আমরা।

সোমপেটা আঞ্চলিক পার্টি কমিটি প্রথমে রাজি হতে চাননি। ওঁদের অনেক কষ্টে বুঝিয়েছিলেন বলেছিলেন, প্রতিশোধ আমরাই নেব। শয়তান জমিদার আর দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতকটাকে নিশ্চয়ই সাজা দেব আমরা আপনাদের ওপর যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে তাই পালন করুন আপনারা।

কেন আমরা কি প্রতিশোধ নিতে পারিনা? কমরেডদের হত্যা কি আমাদের বুকে বাজেনি? অধৈর্য কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন তাঁরা।

নেতৃস্থানীয়েরা মলিহাদের নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মহিলা কমরেডরাও যে গেরিলা অভিযানে এগিয়ে আসবেন, শ্রেণীশত্রুর বুকের রক্তে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাইবেন, এ তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেন নি। শেষকালে বাধ্য হয়েছিলেন মত দিতে। তবু তাঁদের মনের সন্দেহ দূর হয়নি।

তারপর সেই দিনটা। ১৯শে জুন ১৯৬৯।

সোমপেটা আঞ্চলিক পার্টি কমিটির নেতৃত্বে তেখালু তালুকের অন্তর্গত বাকুল পালিতে ঘটল মহিলা কমরেডদের গেরিলা অভিযান। বহুসংখ্যক মহিলা কমরেড যোগ দিলেন সেই অভিযানে।

নিখুঁত অভিযান। এতটুকু ত্রুটি নেই কোথাও। সামান্য কিছু সময়ের মধ্যেই ঘটে গেল সম্পূর্ণ ঘটনা।

চারিদিক থেকে ওঁরা ঘিরে ফেললেন জমিদার বাড়ী। চারিদিক থেকে আক্রমণ চালালেন। ওঁদের গতি রুদ্ধ করে, বাধা দেয় তেমন সাধ্য হল না জমিদার বা তার পোষা গুণ্ডাদের।

মুহূর্তে জমিদারকে হত্যা করলেন ওঁরা। বাজেয়াপ্ত করলেন সম্পত্তি। জমিদার বাড়ীর দেওয়ালে, নিহত জমিদারের রক্ত দিয়ে লিখলেন কটি কথা: "তুই পি-কে' কে হত্যা করিয়েছিস, আমরা তোদের সকলকেই খতম করব—এই সবে সুরু।"

তারপর যেমন গিয়েছিলেন তেমনি ফিরে এলেন। পুলিশ এসে নিহত জমিদারের লাশ ছাড়া আর কিছুই পেলনা।

কিছু না পেলেই পশুর দল ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে। তারা পুলিশ—শান্তি রক্ষক, ভুলে যায় সে কথা। কেউই রেহাই পায় না তাদের অত্যাচার থেকে। পশু ক্ষুধা মেটায় তারা। কেউ একটি কথাও বলেনা। সন্ধান বলে দেয় না মুক্তি যোদ্ধাদের। নারীত্বের চেয়েও মুক্তি যে তাদের কাছে অনেক বড়। তারা জানে, বিশ্বাস করে, এই অত্যাচার উৎপীড়ন, শোষণের অবসান একদিন হবেই। সেদিন অন্যায়ের, পাপের শাস্তি ওদের পেতেই হবে। আজকের এই অত্যাচার তো অন্তিমের কবর খনন।

জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জনযুদ্ধ একদিন বিজয় লাভ করবেই। শুধু বাবুলাল, কৃষ্ণমূর্তি, উম্মা রাওদের নয়. আরো হাজার হাজার বীর বিপ্লবীর খুন ঢালতে হবে; হাজার হাজার প্রাণ উৎসর্গ করতে হবে। তবেই আসবে স্বর্ণ সম্ভাবনাময় সেদিন। প্রকৃত স্বাধীনতা। শোষণ, শাসন মুক্ত এক নতুন রাষ্ট্র! প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বহারার অধিকার।

কমরেড।

কৃষ্ণাম্মার কণ্ঠস্বর। শংকর তার দিকে চাইল।

কৃষ্ণাম্মা মৃদু কণ্ঠে বলল, ক্ষণিক আগে যে দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছি তার জন্যে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। এখন বুঝতে পারছি আমি আপন স্বার্থ চিন্তা করেই অমন উতলা হয়ে পড়েছিলাম। আমার মনে হয়নি, যা ভাবছি তা অন্যায়।

কেন? জানতে চাইল শংকর।

আমি বেশি ভেবেছিলাম ভাইয়ের কথা। কিন্তু এখন তো আমরা শুধু মাত্র ভাইবোন নই, আমরা মুক্তি যোদ্ধা। আমাদের পথ এবং লক্ষ্য যদিও একই তবুও হৃদয় বেগকে প্রাধান্য দিলে চলবে না। যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুর আঘাতে যদি আমাদের একজনের মৃত্যু ঘটে তবুও থামলে চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে শেষ লক্ষ্যে। এখন যে কাঁদবার সময় আমাদের নয়।

কমরেড!

আমি ভুল করেছি। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

কৃষ্ণাম্মার কথাগুলি শুনলো শংকর। কোন উত্তর দিল না। মনে পড়ল তার নকশালবাড়ির কথা। সেখানেও প্রগতিশীল যুক্তফ্রন্ট সরকারের পুলিশী অভিযান সুরু হয়েছিল বিপ্লবী মুক্তি যোদ্ধাদের ধরবার জন্য হন্যে কুকুরের মত ঘুরে বেড়িয়েছিল ব্যর্থতায় ক্ষিপ্ত হয়ে চালিয়েছিল সীমাহীন বর্বরতা।

কিন্তু নকশালবাড়ির জনগণ বিপ্লবীদের ধরিয়ে দেয় নি পুলিশের হাতে।

যদি ধরিয়ে দিত, যদি পুলিশের কাছে বলে দিত, আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের সন্ধান, তাহলে কি রেহাই পেত? সব পুলিশই কি তাহলে নারীকে মায়ের মত সম্মান দিত?

না, দিত না।

সম্মান কি জিনিষ পুলিশ জানে না। সম্মানের মূল্য পুলিশ বোঝে না।

কিন্তু কেন? কেন বোঝে না ওরা? ওরা কি মানুষ নয়?

নিশ্চয়ই মানুষ। পুলিশও মানুষ। পুলিশের মধ্যেও স্নেহ, ভালবাসা, মমতা, মহত্ব সবই আছে। তেমনি আছে কিছু অমানুষ। আর যারা মানুষ ছিল তাদের অমানুষে পরিণত করা হয়। তারা বাধ্য হয় অমানুষ হয়ে উঠতে।

শয়তানদের স্বার্থ রক্ষায় পুলিশ বড় হাতিয়ার। পুলিশের হাতের হাতিয়ার যদি মানুষের বুক লক্ষ্য করে উদ্যত না হয়ে শয়তানদের বুকে লক্ষ্য স্থির করে, তাহলে ওদের সুখের স্বপ্ন এক মুহূর্তে ছিঁড়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়বে!

সেটুকু বোঝে ওরা। ওই স্বেচ্ছাচারী শয়তানের দল। যারা ভাল থাকতে চায়, বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করতে চায় তাদের বাধ্য করানো হয় অন্যায় করতে। কালে অন্যায় করার যে মোহ একদিন গ্রাস করে তাদের। শেষ মনুষত্ব বোধটুকু বিনষ্ট হয়।

মালিকের স্বার্থে আইন। শ্রমিকের দল তাদের ন্যায্য দাবী জানালে পুলিশ ছোটে। পুলিশ ছুটতে বাধ্য হয়। না ছুটে ওদের কোন উপায় নেই। হাত-পা বাঁধা। ওরা সরকারের দাস। সরকারের হুকুম, হুকুম ওদের মানতেই হবে। বিচার করার অধিকার নেই। গুলি চালিয়ে যদি অতি প্রিয়জনকেও মারতে হয়, তবু মারতে হবে।

পুলিশ শান্তিরক্ষক, পুলিশ মানুষের বন্ধু, কিন্তু স্বেচ্ছাচারীর দল নিজেদের স্বার্থে পুলিশকে দিয়ে অশান্তি ঘটায়, বন্ধুকে শত্রুতে পরিণত করে। মানুষ পুলিশ-পশুত্বে পরিণত হয়েছে। তা যদি না হবে কেমন করে ওরা স্বেচ্ছাচারীদের অন্যায় হুকুম মেনে নেয়, পালন করে?

প্রগতিশীল যুক্তফ্রন্টের পুলিশী অভিযান সুরু হয়েছিল নকশাল বাড়ির গ্রামে গ্রামে। ত্রাস আর বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল পুলিশ। ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধির হুকুমে গ্রামকে গ্রাম তছনছ করেছিল। রক্ত, অশ্রু, ক্রন্দন। শিশু নারীর করুণ ক্রন্দন ওদের মনকে টলাতে পারেনি, মায়া জাগায়নি। জেলখানা ভরিয়ে তুলেছিল নিরীহ মানুষদের দিয়ে। প্রতিকার ছিল না। প্রতিকার কিসের ? কারা প্রতিকার করবে ?

হাতিখিবার ছোট্ট ঘরখানার অন্ধকারে একদিন গর্জে উঠেছিল শংকরের কণ্ঠ। বলেছিল, এ অন্যায়, অত্যাচার আমি আর দেখতে পারছি না।

তাঁর মৃদু কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল, তবু তোমাকে সহ্য করতে হচ্ছে না।

হচ্ছে না বলেই তো জ্বালা, এত দাহ।

কি করবে তাহলে ভাব তো ? তেমনি মৃদু কণ্ঠে জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

কি করবো ? প্রশ্ন করেছিল সে।

তুমিও কি মার খেতে চাও, চাও ওদের অত্যাচার সহ্য করতে ?

না, আমি ওদের মারতে চাই। এমন মার মারবো যাতে ওরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারে।

ক'জনকে মারবে তুমি ?

ক'জনকে মারব কি ?

আমি জিজ্ঞাসা করছি তোমার একার পক্ষে কজন পুলিশকে মারা সম্ভব হবে ?

একজনকেও তো মারতে পারবে ?

তা পারবে। তাঁর কণ্ঠ একটু নীরব ছিল। ক্ষণকাল পরে বলেছিলেন, কিন্তু একজনকে মারলেই তো হবে না। একশো জনকে,

হাজার জনকে। যারা অশান্তির আগুন জ্বালাবার জন্যে আসবে তাদেরই মেরে শেষ করে দিতে হবে। কিন্তু এই হাজার জনকে মারা তোমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। হাজার জনকে মারতে গেলে তোমার মতো অনেক জনের দরকার। তোমার মত অনেক জনকে তৈরি করে নিতে হবে তোমায়।

কিন্তু এখন যে……। চুপ করে গিয়েছিল সে।

তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন. এখন কি ?

এখন চুপ করে থাকতে হবে ? নীরবে দেখতে হবে পুলিশের এই নারকীয় অত্যাচার ?

উপায় কি ?

নেই ?

শক্তি যেখানে অসমান সেখানে সহ্য কবা ভিন্ন কোন পথতো আমি দেখিনা। তুমি একা। কিন্তু চারজন যখন হবে তখন নিশ্চয়ই চুপ করে থাকবে না। হিংসার জবাব হিংসা দিয়েই দিতে হয় শংকর। কিন্তু তার আগে শক্তি সংগঠিত করতে হবে। চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে সবার আগে।

কিন্তু মুখের কথায় মানুষ জাগবে কি ?

নিশ্চয়ই জাগবে না, কাজের মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে। প্রমাণ করতে হবে যা করছো সবই জনগণের জন্য।

কিন্তু ততদিনে যদি···

বাধা দিয়ে তিনি বলেছিলেন, না শংকর তা হবে না। নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবে না নকশালবাড়ির এই জাগরণ। নকশালবাড়ির মানুষের এই আত্মত্যাগ নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবেনা। মানুষের বিপ্লবী চেতনা কখনো নষ্ট হয় না। এক দন দেখবে নকশালবাড়ির এ আগুন বাংলাদেশ, সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়বে। নকশালবাড়ির মানুষের ওপর স্বেচ্ছাচারী শাসক শ্রেণীর পুলিশী পীড়ন, অত্যাচারের প্রতিশোধ

নেবে। নকশালবাড়ির জনগণের আজকের এই আত্মত্যাগ নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবে না।

সেদিন তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে পারেনি শংকর। সমর্থনও জানায়নি। একটু দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়েই কাজ করেছে। কিন্তু তাঁর কথাই যে সত্য, দেখল একদিন।

চেন্না রাও বলেছিল, কমরেড তুমি সঙ্গে রয়েছো তাই, নাহলে একটা না একটা শয়তানকে নিশ্চয়ই শেষ করে দিতুম।

চেন্না রাওয়ের কথাটা ঠিক বুঝতে পারেনি সে। জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় শয়তান?

ওইতে, ইসারায় একটা পুলিশকে দেখিয়েছিল সে।

শংকর বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল, পুলিশকে মারবে কেন?

নিশ্চয়ই মারবো। চেয়ারম্যান বলেছেন. "পুলিশ দেখলেই মারো।" তিনি ঠিকই বলেছেন। স্বেচ্ছাচারী শয়তানদের সবচেয়ে বড় দোসর ওরা। ওদের শয়তানীই তো মানুষকে সর্বহারা করে। সমাজের সবচেয়ে বড় শত্রু ওরা। যেহেতু ওরা শান্তি রক্ষক, সেইহেতু মানুষের সংসারে আগুন জ্বালাতে ওরা এতটুকু দ্বিধা করে না। ওদের স্বেচ্ছাচারীতে, নির্দোষীকে দোষী সাজায়। উৎকোচে মুক্তি পায় শয়তান।

কিন্তু ওরাতো আমাদের কারো না কারো সংসারের কেউ-না কেউ?

নিশ্চয়ই কেউ-না কেউ। কিন্তু তা ওরা মনে রাখে না। শয়তানের জন্মও তো সংসারে। স্বার্থ মানুষকে শয়তায় বানায়। স্বার্থহানি ঘটলে মানুষ মানুষের বুকে ছুরি বসায়। সেচ্ছাচারীর দল নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য ওদেরও স্বার্থপর শয়তানে পরিণত করেছে।

কিন্তু ওদের মারলেই কি সমস্যার সমাধান হবে?

নিশ্চয়ই নয়। মানুষের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সবচেয়ে বড় বাধা ওরা। অত্যাচারীর দল ওদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে

আমাদের আঘাত হানবার জন্যে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি এর পরিবর্তন ঘটবে।

কেমন করে ?

যেমন করে মহান চীন বিপ্লবে ঘটেছিল। বন্দী কুও মিণ্টাং সৈন্যরা স্বেচ্ছায় একদিন যোগ দিয়েছিল লাল ফৌজে। মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল তারা। কমরেড মাও সে তুঙ চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট পেশ করা রিপোর্টে সামরিক প্রশ্নাবলীতে লিখেছেন :—যেহেতু সীমান্ত অঞ্চলের সংগ্রাম একান্তভাবেই সামরিক সংগ্রাম, সেজন্য পার্টি ও জনসাধারণ উভয়কেই যুদ্ধের উপযোগী করে প্রস্তুত রাখতে হবে। কেমন করে শত্রুর মোকাবিলা করা যায়, কিভাবে যুদ্ধ চালানো যায় সেই সমস্যাই আমাদের দৈনন্দিন কেন্দ্রীয় সমস্যা হয়ে উঠেছে। স্বাধীন রাষ্ট্র হলে তাকে অবশ্যই সশস্ত্র হতে হবে। স্বাধীন রাষ্ট্র যেখানেই কায়েম করা হোকনা কেন, সশস্ত্র শক্তি না থাকলে বা সশস্ত্র শক্তি অপ্রচুর হলে অথবা শত্রুর মোকাবিলার জন্য ভুল রণকৌশল গ্রহণ করলে শত্রু সঙ্গে সঙ্গে সেই এলাকা দখল করে নেবে। প্রতিদিন সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠছে বলে আমাদের সমস্যাগুলিও অত্যন্ত জটিল ও গুরুতর হয়ে উঠছে।

সীমান্ত অঞ্চলের লাল ফৌজ গড়ে উঠেছে এদের নিয়ে :—

১। যে সব সৈন্য আগে ইয়েতিং ও হো লুং এর অধীনে চাও চৌ ও সোয়াতৌ-এ ছিল (কমরেড ইয়েতিং ও হো লুং-এর অধীনস্থ এই সব সৈন্যরা ১৯২৭ সালের ১লা আগষ্টে "নানচাং অভ্যুত্থান" ঘটায়। কোয়াং টুং প্রদেশের চাও চৌ ও সোয়াতৌ-এর দিকে এগোবার পথে এরা পরাজিত হয় এবং কমরেড চু তে, লিন পিয়াও ও চেন ই-র দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি ইউনিট কিয়াং সির মধ্য দিয়ে দক্ষিণ হুনানে সরে যায় গেরিলা কার্যকলাপ চালিয়ে

যাবার জন্য। ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে তারা চিং কাং পাহাড়ে কমরেড মাও সে তুঙ বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করে)

২। য়ুচাং-এর ভূতপূর্ব জাতীয় সরকারের "গার্ডস রেজিমেণ্ট" (১৯২৭ সালের বিপ্লবী দিনগুলিতে, উচাং এ অবস্থিত জাতীয় সরকারের "গার্ডস রেজিমেণ্টের" অধিকাংশ ক্যাডারই কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। ১৯২৭ সালের জুলাই মাসের শেষে ওয়াং চিং-ওয়েই এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পর "নানচাং অভ্যুত্থানে" যোগদান করার জন্য এই রেজিমেণ্টটি উচাং ত্যাগ করে যাবার পথে যখন তারা শুনতে পায় যে বিপ্লবী সৈন্যরা ইতিমধ্যেই নানচাং ছেড়ে দক্ষিণ রওয়ানা হয়ে গেছে তখন এই রেজিমেণ্ট পিং কিয়াং এবং লিউ ইয়াং-এর সশস্ত্র কৃষক বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করার জন্য ঘুর পথে পশ্চিম কিয়াং সির অন্তর্গত লিউ শুই-তে পৌঁছায়);

৩। পিং কিয়াং ও লিউ ইয়াং-এর কৃষকরা (১৯২৭ সালের বসন্তকালে হুনান প্রদেশের পিং কিয়াং ও লিউ ইয়াং অঞ্চলে বেশ শক্তিশালী একটি সশস্ত্র কৃষকবাহিনী তৈরি করা হয়। ২১শে মে তারিখে স্যুকে-সিয়াং, চ্যাং শাতে একটি প্রতিবিপ্লবী গ্রুপ [ক্ষমতা দখল] সংঘটিত করে এবং বিপ্লবী জনগণকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে। তখন প্রতিবিপ্লবীদের উপর আঘাত হানবার জন্য ৩১শে মে তারিখে কৃষকদের সশস্ত্রবাহিনী চ্যাং শার দিকে রওয়ানা হয়। কিন্তু সুবিধাবাদী চেন্ তু সিউ তাদের থামায় এবং ফিরিয়ে দেয়। এরপর এই বাহিনীর একটি অংশকে পুরা একটি রেজিমেণ্ট হিসাবে পুনর্গঠিত করা হয় গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য। ১লা আগষ্টে "নানচাং অভ্যুত্থান" ঘটার পর, এই সশস্ত্র কৃষকেরা, কিয়াং সি প্রদেশের সিউ শুইও টুং কুতে এবং হুনান প্রদেশের পিংকিয়াং ও লিউইয়াং-এ উচাং জাতীয় সরকারের পূর্বতন "গার্ডস রেজিমেণ্ট"এর সঙ্গে যোগদান

করে। এরপর তারা কিয়াংসির পিংসিয়াং-এর সশস্ত্র কয়লাখনি শ্রমিকদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে "শরৎকালীন ফসল অভ্যুত্থান" [সেপ্টেম্বর ১৯২৭ সালে কমরেড মাওসে-তুঙ-এর নেতৃত্বে] সংঘটিত করে। অক্টোবর মাসে কমরেড মাও সে তুঙ এই বাহিনীগুলিকে পরিচালনা করে এবং চিংকাং পাহাড়ে নিয়ে যান)

(৪) দক্ষিণ হুনানের কৃষক (১৯২৮ সালের প্রথম দিকে, যখন কমরেড-চুতে দক্ষিণ হুনানের বিপ্লবী গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন, তখন ইচাং, চেনচো লেইয়াং, ফুলীন ও জেফিং কাউন্টিতে কৃষকদের সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করা হয়েছিল। এই অঞ্চলগুলিতে এর আগেই কৃষক আন্দোলন দৃঢ়ভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল। পরবর্তী-কালে কমরেড চুতের পরিচালনায়, তারা চিংকাং পাহাড়ে যায় এবং কমরেড মাও সে তুঙ-এর বাহিনীতে যোগদান করে; ও সুইকেটথানের শ্রমিকরা (হুনান প্রদেশের অন্তর্গত চ্যাঙ নিং এর সুইকৌমান সীমার খনির জন্য বিখ্যাত। ১৯২১ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সেখান-কার খনি শ্রমিকেরা একটি ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি করে এবং অনেক বছর ধরে প্রতি বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। ৯২৭ সালের "শরৎকালীন ফসল অভ্যুত্থানের" পর অনেক খনি শ্রমিকই লাল ফৌজে যোগদান করে)

(৫) থুকে-সিয়াং, তাও সেঙচি, পাই চুঙ সী, চু পেই-তে, য়ুসাং এবং সিয়াং শী-হুই-এর অধিনস্ত সৈন্যদের মধ্যে যাদের বন্দী হয়েছিল ; এবং

(৬) সীমান্ত অঞ্চলের কাউন্টিগুলির কৃষকেরা।

যাই হোক, এক বছরেরও বেশি সময় ব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহের পর, আগে যারা ইয়েতিং ও হোলুং-এর অধীনে ছিল সেই সব সৈন্যদের এবং "গার্ডস রেজিমেন্ট" এবং পিং কিবাং ও লিউ ইয়াং-এর কৃষকদের মধ্যে মাত্র তিনভাগের একভাগ অবশিষ্ট আছে। দক্ষিণ হুনানের

কৃষকদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যাও খুব বেশি। তাই যদিও প্রথম চারটি শ্রেণীর সৈন্যরাই এখনও লাল ফৌজের মূল শক্তি, কিন্তু সংখ্যার দিক থেকে এখন তাদের চেয়ে শেষোক্ত দুই শ্রেণীর সৈন্যরা অনেক বেশি। তা ছাড়া শেষের এই দুই শ্রেণীর সৈন্যদের মধ্যে কৃষকদের তুলনায় ধৃত বন্দী সৈন্যদের সংখ্যাই বেশি। এইখান থেকে সৈন্যক্ষয় পূরণ না করা হলে জনশক্তির অভাব গুরুতর সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। আবার, রাইফেলের সংখ্যা যে রকম বেড়েছে, সৈন্যের সংখ্যা তার সঙ্গে তাল রেখে বাড়ছে না। রাইফেল সহজে খোয়া যায় না, কিন্তু সৈন্যেরা আহত বা নিহত হয়, অসুস্থ হয়ে পড়ে বা দলত্যাগ করে পালায়, কাজেই সৈন্য ক্ষয় হয় আরও সহজে। হুনান প্রাদেশিক কমিটি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আন্‌য়ুয়ান (কিয়াং সি প্রদেশে পিংসিয়াং কাউন্টিতে অবস্থিত আনউয়ান কয়লা খনিতে বারো হাজার শ্রমিক কাজ করত এর মালিক ছিল "হান-ইয়ে-পিং আয়রন ও ষ্টিল কোম্পানী।" কমিউনিষ্ট পার্টির হুনান প্রাদেশিক কমিটি যে সব সংগঠককে পাঠান তাঁরা ১৯২১ সালে ঐখানে পার্টি সংগঠন ও খনি শ্রমিকদের ইউনিয়ন তৈরি করেন) থেকে শ্রমিকদের আমাদের কাছে পাঠাবেন। আমরা একান্ত আশা করে আছি তাঁরা কাজ করবেন বলে।

শ্রেণী উৎপত্তির দিক থেকে লাল ফৌজের সৈন্যদের কিছু অংশ এসেছে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্য থেকে আর কিছু অংশ এসেছে বাউণ্ডুলে-সর্বহারাদের মধ্য থেকে। অবশ্য এই বাউণ্ডুলে সর্বহারাদের সংখ্যাটি বেশি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে তারা লড়াই করতে পারে। আর লড়াই তো এখন প্রত্যেক দিনই হচ্ছে, হতাহতের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে ফলে এমনকি এদের মধ্য থেকেও সৈন্যক্ষয় পূরণের জন্য লোক জোগাড় করাও আর সহজসাধ্য নয়। এরকম পরিস্থিতিতে একমাত্র সমাধান হচ্ছে, রাজনৈতিক শিক্ষাকে আরো জোরদার করা।

লাল ফৌজের সৈন্যদের মধ্যে অধিকাংশ এসেছে ভাড়াটে সৈন্য বাহিনী থেকে। কিন্তু একবার লাল ফৌজে এলে তাদের চরিত্র পালটে যায়। প্রথম কথা লাল ফৌজ ভাড়াটে প্রথা তুলে দিয়েছে। এতে সৈন্যরা অনুভব করে তারা অন্য কারো জন্য লড়ছে না, লড়ছে নিজেদের জন্য, জনগণের জন্য

চেন্না রাও বলেছিল, আজকের স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ বাহিনী ভাড়াটে বাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। সেইজন্যেই জনগণের ওপর অত্যাচার করতে এতটুকু হাত কাঁপেনা ওদের। হত্যার উল্লাসে ওরা মত্ত। খুনের নেশায় ওরা মাতাল। স্বেচ্ছাচারীর দল ওদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে বুঝিয়েছে, যেহেতু তোমাদের হাতে অস্ত্র দিলাম, সেইহেতু তোমরা অজেয়। যা ইচ্ছা তোমাদের তাই করো, আমরা আছি। কিন্তু আমাদের সংগ্রাম অত্যাচারী শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। আমরা চাই অন্যায় অত্যাচারের অবসান সর্বহারার স্বার্থরক্ষা। মানুষের অধিকার চাই আমরা। চাই মুক্তি। কিন্তু অত্যাচারীর দল যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততোক্ষণ আমাদের সেই পার্থীব মুক্তি আসতে পারেনা। জনগণের জন্যই আমাদের এই জনযুদ্ধ। এ যুদ্ধে শত্রুর ভূমিকায় যে আমাদের চলার পথে বাধা সৃষ্টি করবে তাকেই আমরা শেষ করে দেব। হিংসার জবাব হিংসা দিয়েই দিচ্ছি আমরা। স্বৈরাচারী কংগ্রেস সরকারের ভাড়াটিয়া গুণ্ডাবাহিনী পুলিশ আজ আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতার ভূমিকা নিয়েছে। নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে। আমরাও শেষ করছি তাদের। কিন্তু তারা একদিন নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে, আঘাতের পর আঘাতে তাদের চেতনা সঞ্চার হবে, শয়তানী দূর হবে তাদের মন থেকে। তারা বুঝবে আমাদের আঘাত হানা তাদের বিরুদ্ধে নয়, যে অত্যাচারীর দলের রক্ষকের ভূমিকা নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। সেদিন নিশ্চয়ই তারা তাদের কৃত অন্যায়ের পাপের সংশোধন করবে। কিন্তু

যতক্ষণ না তারা তা করছে, যতক্ষণ তারা শয়তানদের দাসত্ব করবে ততক্ষণ আমরাও তাদের আঘাত হানবো, অত্যাচারের শাস্তি দেব। তাদের বুঝিয়ে দেব অস্ত্রই সব নয়, জনগণ—জনগণ যদি ইচ্ছা করে তাহলে তাদের কয়েক মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে পারে তাদের রাইফেল ধরা হাত।

চেন্না রাও আর তার সঙ্গীরা আক্রমণ করতে গেছে পুলিশকে। তারা বুঝিয়ে দেবে মুখ বুজে আঘাত সহ্য করার দিন আর নেই।

তাদের দুজনকে বলে গেছে অপেক্ষা করতে।

কতক্ষণ, আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে তারা। সূর্যের আলো ম্লান হচ্ছে। ছায়া ঘনাচ্ছে বিকালের। গোধূলির শেষে সূর্য অস্ত যাবে। সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্রাস করবে বিশ্বচরাচর.

কিন্তু অপেক্ষা করে না থাকা ছাড়াও কোন উপায় নেই সম্পূর্ণ অপরিচিত এ স্থান। কৃষ্ণাম্মা পথ চেনে কিনা তাও জানে না। জিজ্ঞাসা করাটা অশোভন দেখায় বলেই জিজ্ঞাসা করেনি।

শংকর ভাবল। কৃষ্ণাম্মার আশঙ্কাটা তার মনেও প্রতিফলিত হল। তবে কি ওর কথাটাই সত্য ?

না না তা কেমন করে হয়। হয় না ?

শংকর ভাবতে পারল না।

কৃষ্ণাম্মা ভাবছিল।

অনেক কথাই মনে পড়ছিল তার।

মনে পড়েছিল ভাইয়ের কথা। হঠাৎই একদিন বিশাখাপত্তনম থেকে চলেএলও। তিন বছর আগের কথা। বাবা তখনও বেঁচে। ওকে ফিরে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ কোন খবর না দিয়ে চলে এলি যে?

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়েছিল ও। বাবাকে অন্য কথা বলে বুঝিয়েছিল। কিন্তু ও যে সত্য কথা বলছে না সেটা বুঝতে পেরেছিল কৃষ্ণাম্মা। এক সময় আড়ালে চেপে ধরেছিল। বলেছিল, বাবাকে মিথ্যা বলে বোঝাতে পারলেও আমাকে পারনি।

ও বলেছিল, কি মিথ্যা বলেছি?

তুমি শুধু একবার বাড়ি আসনি, বরাবরের জন্য চলে এসেছো।

কে বললে, যেন ধরা পড়ে গিয়েছিল ও।

কৃষ্ণাম্মা বলেছিল, বলছি আমি। মা যদি বেঁচে থাকতো মাও ধরতে পারতো।

মায়ের কথায় ওর চোখ দুটো ছল ছল করে উঠেছিল। দীর্ঘদিন আগে মা মারা গেছে। মারা গেছে বললে ভুল হয়। মাকে মেরে ফেলা হয়েছিল। তারা তখন খুব ছোট। বড় হয়ে শুনেছে, গ্রামের জমিদারের অত্যাচারের ভয়ে মা আত্মহত্যা করেছিল।

ও বলেছিল ধরতে হয়তো পারতো মা, কিন্তু আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করতো না।

ভীষণভাবে চমকে উঠেছিল কৃষ্ণাম্মা। কথা বলতে পারেনি।

ও বলেছিল, এছাড়া অন্য কথা আমার পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব

নয়। আমি নিজের ভবিষ্যতের জন্য লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিলাম। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম আপন সুখ স্বাচ্ছন্দের। অথচ আমার দেশ, গ্রাম, ঘরের মানুষ অনাহার, অত্যাচার দিনের পর দিন সহ্য করছে। আমরা নামে স্বাধীন, কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে যে জিনিষ, আমাদের তা নেই। প্রতিটি পদক্ষেপে বাধা। সেই বাধা অপসারিত করতে চাই আমরা। গড়ে তুলতে চাই সত্যকারের স্বাধীন রাষ্ট্র। জনগণের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কিন্তু কেমন হবে সে রূপ? মার্কস, "এঙ্গেলস প্রলেতারিয়েত ও কমিউনিষ্টরা" প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেছেন, বুর্জোয়াদের হাত থেকে ক্রমে ক্রমে সমস্ত পুঁজি কেড়ে নেওয়ার জন্য, রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসকশ্রেণীরূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের হাতে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ কেন্দ্রীভূত করার জন্য এবং উৎপাদন শক্তির মোট সমষ্টিটাকে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে বাড়িয়ে তোলার জন্য প্রলেতারিয়েত তার রাজনৈতিক আধিপত্য ব্যবহার করবে।

সুরুতে অবশ্যই সম্পত্তির অধিকার এবং বুর্জোয়া উৎপাদন পরিস্থিতির উপর স্বৈরাচারী আক্রমণ ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। সুতরাং তা করতে হবে এমন সব ব্যবস্থা মারফৎ যা অর্থনীতির দিক থেকে অপর্যাপ্ত ও অযৌক্তিক মনে হবে, কিন্তু যাত্রাপথে এরা নিজ সীমা ছাড়িয়ে যাবে এবং পুরানো সমাজ ব্যবস্থার উপর আরও আক্রমণ প্রয়োজনীয় করে তুলবে, উৎপাদন পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপ্লবী করণের উপায় হিসাবে যা অপরিহার্য।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবশ্যই এই ব্যবস্থাগুলি হবে বিভিন্ন।

তা সত্বেও সবচেয়ে অগ্রসর দেশগুলিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি মোটের ওপর সাধারণভাবে প্রযোজ্য:

১। জমি মালিকানার অবসান; জমির সমস্ত খাজনা জনসাধারণের হিতার্থে ব্যয়।

২। উচ্চ মাত্রার ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর।

৩। সবরকমের উত্তরাধিকার বিলোপ।

৪। সমস্ত দেশত্যাগী ও বিদ্রোহীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি।

৫। রাষ্ট্রীয় পুঁজি ও নিরঙ্কুশ একচেটিয়া সহ একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক মারফৎ সমস্ত ক্রেডিট রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ।

৬। যোগাযোগ ও পরিবহনের সমস্ত উপায় রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকবণ।

৭। রাষ্ট্রিয় মালিকানাধীন কলকারখানা ও উৎপাদন উপকরণের প্রসার; পতিত জমির আবাদ এবং এক সাধারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র জমির উন্নতিসাধন।

৮। সকলের পক্ষে সমান শ্রমবাধ্যতা। শিল্পবাহিনী গঠন, বিশেষত কৃষিকার্যের জন্য।

৯। কৃষিকার্যের সঙ্গে যন্ত্রশিল্পের সংযুক্তি; সারাদেশের জনসংখ্যার আরো বেশি সমভাবে বণ্টন মারফত ক্রমে ক্রমে সহর ও গ্রামের প্রভেদ লোপ।

১০। সরকারী বিদ্যালয়ে সকল শিশুর বিনা খরচে শিক্ষা। ফ্যাক্টরীতে বর্তমান ধরণের শিশু শ্রমের অবসান। শিল্পোৎপাদনেব সঙ্গে শিক্ষার সংযুক্তি ইত্যাদি।

বিকাশেব গতিপথে যখন শ্রেণী-পার্থক্য অদৃশ্য হয়ে যাবে, সমস্ত উৎপাদন যখন গোটা জাতির এক বিপুল সমিতির হাতে কেন্দ্রীভূত হবে, তখন সরকারী (পাবলিক) শক্তির রাজনৈতিক চরিত্র আর থাকবে না। সঠিক স্বার্থে রাজনৈতিক ক্ষমতা হল একশ্রেণীর উপর অত্যাচার চালাবার জন্য অপর শ্রেণীর সংগঠিত শক্তিমাত্র। বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে লড়াই-এর ভিতর অবস্থার চাপে যদি প্রলেতারিয়েত নিজেকে শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত করতে বাধ্য হয় বিপ্লবের মাধ্যমে তারা যদি নিজেদের শাসকশ্রেণীতে পরিণত করে

ও শাসকশ্রেণী হিসাবে উৎপাদনের পুরাতন ব্যবস্থাকে তারা যদি ঝেঁটিয়ে বিদায় করে, তাহলে সেই পুরানো অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী বিরোধ তথা সরকার শ্রেণীর অস্তিত্বটাই দূর করে বসবে এবং তাতে করে শ্রেণী হিসাবে তাদের স্বীয় আধিপত্যেরও অবসান ঘটাবে।

শ্রেণী ও শ্রেণী-বিরোধ সংবলিত পুরানো বুর্জোয়া সমাজের স্থান নেবে এক সমিতি যার মধ্যে প্রত্যেকটি লোকেরই বিকাশ হবে সকলের স্বাধীন বিকাশের সর্তে।

ওর কথা শুনে বুঝতে আর কিছু বাকী থাকেনি কৃষ্ণাম্মার।

ওর কাছে একদিন কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের শ্রীকাকুলামের জেলা কমিটির রিপার্ট দেখেছিল। তাতে লেখা ছিল:

বর্তমানে আমরা সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্যে রয়েছি। যে পথ আমরা অনুসরণ করেছি তা হল বর্তমানে আমাদের সংগ্রাম সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের পর্যায়ে উপনীত জনযুদ্ধের পথ। যে কৌশল আমরা গ্রহণ করেছি তা হল গেরিলা যুদ্ধের কৌশল। আমরা জানি যে জনযুদ্ধের প্রাথমিক কর্তব্য হল গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা গঠন করে সহর ঘিরে ধরা এবং শেষ পর্যন্ত সহর দখল করা। গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি গড়তে হলে সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রামের দ্বারা শ্রেণীশত্রুদের নির্মূল করার মধ্য দিয়েই কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনার মান বাড়ানো সম্ভব বলে আমরা মনে করি। এই পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতেই বিপ্লবী ঘাঁটি গড়ে ওঠে না। শ্রেণী-শত্রুর বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামে, সকল পিছিয়ে পড়া দেশ, আধা-সামন্ততান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক দেশ, বিশেষ করে এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকায় জনযুদ্ধের এই পদ্ধতি প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

জনযুদ্ধের এই পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেন আজকের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী লেনিনবাদী নেতা ও শিক্ষক চেয়ারম্যান মাও চীনের

মত একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক দেশে চেয়ারম্যান মাও-এর দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র জনযুদ্ধের এই তত্ত্বটি সর্বপ্রথমে জয়লাভ করে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকশিত করে চেয়ারম্যান মাত্র সম্পূর্ণ এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত করলেন। আজকের দুনিয়ায় এই রূপটিই হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বোচ্চ বিকশিত রূপ। এই কারণেই জনযুদ্ধের বিপুল গতি দেখে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত সাম্রাজ্য-বাদী ও তাদের পদলেহী সংশোধনবাদীরাসহ সকল প্রতিক্রিয়াশীলরাই আতঙ্কগ্রস্ত।

সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ লুণ্ঠনের পুরানো কায়দা ছেড়ে নতুন কায়দা গ্রহণ করেছে। পিছিয়ে পড়া দেশগুলিকে প্রত্যক্ষ ভাবে শোষণ না করে পরোক্ষভাবে শোষণের পথ ধরেছে। কার্যত, এই কায়দায় শোষণ করাটা অনেক বেশি কার্যকরী। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠন। সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা মার্কিন সাম্রাজ্যবা দর নেতৃত্বাধীন অন্য সকল সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সারা দুনিয়ায় অবাধ লুণ্ঠন চালিয়ে যাচ্ছে। এই দুই শক্তির নোংরা হাত পিছিয়ে পড়া দেশ—এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নিতে এগিয়ে এসেছে। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার জনগণের দুঃখ দারিদ্রের মূল কারণ এই মার্কিন ও সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদীরা—এরাই দুনিয়ার জনগণের মূল শত্রু। জনগণ যদি দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটাতে, উন্নতির পথে অগ্রসর হতে চায় তবে এই দুই আন্তর্জাতিক শোষকের সঙ্গে—সোভিয়েত ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে—সংঘর্ষ অনিবার্য। এরাই জনগণের সুখ, শান্তি ও উন্নতির প্রধান বাধা।

কি হবে সংগ্রামের পথ ?

বস্তুতপক্ষে চেয়ারম্যান মাও কর্তৃক উদ্ভাবিত চীন বিপ্লবে

পরীক্ষিত বিজয়লাভের একমাত্র পথ জনযুদ্ধের পথ ছাড়া জনগণের কাছে আর অন্য কোন পথ নেই। মহান চীন বিপ্লবে জনযুদ্ধের বিজয়লাভ দুনিয়ার নিপীড়িত জনগণের কাছে মুক্তি পথের সন্ধান এনে দিল। বাস্তব পরিস্থিতি থেকে জনগণ উপলব্ধি করলেন যে একমাত্র জনযুদ্ধের পথেই সংগ্রামে বিজয় লাভ করা সম্ভব। আজকের দিনে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার মত পিছিয়ে পড়া দেশসমূহে চেয়ারম্যান মাও সে তুঙ-এর চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে জনযুদ্ধের গেরিলা কায়দায় লড়াই ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করেছে। এই সব দেশে সাম্রাজ্যবাদী, সংশোধনবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের তৈরি দেয়ালে চিড় ধরেছে—জনগণের এই সব শত্রুরা আতঙ্কে থরহরিকম্পমান। চেয়ারম্যান মাও সে তুঙ-এর নেতৃত্বে বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র মহান চীনের মহান কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণ প্রচণ্ড শক্তিতে দুষমনদের তৈরি সমস্ত বেড়াজাল, সুকঠিন দেওয়ালগুলিতে আঘাতের পর আঘাত করে গুঁড়িয়ে ফেলছেন। বাস্তবিকই বর্তমান যুগটি হল সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের সেবাদাস প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল। এ যুগটি নিপীড়িত দেশসমূহের জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের পক্ষে অনুকূল। পিছিয়ে পড়া অনুন্নত দেশসমূহে পরিপক্ক বিপ্লবী পরিস্থিতি উপস্থিত। এই সময়টি গণতান্ত্রিক বিপ্লব হাসিল করার পক্ষে সুযোগ্য সময়। চমৎকার অনুকূল পরিস্থিতিতে যে কোন দেশের যে কোন অঞ্চলেই প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের যে কোন সংগ্রামী স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে সক্ষম তাই প্রতিটি বিপ্লবীর এবং বিপ্লবী পার্টির ক্ষেত্রে এই স্ফুলিঙ্গকে দাবানলে পরিণত করে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়াই মুখ্য ও আশু কর্তব্য।

আমাদেরও আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র।

সেই কারণে এই দেশের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ হাসিল করতে চেয়ারম্যান মাও এর জনযুদ্ধের লাইন ছাড়া অন্য কোন পথই থাকতে পারে না। আমরা আন্তরিকতার সাথেই এই মহান লাইনটি গ্রহণ করেছি। এই প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখা খুবই সঙ্গত যে মুখে জনযুদ্ধের লাইন গ্রহণ করা এবং কার্যত সেটি প্রয়োগ করা এক কথা নয় ভারতের বুকে মহান জনযুদ্ধ সুরু হয়েছে। আমরা মনে করি ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়িতে সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই সুমহান কাজের উদ্বোধন হয়েছে। আমাদের দেশে বহু দ্বন্দ্বের মধ্যে সামন্ত জমিদার শ্রেণীর সঙ্গে কৃষক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব খুবই প্রকট এবং এই দ্বন্দ্বটিই আজ মুখ্য দ্বন্দ্বরূপে উপস্থিত। কেবল মাত্র দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েই আমরা আগামী পদক্ষেপে অগ্রসর হতে পারি। এবং এই দ্বন্দ্বের সমাধান একমাত্র সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক শ্রেণীর সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম দ্বারাই সম্ভব। অর্থাৎ বর্তমানে আমাদের বিপ্লবের স্তরটি হল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর। সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের দ্বারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আশু কর্তব্য সমাধা করাই বর্তমান মুহূর্তে আমাদের প্রধান কাজ।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এই হচ্ছে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য। ঐ বক্তব্য অর্থাৎ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বক্তব্যের উপর ভিত্তি করেই আমরা আমাদের জেলার শ্রেণীশত্রুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের বিষয়টিকে বিবেচনা করে আমাদের সংগ্রামের পদ্ধতি স্থির করি। এই বিশ্লেষণের দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে আসি, যে শ্রেণী শত্রুদের অত্যাচার ও নিপীড়ন প্রতিরোধ করতেই হবে এবং প্রতিরোধ সংগ্রাম অবশ্যই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পরিপূরক হবে।

চেয়ারম্যান মাও আমাদের মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন, "বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে।" আমরা সমস্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে চেয়ারম্যানের শিক্ষাটিকে উপলব্ধি করি।

আমাদের জেলার সংগ্রামের বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত হল যে, এই প্রতিরোধ সংগ্রাম রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম এবং এই রাজনৈতিক ক্ষমতা বন্দুকের উপর কব্জা রেখেই দখল করা সম্ভব।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর আমরা কমিউনিষ্ট পার্টি জেলা কমিটির নামে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে বিলি করি। ঐ ইস্তাহারে আমরা জনগণের কাছে আবেদন করি, "গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী সংগ্রামের ঘাঁটি গড়ে তুলবার জন্য কৃষক সংগ্রামকে সমর্থন করুন। জেলার কৃষক জনতা চেয়ারম্যান মাও-এর চিন্তাধারাকেই সংগ্রামের নেতৃত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কমিউনিষ্ট পার্টি, এই বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামকে পূর্ণ বিজয়ের পথে নিয়ে যেতে অন্য সকল গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহকে এই মহান সংগ্রামের সমর্থনে সামিল করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

সংগঠিত ভাবে সমস্ত জমিদারদের ধন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং এদের নির্মূল করার জন্য পুলিশবাহিনীকে প্রতিরোধ করে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তুলে জনগণের কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কার্যে জনগণের উদ্যোগ বৃদ্ধির কথাটিও আমরা বিবেচনা করি। আমরা বিশ্বাস করি জনগণের চেতনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির সংগ্রাম খুবই কার্যকর।

আগস্ট ১৯৬৯। মাসের গোড়ার দিকে রায় তাঙ্গা সংগ্রাম কমিটি সোমপেটা তালুকে সংগ্রামের বিবরণ দিয়ে ইস্তাহার প্রকাশ করলেন। বললেন :

বন্ধুগণ ও বীর বিপ্লবী কৃষকগণ !

আমাদের তালুকের জনগণ এক মহান উন্নত স্তরে উঠেছেন। যুগ যুগ ব্যাপী শোষণ থেকে আমাদের গ্রামাঞ্চলের জনতার মুক্তি খুব নিকটে এসে গেছে। ইতিমধ্যেই আমাদের সশস্ত্র কৃষকেরা বহু বিজয় অর্জন করেছেন এবং এইভাবে চিরস্থায়ী মুক্তি অর্জনের জন্য শত্রুদের মারণ আঘাত হানছেন। সংগ্রাম শুরু করার পর খুব অল্প

দিনের মধ্যেই যে আমরা বড় রকমের বিজয় অর্জন করতে পেরেছি তার কারণ কি? তার কারণ আমরা আমাদের সংগ্রাম চালাচ্ছি মাও সে তুঙ চিন্তাধারায়; আমাদের সংগ্রাম জনগণের সংখ্যা গরিষ্ঠের স্বার্থের অনুকূল; আমাদের কৃষক গেরিলারা ও বিপ্লবী কৃষকেরা মৃত্যুকে উপেক্ষা করে অস্ত্র নিয়ে ব্যাগ্র গতিতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন; এবং ছাত্র কর্মচারী ও জনতার অন্যান্য অংশের পূর্ণ সহযোগিতা আমরা পাচ্ছি।

আমরা যে বিজয় অর্জন করলাম তাকে শুধু আরও বিস্তৃত করলেই চলবে না, তাকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে। আমাদের মহান নেতা কমরেড মাও সে তুঙ আমাদের শিখিয়েছেন: "ফৌজ না থাকলে জনগণের কিছুই থাকে না।" এখনই অনেক গ্রামের জনগণ, হাতের কাছে যে অস্ত্র পাওয়া যায় তাই দিয়েই গণফৌজ গঠন করতে চলেছেন। প্রত্যেক গ্রামে রায় তাঙ্গা সংগ্রাম সমিতি গঠিত হচ্ছে। এই হবে আমাদের রাজনৈতিক অধিকারের সংস্থা। এই সংগ্রাম সমিতি, যা অস্ত্র পাওয়া যায় তাই দিয়েই জনগণকে সশস্ত্র করতে উদ্বুদ্ধ করবে। শোষকদের ও তাদের সেনাবাহিনীকে পাল্টা মার দিতে হবে। অনেক গ্রামে যে জমি জোতদারদের হাত থেকে আমরা নিচ্ছি কিম্বা যা ওরা ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে সেই জমি চাষ করার জন্য আমাদের জনগণ গণফৌজের সঙ্গে আলোচনা করছেন। এই "রায়তাঙ্গা সংগ্রাম সমিতি" এদের সম্পর্কে বিশদ ও বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করছে। চাষ করার জন্য সশস্ত্র ভাবে কৃষকদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। আমাদের গেরিলাদের সহযোগিতা সব সময়ই জনগণ ও কৃষকেরা পাবেন। আমরা আশা করি এই কাজটি তারা দ্রুত সম্পন্ন করবেন।

কৃষিবিপ্লব জিন্দাবাদ!

মাও সে তুঙ চিন্তাধারা জিন্দাবাদ।

সমস্ত জনগণ রায় তাঙ্গা সংগ্রাম সমিতিতে যোগ দিন!

—ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)

সোমপেটা এলাক কমিটি এবং

সোমপেটা এলাকা রায় তাঙ্গা সংগ্রাম সমিতি।

সোমপেটা ১।৮।'৬৯

আমিও বিপ্লবী দলে যোগ দেব!

কিছুদিন পরে বাড়ি ফেরার পর চেন্না রাওকে কথাটা বলেছিল কৃষ্ণাম্মা।

কৃষ্ণাম্মার কথাটা শুনে এক মুহূর্ত নীরব ছিল ও। তারপর মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করছিল, কেন?

এই প্রশ্নটার উত্তর কৃষ্ণাম্মার জানা থাকলেও সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারেনি। বলতে পারেনি কেন সে বিপ্লবী দলে যোগ দিতে চায়।

চেন্না রাও যেন এক কঠিন হৃদয় পরীক্ষক। মৃদু হেসে বলেছিল, এসব চিন্তা মনে ঠাঁই না দেওয়াই ভাল। কারণ পথটাতো সুখের নয়।

কিন্তু সুখের আশায় তো বিপ্লব?

সেটা বিপ্লবীদের ক্ষেত্রে নয়।

নয় কেন?

নিজের জন্যে নয় জনগণের জন্যে এ লড়াই। আমরা জনগণের জন্যে জীবনপণ সংগ্রামে ব্রতী হয়েছি। আত্মসুখের চিন্তাকে আমরা মনে ঠাঁই দিইনা।

আমিও তো না দিতে পারি?

সেটা পরীক্ষান্তে বোঝা যাবে।

কেমন সে পরীক্ষা?

কাজ করতে হবে।

কি কাজ?

কাজের কি শেষ আছে! হেসেছিল ও। বলেছিল, ভাইবোনের সম্পর্ক হলেও কার্যক্ষেত্রে কোনরকম দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে আমাদের চলে না। কাজ করতে চাও করো। প্রথমে গ্রামে থেকেই কাজ করো।

তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে না?

নিয়ে যাব না একথা বলছি না। যদি প্রয়োজন হয় নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। অবশ্য নিয়ে যাওয়ার আগে সেণ্টার-এর অনুমতি দরকার।

সেণ্টার কে?

কমরেড সত্যনারায়ণ। আমাদের গপ্পা গুরু (বড় গুরু)।

তাঁর অনুমতি প্রয়োজন?

নিশ্চয়ই। তোমার কাজে যোগ্যতার প্রমাণও দিতে হবে বৈকি! শুধু ভিড় বাড়ালেই তো চলবে না।

সঙ্গে নিয়ে যায়নি চেন্না রাও। কাজ সুরু করেছিল কৃষ্ণাম্মা। প্রতি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছে। আর স্বপ্ন দেখেছে সেদিনটার, অন্যায় শোষণমুক্ত ভারতবর্ষের উজ্জ্বল রক্তাক্ত দিনটার।

তেলেঙ্গানা, নকশালবাড়ি, শ্রীকাকুলাম। একদিন সমগ্র ভারতবর্ষ জাগবে। হাজার হাজার শ্রীকাকুলাম মাথা তুলবে প্রদেশে প্রদেশে। ছিঁড়ে ফেলবে বন্ধন আর অত্যাচারের নাগপাশ।

সেদিন আসছে। সেদিন আসবেই।

চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট কমরেড মাও সে তুঙ যে রিপোর্টটি পেশ করেন, তাতে "আমাদের স্বাধীন রাজত্বের জন্য স্থান নির্ধারণের প্রশ্ন" তে তিনি লেখেন :

উত্তর কোয়াং টং থেকে সুরু করে হুনান-কিয়াংসি সীমান্ত বরাবর যে এলাকাটি দক্ষিণ হুপে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, সেটি পুরোপুরিভাবে লোসিয়াও পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত। এই পর্বতমালাটি আমরা ঘুরেছি। এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে তুলনা করে দেখা গেছে যে, নিং কাংকে কেন্দ্র করে মধ্যবর্তী অংশটাই আমাদের সশস্ত্র স্বাধীন রাজত্বের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক। উত্তরাংশের ভূ-প্রকৃতি এমন যে সেটা, কি আক্রমণ, কি প্রতিরক্ষা কোন দিক থেকেই আমাদের পক্ষে উপযোগী নয়। তার উপর এই অংশটা শত্রুর বড় বড় রাজনৈতিক কেন্দ্রগুলির খুবই কাছে। তাছাড়া, দ্রুতগতিতে চ্যাংসা বা উহান দখল করে নেওয়ার পরিকল্পনা না করলে লিউইয়াং, লিলিং পিংসিয়াং এবং টুংকুতে বড় কোন বাহিনী মোতায়েন করে রাখা রীতিমত বিপজ্জনক। দক্ষিণ অংশের ভূ-প্রকৃতি উত্তরাংশের চেয়ে ভাল বটে কিন্তু সেখানে আমাদের গণভিত্তি মধ্যবর্তী অংশের মত অত ভাল নয়। তা ছাড়া মধ্যবর্তী অংশ থেকে আমরা হুনান ও কিয়াংসির উপর যে বিরাট রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারি, ওখান থেকে ততখানি পারবো না। মধ্যবর্তী অংশে আমরা যে কোন কাজই করি না কেন তার প্রভাব ওই দুই প্রদেশের নিম্নাংশের নদী উপত্যকাগুলির উপর গিয়ে পড়তে পারে। মধ্যবর্তী অংশে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছে। যথা :

(১) একটি গণভিত্তি, যেটা আমরা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তৈরি করেছি ;

(২) পার্টি সংগঠনের উপযুক্ত বেশ ভাল একটি ভিত্তি ;

(৩) স্থানীয় সশস্ত্রবাহিনী, যেটা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে গড়ে তোলা হয়েছে এবং যেটা সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে ভালরকম অভিজ্ঞ—এটি একটি দুর্লভ কৃতিত্ব। লালফৌজের চতুর্থ বাহিনীর সঙ্গে স্থানীয় এই বাহিনী এক সঙ্গে হলে কোন শত্রুর সাধ্য নেই তাকে ধ্বংস করবে ;

(৪) অতি চমৎকার সামরিক ঘাঁটিস্বরূপ চিংকাং পাহাড় এবং সমস্ত কাউন্টিতেই আমাদের স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীর ঘাঁটিগুলি ; এবং

(৫) এই অংশ থেকে দুটি প্রদেশের উপর এবং তাদের নদীগুলি নিম্ননদী উপত্যকাগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। এই প্রভাবের অনেকখানি রাজনৈতিক গুরুত্ব সমন্বিত, যা দক্ষিণ হুনান বা দক্ষিণ কিয়াংসির নেই। দক্ষিণ হুনান বা দক্ষিণ কিয়াংসি যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সেটা শুধু নিজ নিজ প্রদেশের মধ্যেই অথবা নিজ নিজ প্রদেশের পশ্চাৎভূমিতে এবং নদী-উপত্যকাগুলির উপরের দিকের অংশতেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। মধ্যবর্তী অংশের অসুবিধা হচ্ছে এই যে, এই অংশ দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীন রাজত্বের অধীনে আছে এবং শত্রুর বিরাট আকারের "ঘেরাও ও দমনের" সম্মুখীন হয়েছে। তার ফলে, এই অংশের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী, বিশেষভাবে নগদ টাকার অভাব, অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে।

কাজের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, জুন ও জুলাই মাসের কয়েক সপ্তাহের ভিতর হুনান প্রাদেশিক কমিটি, তিনটি বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা বলেছেন। প্রথমে যুয়ান তে-শেঙ এলেন এবং লোসিয়াও পর্বতমালার মধ্যবর্তী অংশে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার যে পরিকল্পনা আমাদের ছিল, সেটিকে অনুমোদন করলেন।

তারপর এলেন তু সিউ-চিং এবং ইয়াং কাই মিং। তাঁরা পীড়াপীড়ি করে বললেন, সীমান্ত অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য মাত্র দুইশত রাইফেল্স এবং লালরক্ষী বাহিনীকে রেখে দিয়ে লালফৌজের উচিত বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে দক্ষিণ হুনানের দিকে এগিয়ে যাওয়া। তাঁরা বললেন এটাই হচ্ছে, "একদম সঠিক" নীতি। তৃতীয়বার, প্রায় দশদিন পরে য়ুয়ান তে-শেঙ পুনরায় একটি চিঠি নিয়ে এলেন। চিঠিতে আমাদের প্রচুর তিরস্কার করা হল, সেই সঙ্গে পীড়াপীড়ি করে লেখা হল লাল ফৌজ যেন পূর্ব হুনানের দিকে রওয়ানা হয়। এইটিকেও আবার সঠিক নীতি বলে বলা হল, জানানো হল "বিন্দুমাত্র ইতস্তত: না করে" এই নীতিকে কার্যকরী করতে হবে।

এই সব অনমনীয় নির্দেশের ফলে আমরা মহা ফাঁপরে পড়লাম। নির্দেশ না মানার অর্থ অবাধ্যতা, অথচ নির্দেশ পালন করতে গেলে পরাজয় সুনিশ্চিত। দ্বিতীয় বার্তাটি আসার পর সেনাবাহিনীর কমিটি, সীমান্ত অঞ্চলের বিশেষ কমিটি এবং য়ুংসীনে পার্টির কাউন্টি কমিটির একটি যুক্ত সভা হয়। সভায় তাঁরা প্রাদেশিক কমিটির নির্দেশাবলী কার্যকরী না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন—দক্ষিণ হুনানের দিকে রওয়ানা হওয়া বিপজ্জনক হবে বলে তাঁরা মনে করেছিলেন। কিন্তু তু সিউ চিং এবং ইয়াং কাই মিং প্রাদেশিক কমিটির পরিকল্পনাটিই আঁকড়ে ধরে বসে থাকেন এবং ২৯নং রেজিমেণ্টের বাড়ি ফিরে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে কয়েকদিন পর চেন-চৌ নামক কাউন্টি শহরের উপর আক্রমণ চালাবার জন্য লালফৌজকে টেনে হিঁচড়ে বার করে নিয়ে যান। এই করে এঁরা সীমান্ত অঞ্চল ও লালফৌজ এই উভয়েরই পরাজয় ঘটান। লালফৌজকে প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য হারাতে হয় এবং সীমান্ত অঞ্চলে অসংখ্য বাড়ি ঘর পুড়ে যায় এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চলে। কাউন্টির পর কাউন্টি শত্রুদের পুনর্দখল করা যায় নি। হুনান, হুপে ও কিয়াংসি প্রদেশের

জমিদার শাসকদের মধ্যে ভাঙন না ধরতেই লালফৌজের প্রধান বাহিনীর পক্ষে পূর্ব হুনানে রওয়ানা হয়ে যাওয়াটা নিঃসন্দেহে উচিৎ হত না। জুলাই মাসে যদি আমরা দক্ষিণ হুনানের দিকে অগ্রসর না হতাম, তাহলে আমরা যে শুধুমাত্র সীমান্ত অঞ্চলে আগষ্ট মাসের পরাজয় এড়াতে পারতাম তাই নয়, আমরা কিয়াং সি প্রদেশে চ্যাংশুতে কুয়োমিণ্টাং-এর ষষ্ঠ বাহিনীর সঙ্গে ওয়াং চুনের কুয়োমিণ্টাং বাহিনীর যে লড়াই বেধে গিয়েছিল তার সুযোগ নিয়ে য়ুং সীনের শত্রু সৈন্যদের ধ্বংস করতে পারতাম, কিয়ান ও আনফু দখল করতে পারতাম। শুধু তাই নয়, ফলে আমাদের অগ্রগামী বাহিনীর পক্ষে পিংসিয়াং পৌছান সম্ভব হত এবং লোসিয়াও পর্বতমালার উত্তরাংশে পঞ্চম লালফৌজ বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করাও সম্ভব হত। যা বলা হল সে সমস্তই যদি সত্যই ঘটতো, তাহলেও নিসকাংই হত আমাদের সদর দপ্তরের পক্ষে উপযুক্ত জায়গা এবং শুধুমাত্র গেরিলা-বাহিনীগুলিকেই পূর্ব হুনানে পাঠানো উচিৎ হত। জমিদারদের পরস্পরের ভিতর লড়াই তখনও আরম্ভ হয়নি এবং দুর্দান্ত শত্রুবাহিনী তখনও হুনান সীমান্তে পিং সিয়াং, চালিং, য়ুসীয়েন-এ অবস্থান করছে; তখন যদি আমাদের প্রধান বাহিনাকে উত্তর দিকে সরিয়ে নিতাম তাহলে শত্রুকে আমরা সুযোগই করে দিতাম। কেন্দ্রীয় কমিটি দক্ষিণ বা পূর্ব হুনানের দিকে এগিয়ে যাবার প্রশ্নটিকে বিবেচনার জন্য আমাদের অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু এই দুই পথই হত বিপজ্জনক। পূর্ব হুনান অভিযানের প্রস্তাবটি কার্যকরী হয়নি বটে, কিন্তু দক্ষিণ হুনান অভিযান ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা সব সময় স্মরণযোগ্য।

যে সময় জমিদার শ্রেণীর শাসনে ভাঙন ধরে সেই সময় এখনও আসেনি, এবং সীমান্ত অঞ্চলের চারপাশে শত্রুর যে “দমনকারী”

বাহিনীগুলিকে মোতায়েন রাখা হয়েছে, তাদের সংখ্যা দশ রেজি-মেণ্টেরও বেশি হবে। কিন্তু আমরা যদি নগদ টাকা সংগ্রহের পথ বার করে যেতে পারি (খাদ্য ও বস্ত্রের সমস্যাটা এখন আর বড় সমস্যা নয়) তাহলে, সীমান্ত অঞ্চলে আমাদের কাজকর্মের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে—যে ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে, আমরা এই শত্রুবাহিনীগুলির সঙ্গে, এমন কি এদের চেয়েও বড় বাহিনীর সঙ্গে এঁটে উঠতে সক্ষম হব। সীমান্ত অঞ্চল সম্পর্কে এই বলা যায় যে, লালফৌজ সরে অন্য কোথাও চলে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবে, যেমন হয়েছিল আগষ্ট মাসে।

আমাদের সব লালরক্ষী বাহিনীই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না ঠিকই, তবে পার্টি এবং আমাদের গণভিত্তির উপর এমন আঘাত আসবে যে তা পঙ্গু হয়ে পড়বে। তাছাড়া, পাহাড়গুলিতে আমাদের পা রাখবার মত জায়গা যদিও আছে কিন্তু সমতলভূমিতে আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মত আমাদের সবাইকেই আত্মগোপন করে থাকতে হবে। আর লাল ফৌজ যদি সরে অন্যত্র চলে না যায় তবে যে ভিত্তি আমাদের আছে তার উপর দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে আমরা আশপাশের এলাকাগুলিতে বিস্তার লাভ করতে পারবো এবং আমাদের সম্ভবনা খুবই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যদি আমরা লাল ফৌজকে আরও বাড়িয়ে তুলতে চাই তবে তার একমাত্র পথ হচ্ছে চিং কাং পাহাড়ের কাছাকাছি জায়গা, যেখানে আমাদের ভাল গণভিত্তি আছে, যথা নিং কাং, য়ুং সীন, লিং সীয়েন এবং সুইচুয়ান কাউন্টিতে শত্রুকে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত রাখা এবং হুনান ও কিয়াং সি প্রদেশের শত্রু সৈন্যদের ভিতরকার স্বার্থ বৈষম্য, এবং সব দিকেই তাদের নিজেদের আত্মরক্ষার প্রয়োজন বোধ করায় তারা যে নিজেদের বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করতে অক্ষম হয়ে পড়বে এগুলিকে কাজে লাগানো। সঠিক কৌশল গ্রহণ করা, যে যুদ্ধে জিততে পারবো না সে যুদ্ধে না

নামা এবং অস্ত্রশস্ত্র দখল করা ও শত্রুসৈন্য বন্দী করা—এইগুলির দ্বারা লাল ফৌজকে আমরা সম্প্রসারিত করতে পারি। লাল ফৌজের মূল অংশটি যদি দক্ষিণ হুনানে অভিযানে না যেত তাহলে এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে সীমান্ত অঞ্চলের জনগণের মধ্যে যে প্রস্তুতি-মূলক কাজ করা হয়েছিল তাতে করে আগষ্ট মাসে লাল ফৌজকে নিঃসন্দেহে আরও সম্প্রসারিত করা যেত। এই ভুল সত্ত্বেও, লাল ফৌজ সীমান্ত অঞ্চলে ফিরে এসেছে। এখানকার ভূ-প্রকৃতি অনুকূল, জনগণও এখানে বন্ধুভাবাপন্ন। সম্ভাবনা এখনও খারাপ নয়। লড়াই চালাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেও সীমান্ত অঞ্চলের মত বিভিন্ন জায়গায় লড়াই করার পরিশ্রম সহ্য করার ক্ষমতা থাকলে তবেই লাল ফৌজ নিজের অস্ত্রশস্ত্র বাড়াতে পারে, শিক্ষা দিয়ে ভালো ভালো সৈন্য তৈরি করতে পারবে। পুরো একবছর ধরে সীমান্ত অঞ্চলে লাল ঝাণ্ডা উড়ছে। হুনান, হুপে, কিয়াং সি এবং সত্য বলতে কি, গোটা দেশেরই জমিদার শ্রেণীর মধ্যে এই ঘটনা ঘৃণার উদ্রেক ঘটিয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে চারপাশের প্রদেশগুলির শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের মনে আশা ভরসাও জাগিয়ে তুলেছে। সৈনিকদের কথা বিবেচনা করুন। সীমান্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে "ডাকাত-দমন" সংগ্রামকে যুদ্ধবাজ সামন্ত প্রভুরা প্রধান কাজ করে তুলেছে, তারা বলছে যে "একটা বছর চলে গেল, দশ লক্ষ ডলার খরচ হয়ে গেল ডাকাত দমনের প্রচেষ্টায়" (লু তি-পিং), অথবা "লাল ফৌজে কুড়ি হাজার সৈন্য ও পাঁচ হাজার রাইফেল আছে" (ওয়াং চুন)। এইসব কারণে ওদের সৈন্য ও ভগ্নোৎসাহ ছোট অফিসারদের মনোযোগ আমাদের দিকে ঘুরেছে। শত্রুপক্ষ থেকে আরও বেশি বেশি সৈন্য দল ছেড়ে দিয়ে আমাদের বাহিনীতে যোগদান করবে।

এইভাবে লাল ফৌজে সৈন্য ভর্তির আর একটা উৎস পাওয়া যাবে। তাছাড়া সীমান্ত অঞ্চলে লাল ঝাণ্ডা যে কখনও নত হয়নি,

এই ঘটানই দেখিয়ে দিচ্ছে শাসক শ্রেণীগুলি কত দেউলিয়া এবং কমিউনিষ্ট পার্টির শক্তি কতখানি।

সুতরাং আমরা মনে করি—এবং একথা আমরা সব সময়েই মনে করছি যে, লোসিয়াও পর্বতমালার মধ্যবর্তী অংশে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা গড়ে তোলা এবং তার সম্প্রসারণ ঘটানো একান্ত-ভাবেই প্রয়োজনীয় এবং সঠিক কাজ।

কমরেড মাও সে তুঙ-এর চিং কাং পাহাড়ে সংগ্রামের মতই আজ অন্ধ্রের শ্রীকাকুলামের সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে লক্ষ্যপথে। শ্রীকাকুলামের তিনশত গ্রাম আজ মুক্ত এলাকা। লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে। উড়ছে লাল ঝাণ্ডা।

অদূর ভবিষ্যতে একদিন শ্রীকাকুলামের পাহাড়ী পথ বেয়ে নেমে আসবে মুক্তি সেনার দল। ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে। অত্যাচারী শাসকশ্রেণীর অন্যায় পাপের শাস্তি দেবে তারা।

দেরি নেই, সেদিন নিকটেই।

মুক্তির পদধ্বনি আজ দিকে দিকে। ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে।

সেদিন আসছে—আসছে।

আসবেই।

দিনের আলো ম্লান হচ্ছে। সন্ধ্যা! পাখিদের কাকলিধ্বনি স্তিমিত। যে যার আপন নীড়ে ফিরে গেছে।

বিদায়ী সূর্যের শেষ রক্তিমাভাটুকু মুছে যাচ্ছে। শ্রীকাকুলামের পাহাড়ে নামছে রাত্রির অন্ধকার। আকাশের বুকে একটি দুটি করে ফুটে উঠছে সন্ধ্যাতারা। জোনাকীর জ্বলা-নেভা সুরু হয়েছে ঝোপে ঝাড়ে।

কৃষ্ণাম্মা তখনও তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ে আছে দূরের দিকে।

আজ সারা দিন অভুক্ত ও। চেন্না রাওয়ের দিয়ে যাওয়া খাবার একেপাশে পড়ে আছে। শংকর ওকে অনুরোধ করতে পারেনি।

চিন্তিত শংকর এখন ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মৃদু কণ্ঠে ডাকল, কমরেড।

শংকরের সে আহ্বান কৃষ্ণাম্মার কানে পৌঁছাল না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

এবার ওর গায়ে হাত দিল শংকর। ডাকল, কমরেড!

চমকে ফিরে চাইলো কৃষ্ণাম্মা। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। যেন সে আর সহজ, স্বাভাবিক নয়।

কৃষ্ণাম্মার সেই অপ্রকৃতিস্থতা দেখে ভয় পেলনা শংকর। বিমূঢ় ভাবটা মুহূর্তে কাটিয়ে উঠে ওর হাত দুটো চেপে ধরলো। বলল, কি হয়েছে কমরেড?

অনেকক্ষণ শংকরের মুখের দিকে চেয়ে রইলো কৃষ্ণাম্মা। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল তার চোখের দৃষ্টি। মৃদু কণ্ঠে যেন কত ভয়ে ভয়ে বলল, কি জানি!

কৃষ্ণাম্মা জানেনা কি হয়েছে তার। শংকর ওকে ধরে বসিয়ে দিল। বলল, আপনি শুয়ে পড়ুন কমরেড।

যদি ওরা আসে?

আমি আপনার ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলবো।

আচ্ছা। বলে, সত্যি সত্যি শুয়ে পড়লো কৃষ্ণাম্মা। একটু পরে ওর দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে শংকর দেখতে পেল ও ঘুমিয়ে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে। নিদ্রার কোলে নিশ্চিন্তে ও সমর্পণ করেছে নিজেকে।

ওর ঘুমন্ত মুখখানির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো শংকর। সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে বড় সুন্দর আর পবিত্র বলে মনে হয় ঘুমন্ত মুখখানিকে। মনের গহনে স্বপ্ন কামনা বোধটুকু মুহূর্তে শিহরে ওঠে। নিজেকে সংযত করে সে। ছিঃ ছিঃ একি ভাবছে সে। এ দুর্বলতাটুকু বিপ্লবীর শোভা পায়না। বিপ্লবীর স্বপ্নতো প্রেম নয়, মুক্তি। সে মুক্তি পথের পথিক। বন্ধনের মায়ায় ভুললে তো তার চলবে না।

কিন্তু......

না-না, কোন কিন্তু নয়। নিজেকে নিজেই ধিক্কার দিল সে। দূরে সরে গেল। শ্রীকাকুলামের পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে তাকাল সীমাহীন আকাশের দিকে।

কদিনের কথা একে একে মনে পড়ল তার। মনে পড়ল গত রাত্রিটাকে। একখানি সুন্দর মুখের ছবি ভেসে উঠল তার মানস পটে। দুটি আশ্চর্য সুন্দর আঁখি। সে আঁখির ভাষা তার অন্তরের অন্তস্থলে পৌঁছেছিল। সাড়া দিতে পারে নি সে।

কেন?

ভাবল শংকর। তার মন ছিল মুক্তির স্বপ্নে বিভোর। শয়তানদের পৈচাশিকতা তার মনটাকে ক্ষিপ্ত করে রেখেছিল। সেইজন্যেই......

চমকে উঠল শংকর। গত রাত্রির ছবিটা স্পষ্ট হচ্ছে। পাহাড়ী

পথে একটি আলোকশিখা এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। কাছে—আরো কাছে।

কে আসছে? কারা আসছে?

চঞ্চল হয়ে উঠল শংকর। তার মনে হল চেন্না রাওরা ফিরে আসছে।

এগিয়ে গেল শংকর। ছুটে গেল।

না চেন্না রাওরা নয়। আলো হাতে এসে দাঁড়িয়েছে এক বৃদ্ধ। অপরিচিত।

দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে রইলো নির্নিমেষ। একসময় বৃদ্ধের ভাঙ্গা কণ্ঠ শোনা গেল, কমরেড শংকর?

মাথা নাড়ল শংকর। জানালো সেই বটে।

একটু ইতস্ততঃ করলো বৃদ্ধ। আবার সেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠ শোনা গেল, একটা দুঃসংবাদ আছে কমরেড!

শংকরের মাথাটা ঘুরে উঠল। মনে হল পাহাড়টা দুলছে। পায়ের নীচের পাহাড়ী পথের পাথরগুলো সরে যাচ্ছে। বৃদ্ধ তার হাতটা ধরে ফেললো।

শংকর বিকৃত কণ্ঠে বলল, আমি শুনতে চাই না।

বৃদ্ধ এক মুহূর্ত তার মুখেব দিকে চেয়ে রইলো। বলল, ভেঙ্গে পড়লে চলবে না কমরেড। আমাদের দশজন কমরেড বীরের মত যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন, কিন্তু ওদের অন্ততঃ বিশ পঁচিশ জনকে খতম করেছেন। আর যুদ্ধের সময় নয়, পুলিশগুলোকে শেষ করে ওঁরা যখন বিশ্রাম করছিলেন ছোট্ট বনটার ধারে বসে, সেই সময় আমাদেরই এক বিশ্বাসঘাতক অন্য একটা দলকে নিয়ে এসে ওদের দেখিয়ে দেয়। ওঁরা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত শত্রুর সঙ্গে লড়াই করেছেন।

এখন ·····

মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। বাধা দিয়ে বলল, ওদের দেহগুলি শয়তানরা নিয়ে গেছে। আমরা বাধা দিয়েছিলাম, কিন্তু ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনারা আমাদের গ্রামে যাবেন? আমি নিতে এসেছি আপনাদের দুজনকে।

না। কৃষ্ণাম্মার কণ্ঠ!

বজ্রাঘাত হলেও এত চমকাত না শংকর। ফিরে দেখল ঘুম ভেঙে কৃষ্ণাম্মা কখন এসে দাঁড়িয়েছে দুজনের পিছনে, কেউ লক্ষ্য করেনি।

কিন্তু ……। কি যেন বলতে চাইল বৃদ্ধ।

আমাদের আপনি ক্ষমা করবেন। রুদ্ধকণ্ঠে বলল কৃষ্ণাম্মা।

বিদায় নিয়ে বৃদ্ধ ফিরে যাচ্ছে। ওরা দাঁড়িয়ে রইলো দুজনে। বৃদ্ধের হাতের আলোটুকু একসময় মিলিয়ে গেল পাহাড়ী পথের বাঁকে।

কৃষ্ণাম্মার মুখের দিকে চাইল শংকর। ওকে দেখল। ডাকল, কমরেড!

কৃষ্ণাম্মার কণ্ঠ ম্লান। মৃদুকণ্ঠে বলল, ওঁদের মৃত্যুতে দুঃখ যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু এই দুঃখটুকু সহ্য করতেই হবে।

শংকর কি ভুল শুনছে, না যা শুনছে তা সত্যি নয়? কৃষ্ণাম্মা কি পাগল হয়ে গেল? সন্দেহ হল তার। আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, কৃষ্ণাম্মা!

এই সত্যি। চল।

কোথায়?

সেণ্টারের সঙ্গে দেখা করতে যাবে তো?

এই রাত্রে?

রাত্রি একসময় প্রভাত হবেই।

কিন্তু অন্ধকারে পথ চিনবে কেমন করে?

অন্ধকারে কৃষ্ণাম্মার গলায় হাসি শোনা গেল। শংকর শুনলো হাসি নয়, কান্না। কৃষ্ণাম্মা কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, পথ ঠিক চিনে নেব। অন্ধকারে চলার গতি কেউ রুদ্ধ করতে পারেনা আমাদের।

কৃষ্ণাম্মা অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে একখানা হাত ধরলো ওর।

শংকর বলল, চল!